আরব সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র ও সরকার

এস. এ. কিউ হোসাইনী

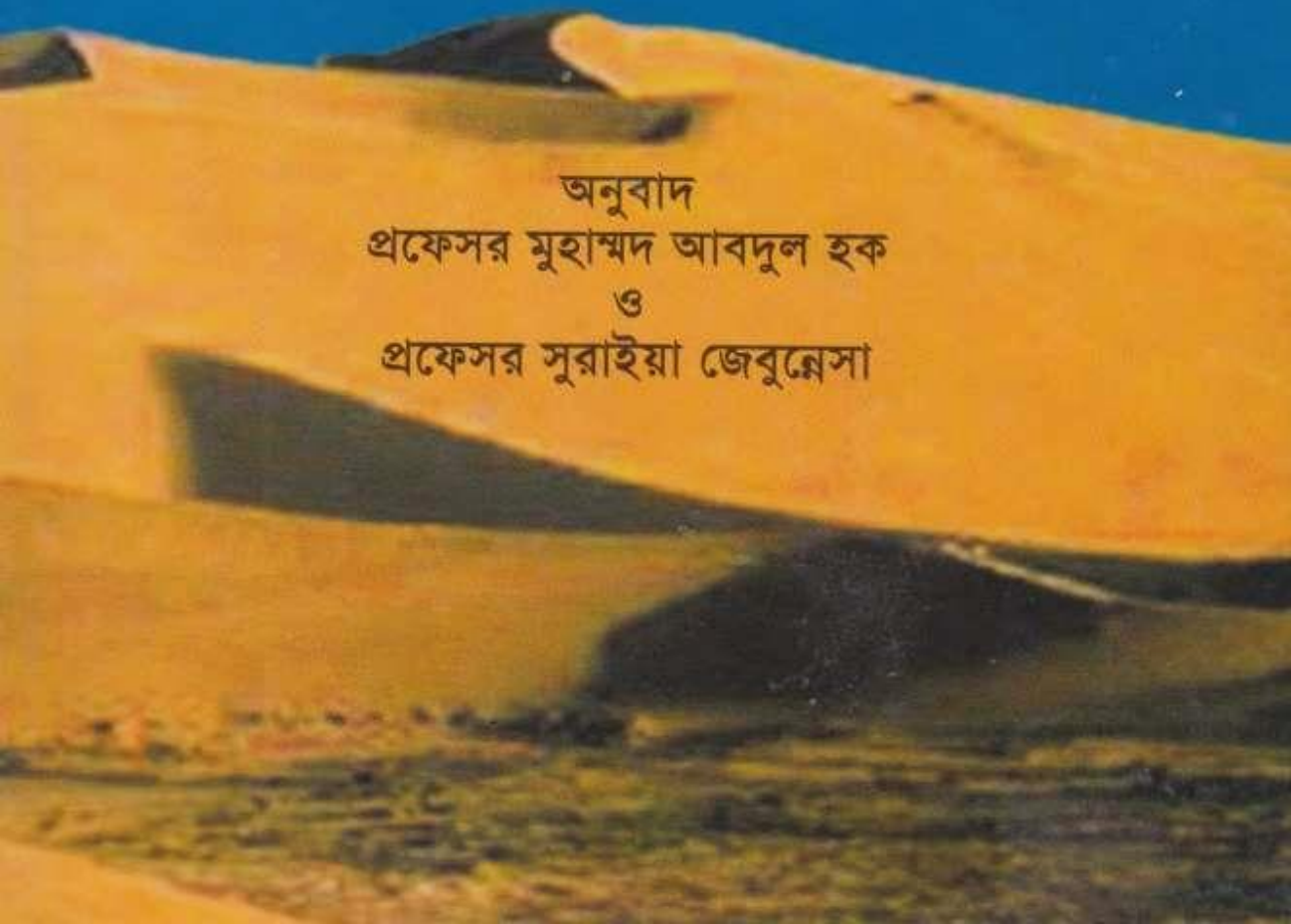

অনুবাদ
প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
ও
প্রফেসর সুরাইয়া জেবুন্নেসা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আরব সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র ও সরকার

এস. এ. কিউ হোসাইনী

অনুবাদ ঃ

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক

ও

প্রফেসর সুরাইয়া জেবুন্নেসা

পরিবেশনায় ঃ

আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
বাড়ী নং-৩৪, সেক্টর-৩, রোড নং-১
জসিম উদ্দিন এ্যাভিনিউ
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

পরিবেশনায় ঃ
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২৯
ভাদ্র	১৪১৫
আগস্ট	২০০৮

বিনিময় ঃ ১৪৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ARAB SAMRAJJER SHASHONTANTRO O SARKER by Prof. Md. Abdul Huq and Prof. Suraiya Zebunnesa.

Price : Taka 145.00 Only.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

০ আমাদের কথা ৯
০ ভূমিকা ১৫
০ মুখবন্ধ ১৭
১. আরব শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি ১৯
২. আরব শাসনতন্ত্রের মূল উৎস ৩১
৩. আরব শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ৪৮
৪. সার্বভৌমত্ব ৫৮
৫. খলিফা ৭৪
৬. উজির (মন্ত্রী) ৮৬
৭. আশ শুরা ৯৬
৮. আরবীয় বিচার প্রণালী ১১৪
৯. ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ১২৩
১০. স্থানীয় সরকার ১৩০
১১. হুদায়বিয়ার সন্ধি ১৪৭
১২. কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার ১৫৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের কথা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজকে পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম-কানুন থাকা অপরিহার্য। দেশ একটা বিরাট ব্যাপার, সেটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিধিবদ্ধ আইন-কানুনের প্রয়োজন অনেক বেশী। আর গোত্র বা ব্যক্তি স্বার্থ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কারণে সমাজ তথা দেশ যখন ক্ষত বিক্ষত তখনই সেই বিপদসঙ্কুল অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ ও সমাজ বন্ধনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলাবোধ এবং সে কারণে আইনের শাসন অপরিহার্য। আবার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য অত্যাবশ্যক আইন ও বিধিবদ্ধ নিয়ম পদ্ধতি। সে কারণে, সে চাহিদা পূরণার্থে আরব সমাজ ও বিশাল আরব সম্রাজ্য পরিচালনার জন্য একটা শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনে অলিখিত আরব শাসনতন্ত্র ছিল। তাতে রাষ্ট্র পরিচালনা, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও বাস্তবতার ধারাকে সুষ্ঠুভাবে গ্রোথিত করা হয়েছিল যাতে মানব, মানব সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো রকম বিভেদ সৃষ্টি হতে না পারে। সেটাই রূপ নিয়েছিল আরব সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্রে। তাই আরব সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্রের প্রথমেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○- المائدة : ١٧

"..... আসমান ও যমীনে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার (সবকিছুর) সার্বভৌমত্ব, আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১৭

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

"আসমান ও যমীন এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে এর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"–সূরা মায়েদা ঃ ১২০

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

"আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই ; তোমরা যা করো আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০

www.pathagar.com

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

"আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই ; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৯

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ط لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ ـ الزمر : ٤٤

"বল, সকল সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ার, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই ; অতপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।"–সূরা আয যুমার ঃ ৪৪

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহই সার্বভৌম ও সকল ক্ষমতার অধিকারী। আবার আল্লাহর পরই কুরানের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। কারণ কুরআনের আইন দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালনা হয়ে থাকে। কুরআনের সার্বভৌমত্বের পরই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি অর্থাৎ নবী ও রাসূলদের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও রসূল (স)-এর সার্বভৌমত্বের পরই খলিফাদের সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখিত আছে এবং সর্বোপরি মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে। এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে মু'মিন জনগোষ্ঠীর সার্বভৌমত্বের কথাও উল্লেখ আছে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط

"..... আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি ..... ।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

অর্থাৎ আমার প্রতিনিধিরাই পর্যায়ক্রমে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবে এবং শাসন করবে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ط

"বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরভীত করেন। আর তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন।"–সূরা আন নামল ঃ ৬২

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ط فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ط وَلَا

www.pathagar.com

يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ج وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ○ - فاطر : ٣٩

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ কোনো কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী ওদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"–সূরা ফাতির ঃ ৩৯

মানব জাতিকে পৃথিবীতে খিলাফত প্রদান করা হয় তাদের আনুগত্যের শপথ ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এ ব্যাপারেও আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○ - الاعراف : ١٢٩

"..... শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে যমীনে তাদের (বিরুদ্ধবাদীদের) স্থলাভিষিক্ত করেন ; অতপর তোমরা কি করো তা তিনি লক্ষ করবেন।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ১২৯

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

"অতপর আমি ওদের পর পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি ; তোমরা কি প্রকার আচরণ করো তা দেখার জন্য।"–সূরা ইউনুস ঃ ১৪

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ز وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সমন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপরের উপর উন্নীত করেছেন ; এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে তিনি তোমাদের যাচাই করতে পারেন। তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৬৫

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ق وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○ - الشورى : ١٠

www.pathagar.com

"তোমরা কোনো বিষয়েই মতভেদ করো না কেনো এর মীমাংসা তো আল্লাহর নিকট। তিনিই আল্লাহ—আমার প্রতিপালক, আমি নির্ভর করি তার উপর এবং আমি তারই অভিমুখী।"–সূরা আশ শূরা ঃ ১০

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ـ ص : ٢٦

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, কেননা ইহা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে।" –সূরা সাদ ঃ ২৬

তবে আল্লাহ, কুরআন, রসূল এবং খলিফাদের পর পর মু'মিনগণই প্রকৃত খিলাফতের যোগ্য বা উত্তরসুরী। এ বিষয়ে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○ ـ النور : ٥٥ـ٥٦

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না, অতপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই তো সত্যত্যাগী। সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য করো যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।"-সূরা আন নূর ঃ ৫৫-৫৬

এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ সর্বময় সার্বভৌমত্বের অধিকারী সৃষ্ট কুল-মাকলুকাতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার জন্য প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছেন কেবল মাত্র তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব মানুষের উপর। আর মানুষকে পরিচালনা ও আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে ধর্মগ্রন্থ প্রেরণ

www.pathagar.com

করেছেন। সর্বশেষে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনকে প্রেরণ করেছেন আমাদের প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে ; যার জন্য আজ পৃথিবী পেয়েছে একটা শ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র, যার মাধ্যমে মানুষ অর্থাৎ সৃষ্টিকুল সর্ববস্থায় মুক্তি পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্র পরিচালনা হতো কেবল আল্লাহর ঔশী বাণী ও রাসূল (স)-এর ধ্যান ধারণা অনুসারে। আরব সাম্রাজ্য যখন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করলো তখনো একে সুষ্ঠুভাবে শাসন করার জন্য শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সময়ের প্রয়োজনে রাসূল (সা) বিভিন্ন সময় কুরআন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে বিধিবিধান দিয়ে গেছেন তাই হলো আরব সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রের উপর লিখতে হলে অনেক কিছুই লিখতে হয়। কারণ বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আজ যেভাবে শাসনতান্ত্রিক নিয়ম ও রীতিনীতি দ্বারা দেশ পরিচালনা করছে আরব সাম্রাজ্যও তদ্রূপ কুরআন প্রদত্ত বিধিবিধান ও রিতিনীতি অনুসারে পরিচালিত হতো। সে সময়কার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, পরিচালনা কাঠামো প্রায় বর্তমান সময়ের মতোই, তবে যুগের পরিবর্তনে জ্ঞানের আলোকে এরও পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনের এবং বিভিন্ন দেশের চাহিদানুসারে শাসনতন্ত্রের রূপরেখা একটু আধটুকু পরিবর্তন থাকলেও মূল কাঠামো প্রায় একই রকম। তবে বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই এই লিখিত বা অলিখিতভাবে মোটামুটি ইসলামী রাষ্ট্রের ভাবধারায় আরব শাসনতন্ত্রের মৌলিক অবকাঠামো ঠিক রেখে তাদের দেশের ও জাতির প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন এনেছে মাত্র।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের তথা ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূল হলো কুরআন। তাই কুরআন ও হাদীসকে মাথায় রেখেই বিভিন্ন দেশের তথা মুসলিম দেশসমূহের শাসনতন্ত্র প্রোণিত হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল (স) যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন বা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার প্রতিনিধি খোলাফায়ে রাশেদিনও সেইরূপ রাষ্ট্র পরিচালনা করে গেছেন। কোনো ক্ষেত্রে ইসলামী ফেলাফতের শেষের দিকে খলিফাদের দুর্বলতা এবং উজীরদের উপর নির্ভরশীলতার কারণে কিছু নিয়মের পরিবর্তন হেতু তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে গেছে আরব সাম্রজ্য। তবে কাঠামো আজও ঠিক আছে বলে প্রতীয়মান হয়। এখনও রাসূল (স)-এর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য আল কুরআন ও হাদীস অনুসারেই পরিচালিত হচ্ছে।

মুসলিম বা ইসলামী শাসনতন্ত্র লেখা বা এর ব্যাখ্যা দেয়া বিশাল ব্যাপার। তাই আমার লেখায় কেবল মাত্র আরব শাসনতন্ত্রের ধারা হতে, খেলাফত,

www.pathagar.com

শুরা, উজীরাত, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, সামরিক সংগঠন, মদীনা সনদ, হুদায়বিয়ার সন্ধি ইত্যাদি সমন্ধে আলোকপাত করা হলো। কারণ এসবই শাসনতন্ত্রের মূলবস্তু।

আমি এ বইটিকে প্রায় ২৫ বছর পূর্বে লিখেছিলাম। কিন্তু নিজে প্রকাশ করতে পারিনি বিধায় বিলম্বিত হয়েছে। বর্তমানে যাদের প্রচেষ্টার জন্য বইটি আজ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাদের জানাই মোবারকবাদ।

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক

ও

প্রফেসর সুরাইয়া জেবুন্নেসা

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলামী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে সে আমলে বিখ্যাত ১৫ জন মুসলিম চিন্তাবিধ ও দার্শনিক আরব শাসনতন্ত্রের সংশোধন করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন ধারা আনয়ন করেন। কারণ রাষ্ট্র হলো সমাজের একটা Moderating Factor যা কেবল Conflicting Interest এর জন্ম দেয় এবং নানান সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু সে কারণে প্রথমত শাসনতন্ত্র আরবীয় সমাজব্যবস্থার পূর্ণতা আনয়ন করার নিমিত্ত রাষ্ট্রের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর জন্য রাষ্ট্রকে একটা পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থায় আনয়ান করার একটা সুষ্ঠু নিয়ম চালু করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থাভেদে স্থানীয় আইন চালু করে যা কেবল রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

তবে ইসলামের আবির্ভাব হবার পর আরব শাসনতন্ত্রের কোনো কোনো দিক Took a clear of bold term. যাকে সাধারণত ইসলামের আবির্ভাবের পর সাধারণত ইসলামিক শাসনতন্ত্র হিসাবে বলা হয়, এবং কোনো কোনো সময় একে মুসলমান শাসনতন্ত্রও বলা হয়। তবে প্রথমটা কেবল মুসলমান বা ইসলামী আইনে পরিচালনা করে থাকে। দ্বিতীয়টা কেবল একটা রাষ্ট্রের ধর্মভিত্তিক শাসনতন্ত্র রূপে পরিচালিত হয়। যার ভিত্তি হলো আর্থসামাজিক দিকটা যা একটা গাছের মূল অংশ রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। সেটাই সমাজ ব্যবস্থা। শাসনতন্ত্র এবং ধর্ম দুটা Common Social Order এর দুটো offshoots একটা থেকে অন্যটা নয়। অনেকে এ ব্যাপারে অনেক কথা বলে থাকে কিন্তু আমি আমার কার্যকে নিরবদিন্যভাবে আরব সম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র বলি কারণ আমার লেখার অনেক স্বাধীনতা আছে।

লেখকরা আমার লেখায় প্রায়শই শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবহার হিসেবে ইসলাম ও মুসলিম শব্দগুলো পেয়ে থাকবেন। তার কারণ হলো এর অধিকাংশ ব্যাপারটাই ইসলামের আবির্ভাবের পরে Lime light এ এসেছে। আর আশাটাই স্বাভাবিক।

এ পুস্তকের অধিকাংশ অধ্যায় লাহরের পত্রিকা The Islamic Literature-এ প্রকাশিত হয়েছে। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার কোনো বিষয় rewrite করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

যে সকল জ্ঞানী গুণী ও সুধিজন আমরা এ লেখায় সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা রইলো। বিশেষ করে আমার ছাত্রদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইলো কারণ তারা আমার লেখায় ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা করে উৎকৃষ্ট পথ দেখিয়েছে।

এস. এ. কিউ. হোসাইনী

ঢাকা-১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

কোনো কোনো সময় দাবী করা হয় যে, The art of free Government is the greast Contribution of the Anglo-Norman race to the Civilisation of the world ; That the British alone have had at all times an intimate respect for political authority based upon their own consent. "যে জন্য ব্রিটিশগণ তাদের স্থানীয় সরকার পরিচালনায় দক্ষ পার্লামেন্টেরিয়ান হতে পেরেছেন। এটাকে অস্বীকার করা যাবে না যে বর্তমান সময় Anglo-Norman race পুরাকালের রোমান জাতির মত সরকার গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু গ্রীস এবং রোমদের মত আধুনিক যুগে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মত মনুষ্য প্রতিভা বিকাশ হয়নি। মধ্যযুগের ভাল সময় সরকারী চিন্তা-চেতনা খুবই অপরিপক্ক ছিল, যে সময়টায় মুসলমানদের জন্য মনোপলি ছিল।

আরবগণ প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষে তাদের সকল গোত্রের লোকজ নদের মতামতের ভিত্তিতে গোত্রীয় প্রধান নির্বাচন করতো। প্রাচীনকালেও তারা খুব কঠোরভাবে চেষ্টা করতো "The right of the people to chose and election ruler or tribal chief of the dear of hereditary kingship "was" completely toreign to them." তবে স্বাধীন মানুষের কাছে সরকারী দক্ষতা প্রয়োগ খুব একটা ভাল মনে হতো না। পরবর্তী কালে কমনওয়েলথ একটি অধঃপতিত বংশক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত হলো। অত্যাচারী রাজার পতন ভয়ঙ্কর, কিন্তু সকল মানুষের নিকট Prineiple of election খুবই গ্রহণযোগ্য ছিল। যদিও কোনো ক্ষেত্রে ইলেকশনটা প্রহসনমূলক ছিল, কিন্তু প্রহসন হলেও ইলেকশনের নীতি আরব শীর্ষ আরবীয়দের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য ছিল।

পশ্চিমাদের কাছেই কেবল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা মনোপলি ছিল না।

Nothig was more foreingn or distasteful to the Asiatic mind than a severely centralised Government. Every helmet, every town, inddeed conducted its own affairs by itself, and the Government only interferred when it was in subordinate."

অনেক শহরেই জ্ঞানী ও গুণীজনের কাউনসিল দ্বারা পরিচালিত হতো। পুরাকালে আরবদেশ যে কাউনসিল দ্বারা পরিচালিত হতো তাকে মালেক বলা

www.pathagar.com

হতো। পরে মুসলমান শাসকদের সময় একে শুরা বলা হতো। প্রত্যেক শহর বা প্রদেশ এক একজন শাসক দ্বারা পরিচালিত হতো ; তাদের নিয়মে প্রত্যেককে ট্যাক্স দিতে হতো যা দ্বারা প্রদেশের সরকারী কার্যাদি পরিচালিত হতো এবং একটা নির্ধারিত অর্থ রাষ্ট্রকে দিতে হতো।

প্রাচীন রোমানরা রাষ্ট্রীয় সরকারের একটা রূপরেখা প্রবর্তন করে এবং রাষ্ট্র পরিচালানার জন্য আইন প্রণয়ন করে যা সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করে। তবে রোমান সরকার যখন অধঃপতিত হতে থাকে সে অবস্থায় মুসলমানগণ তাদের সরকারী কার্যক্রম এবং আইনের উৎকৃষ্টতা সাধন করে বিশ্বে একটা সুন্দর শাসনতান্ত্রিক সরকার উপহার দেয়।

আবার আরবদের শাসনব্যবস্থা যখন অধঃপতিত হতে থাকে তখনই আবার এ্যাঙ্গলো নরম্যান জাতি তাদের স্থান দখল করে নেয়।

রোমানদের পর মুসলমানরা রাষ্ট্র পরিচালনায় যে শাসনব্যবস্থা এবং আইন প্রবর্তন করে গেছে তার উপরই বিভিন্ন জাতি এমনকি বৃটিশগণ তাদের ধারণা প্রসূত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে যান তবে মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থার কাছে বৃটিশদের সৃষ্ট মানবিক আইন ও শাসনব্যবস্থা পৃথিবীকে আরো জটিল করে চলছে। ইসলামী আইন ও শাসন উৎকৃষ্টতর বলে প্রমাণিত।

www.pathagar.com

আরব শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি

সরকার গঠন

আরব শাসনতন্ত্রের ধারা এবং সরকার গঠন প্রণালী সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মের পূর্বে আরব দেশে কোনো শাসনতান্ত্রিক সুষ্ঠু ব্যবস্থা বা কোনো রাষ্ট্রীয় সরকারের প্রচলন ছিলো না। গোত্রীয় নেতা ও উপনেতাগণ সে সময়কার প্রচলিত নিয়ম এবং তাদের ধ্যান-ধারণা অনুসারে নিজ নিজ গোত্র শাসন করতেন। অন্যদিকে সে যুগে আরব গোত্রীয় প্রধানগণ তাদের চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও কৌশলীদের ধ্যান-ধারণার উপর নির্ভর করে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতেন। তবে সে দেশের তখনকার অর্থনীতির উপর শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করতো। প্রগতিশীল ও গতিময় সমাজে একই রকম সমাজব্যবস্থা সরকারের গঠন প্রচলিত ধারায় বহুদিন ধরে চলতে পারে না বিধায় সময়ের পরিবর্তনে নূতন সমস্যার উদ্ভাবনায় এর পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই সে যুগেও শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনশীল ছিলো, কারণ আচার-প্রণালী ছিলো রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু। খেলাফত যুগেও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছিলো। ইসলামের প্রাক্কালে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো তা ছিলো পূর্ণ গণতান্ত্রিক। তবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর শাসনকালে এটা একটা শক্ত থিওক্রেটিক সরকার বলে বিবেচিত ছিলো। খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-এর সময় আভিজাত্যপূর্ণ সরকার বিদ্যমান ছিলো। খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর সময় এটা গণতান্ত্রিকভাবে কতিপয় বিশিষ্ট জ্ঞানী লোক দ্বারা শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। (অলিগারকি) তবে উমাইয়া খলিফাদের সময় তা আবার স্বৈরাচারতান্ত্রিক সরকারে রূপ নেয়। আব্বাসীয় যুগেও প্রায় পূর্বের মতো একই রকম শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো।

তবে এ পরিবর্তনশীল গোটা শাসনকালকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক সরকার মনে করা ঠিক হবে না, কারণ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে গোত্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলন ছিলো। সে শাসনব্যবস্থা আবার গণতান্ত্রিক এবং অভিজাত তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর শাসনকালকে থিওক্রেটিক শাসনব্যবস্থা বলে বিবেচনা করা হতো, কারণ আল্লাহর দূত হিসেবে তিনি সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যকে আল্লাহর প্রত্যাদেশানুসারে শাসন করতেন। রাষ্ট্র পরিচালনার

www.pathagar.com

ব্যাপারে তিনি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সহকর্মীদের পরামর্শও গ্রহণ করতেন এবং কোনো ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকলে এবং তা অসংগতিপূর্ণ হলে বা ন্যায়সংগত না হলে তা গ্রহণ করা হতো না। ঐশ্বরীক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে মুহাম্মাদ (স) রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং আল্লাহর প্রত্যাদেশের বিরুদ্ধে কারো বিরোধিতা করা চলতো না বা গ্রহণযোগ্য হতো না।

হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-এর শাসনকাল ছিলো পূর্ণ ইসলামী অভিজাতপূর্ণ। হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতের শেষ দিকে কিছু স্বার্থপুষ্টের দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির আশায় এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এর পরিণতি স্বরূপ তাঁকে গুপ্ত ঘাতকের হাতে শাহাদাত বরণ করতে হয়। কিন্তু তিনি তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও খেলাফতের মর্যাদা রক্ষা করে গেছেন।

পাশ্চাত্যের অনেক চিন্তাবিদ জ্ঞানীগুণী লোকদের ধারণা, ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কাল থেকে বাগদাদ পতন পর্যন্ত থিওক্রেটিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিলো যা অনেক মুসলিম চিন্তাবিদগণও পাশ্চাত্যের ঐ চিন্তাবিদগণের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে একথা স্বীকার করে থাকেন। প্রথমতঃ হিব্রুদের মধ্যে তাদের পয়গম্বরদের মাধ্যমে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তাদের ধারণা ছিলো যে, আল্লাহ প্রতিনিয়ত তাদের পাশে থেকে সকল কাজে সহায়তা করে থাকেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময়ও ঠিক আল্লাহ প্রত্যাদেশিত শাসন প্রচলিত ছিলো। তাই যদি সে যুগে আরব সাম্রাজ্যে থিওক্রেটির কথা বলা হয় তা শুধু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময়কালেই প্রযোজ্য। অনেকের যুক্তিতর্ক যে, যদি আল্লাহর প্রত্যাদেশানুসারে কোনো সরকার শাসিত হয় তবে তাকে থিওক্রেটিক বলা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। বর্তমান বিশ্বে প্রায় অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রই আল্লাহর প্রত্যাদেশের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় শাসন কাজ পরিচালনা করে থাকেন। তবে যারা এতে বিশ্বাসী নয় তারা ঐ প্রত্যাদেশকে নিজেদের কথায় প্রকাশ করে শাসন প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর শাসনকে থিওক্রেটিক বলা যেতে পারে, তবে তাঁর শাসন ছিলো বিশেষ উন্নত যা সে যুগ হতে আজ পর্যন্ত অন্য কোনো একনায়কতান্ত্রিক সরকারের পক্ষেও সম্ভব নয়। তাঁর শাসন-ব্যবস্থা এতো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ছিলো যে, তাতে সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কেউ কোনো দিন নাখোশ প্রকাশ করেনি। তাই এ শাসনকে থিওক্রেটিক সরকার বলা হলেও পূর্ণ গণতান্ত্রিক সরকার ছিলো। আজ পর্যন্ত কোনো গণতান্ত্রিক সরকারও ঐ রকম শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি এবং

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কথা বলা হলেও কার্যতঃ দেখা যায় যে,, মানবীয় গণতন্ত্র স্বৈরাচার তন্ত্রের নামান্তর মাত্র।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তেকালের পর আরব রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ও শক্তি কিছু সংখ্যক শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের হাতে চলে গেলো। সেখানে থিওক্রেসির পরিবর্তে অভিজাততন্ত্রের জন্ম নিলো এবং এ থেকে ধারণা করা যায় যে, সে কালে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর মানুষেরা যারা সবচেয়ে বেশী দিন শাসনকার্যের সংগে লিপ্ত তারা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর সরকার গঠন করতে পারে। অনেকের ধারণা বয়স এবং জন্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা হয়, তবে কে কখন ইসলাম গ্রহণ করলো কখন হযরতের সংস্পর্শে আসলো তাও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হতো।

এ থেকে যে কেউ একথা বলতে পারে যে, মক্কার কুরাইশদের মধ্যে যারা সর্বাগ্রে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো জ্যেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে সত্যিকারের ক্ষমতা তাদের উপর অর্পিত হওয়া উচিত। তাদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) প্রথম ধাপের এবং আবু ওবায়দাহ, আবদুর রহমান বিন আউফ, তালহা, যুবায়ের এবং সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ছিলেন পরবর্তী ধাপের। আনছারগণের শক্তি ও ক্ষমতা কম বলে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা বাদ পড়ে গেলো। প্রথম দু'জন খলিফার সময় বিলাল, আমর এবং ইবনে মাসুদের (রা) কথা শুনতে পাওয়া যেতো কিন্তু তারা খুব জ্ঞানী লোক হওয়া সত্ত্বেও তাদের হাতে কোনো ক্ষমতা অর্পিত হয়নি।

হযরত ওমর (রা)-এর ওফাতের পর শাসনতান্ত্রিক কার্যকলাপে শাসকদের অধঃপতিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে গেলো। পূর্বে শাসক বা খলিফাগণ যে আত্মবিশ্বাস, উদ্দীপনা ও সৎসাহস নিয়ে ইসলাম এবং মুসলিম রাষ্ট্রের উন্নতি কল্পে কাজ করেছেন সে দিক দিয়ে পরবর্তীকালের শাসকদের কার্যকলাপ ছিলো কিছুটা বিপরীতমুখী। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পুরাকালে ইসলামের আবির্ভাবের পর যারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে কাজ করতো এবং ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য স্বততঃ চেষ্টা চালাতো সেই স্বার্থপুষ্ট লোকগুলোই পরবর্তী সময় কালের চক্রে তাদের বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক হয়ে বসেন। তার প্রমাণ এখানে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সেই কুখ্যাত মারওয়ান ইবনে হাকাম যিনি হযরত ওসমান (রা)-এর ডিফেকটো প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু আবদুল্লাহ, ইবনে আবি দারাহ জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও মিশরের শাসনকর্তার পদ ছাড়া আর কিছু পেলেন না। তাই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের চারিত্রিক দোষ এবং স্বার্থের জন্য মানুষ সবকিছু ভুলে

www.pathagar.com

গিয়ে স্বীয় স্বার্থের খাতিরে বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিতে দ্বিধাবোধ করে না। কিছু স্বার্থপর লোকের জন্যই এ অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিলো এবং সেই স্বার্থপুষ্ট দলের জন্যই খলিফাদের রাজত্বকাল বিষাদময় হয়েছিলো এবং তাদের জন্যই হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)-কে গুপ্তঘাতকের হাতে শাহাদাত বরণ করতে হয়। এ স্বার্থপুষ্ঠের দলের অন্যতম হলেন মারওয়ান নিজেই। তার বিশ্বাসঘাতকতা এবং অসৎ চরিত্রের জন্যই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত স্বাধীন মুসলিম সাম্রাজ্য রাজতন্ত্রে পরিণত হলো।

সাম্রাজ্যবাদ প্রথার জন্য এ ধরনের সরকারের দরকার হয়েছিলো এবং সাম্রাজ্যের বহু অংশেই সমানুবাদ গড়ে উঠলো। তবে সমানুবাদ রোমান এবং পারসিয়ান দেশে ছিলো। এ সমানুবাদ প্রথা এবং প্রাচীন গোত্রীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্বের জন্যই আব্বাসীয় বিদ্রোহ দানা বেধে উঠে এবং পরবর্তী সময় আব্বসীয় সমানুবাদ রাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক দিন স্থায়ীত্ব লাভ করে।

তবে যে সকল সরকার সম্বন্ধে উপরে বলা হলো এর কোনটাই একক নয়। প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে অনেক আভিজাত্যের ছাপ ছিলো সেহেতু তারা আভিজাততন্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা করতে পেরেছিলো। পরক্ষণে যে সকল লোক বিভিন্ন দিক থেকে এসে আরব মরুভূমিতে বসবাস আরম্ভ করে তখন আরবীয়দের সংস্পর্শে তাদের মধ্যে আবার রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার জন্ম নেয় বিশেষতঃ উত্তর আরবের দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের লোকদের মধ্যে এ প্রবণতাটা খুব বেশী। দক্ষিণাঞ্চলের মীনা, সারা, সাবা ও হিমায়ার ; উত্তরাঞ্চলের পেট্রা, ঘাছান এবং তাদমুরের শাসকগণ নানান দিক দিয়ে রাজাই ছিলেন বটে।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর আভিজাত পূর্ণ শাসকদের শাসন গণতান্ত্রিক কায়দায় প্রচলিত ছিলো। এমনকি হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে অলিগারকী এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও কিন্তু আল্লাহর রাসূলের উত্তরাধিকার নির্বাচনে সরকার প্রতিষ্ঠা কল্পে নির্বাচনকে উপেক্ষা করা হয়নি। এমনকি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা কল্পে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ না করে পারেননি বরং তাদের মতামত গ্রহণ করতঃ রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করা হতো।

যদি আমরা সেই যুগের সরকার গঠন সম্বন্ধে চিন্তা করি তবে এ রকম ও একক সরকারের কথাই চিন্তা করতে পারি না। বিভিন্ন ধরনের সরকার সম্বন্ধেই আমাদেরকে চিন্তা করতে হয়। তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন শাসন প্রণালী থেকে দেখা যাবে।

www.pathagar.com

একক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপাদান

যদিও আরব সাম্রাজ্যে গভর্নর এবং ওয়ালীগণ খুব বেশী ক্ষমতা ভোগ করতেন তবুও শাসনতন্ত্রের অধিকাংশ অধ্যায় একাত্মক সরকার পদ্ধতির প্রচলন থাকায় খলিফার নির্দেশ ছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কেউ তার গণ্ডির বাহিরে কিছু করতে পারতেন না। গভর্নর বা ওয়ালীগণ খলিফা বা শাসনকর্তা দ্বারা নিয়োজিত হতো এবং তাদের সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা বা খেয়াল খুশির উপরেই তাদের চাকুরী নির্ভর করতো। সেহেতু তারা ইচ্ছা করলেই উক্ত গভর্নর বা ওয়ালীদেরকে যে কোনো সময় চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে দিতে পারতেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আব্বাসীয় খেলাফতের পূর্ব পর্যন্ত পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে খুব কম সংখ্যক উত্তরাধিকারগণ কোনো প্রদেশের বা জেলার গভর্নর পদ লাভ করেছিলেন। সিরিয়াতে ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান তার ভ্রাতা মুয়াবিয়ার উত্তরাধিকার সূত্রে এবং স্পেনে আবদুল আজিজ তাঁর পিতা মূসা বিন নুছায়ের-এর পথ অনুসরণ করেন। মুয়াবিয়ার খেলাফতে বসরায় জায়িদের পুত্র ওবায়দুল্লাহ তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং পরবর্তী সময় কুফার গভর্নর হন। কিন্তু এ সকল ঘটনা ছাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শাসকগণ তাদের নিজের ইচ্ছানুসারে খেয়াল খুশি মতো প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করে থাকতেন। প্রাদেশিক শাসকদেরকে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে বদলী করে পাঠানো হতো কিন্তু এ রকম ঘটনাও খুব বিরল ছিলো। মোটকথা হলো যে, আব্বাসীয়দের খেলাফতে আসার পূর্ব পর্যন্ত আরবের শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিলো একাত্মক পদ্ধতির। যদিও এটাকে যুক্ত রাষ্ট্রীয় বলা যায়।

উমাইয়াদের শাসনকাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অনেক বিখ্যাত গভর্নর এবং যোদ্ধাগণ উমাইয়া শাসকদের কোপানলে পড়ে তাদের অর্থ ও সম্পত্তি হারিয়েছেন এবং পদে পদে অসম্মানিত হয়েছেন। স্পেন বিজেতা মূসা বিন নুছায়েরকে ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত করা হলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে না খেয়ে নিশ্চল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়। সিন্ধু বিজেতা মুহাম্মাদ বিন কাসিমকেও নির্দয়ভাবে মারা হয় এবং ইয়াজিদ ইবনে মুহাল্লাবকেও বন্দীশালায় অপমানের সংগে কালাতিপাত করতে হয়। এ সকলই সামন্তবাদ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রাপ্তির বাধা স্বরূপ ছিলো এবং এ সকল কারণেই উমাইয়া খেলাফত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়।

আব্বাসীয় শাসন আমলে আরব সাম্রাজ্য একাত্মক পদ্ধতি সরকারের প্রকৃতি বিলুপ্ত হয়। কেন্দ্রের সংগে স্পেনের কোনো যোগসূত্র ছিলো না। ৭৮৫ খৃস্টাব্দে ইদ্রিসীয় শাসকগণ 'ফেজে' তাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে 'আল

www.pathagar.com

মাগরেব' পর্যন্ত রাজত্ব কায়েম করেন। ৮০০ খৃষ্টাব্দে ইবরাহীম ইবনে আগলাবের দ্বারা আফ্রিকায় তিউনিসিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। অপরপক্ষে ৭৮০ খৃষ্টাব্দে আহমদ ইবনে তুলুনের অধীনে মিশর স্বাধীন হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে অনেক প্রদেশ সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই তাহিরাইদ, ছাফাবাইদ, সামানাইদ, গজনাতাইদ, বুয়াইদ এবং সালজুকগণও এ কারণে স্বাধীনতা লাভ করে এবং নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করতে থাকেন।

রাষ্ট্রীয় বিখণ্ডতার মুখেও আব্বাসীয়গণ অনেক কাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মুসলিম সাম্রাজ্যকে এককভাবে টিকিয়ে রাখেন যা পরবর্তী সময় দুর্বল খলিফাগণের দ্বারা সম্ভব হয়নি। আব্বাসীয় খেলাফতের শেষের দিকে মুসলিম সাম্রাজ্য পুরাতন কালের কায়দায় বৃটিশ কমনওয়েলথ ভুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর মতো সন্নিবদ্ধভাবে ছিলো। সেখানে স্বাধীন নৃপতিগণ শুধু মাত্র পাপেট খলিফার প্রতি আনুগত্য দেখানো হতো কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তারা সর্বদিক দিয়ে স্বাধীন ছিলো।

সবশেষে বলতে হয় যে, প্রথম দুই শতাব্দী পর্যন্ত আরব সাম্রাজ্যে একাত্মক পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তারপর যখন আগলাবাইদ শাসকগণের মতো আহমদ ইবনে তুলুন খলিফার কাছে কর পাঠাতে লাগলো তাতে আরব সাম্রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের প্রকৃতি দেখা গেলো। পরে আরব সাম্রাজ্য কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে কনফেডারেশন গঠিত হয়। তাঁরা বহিঃ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কেবল মাত্র খলিফার আনুগত্য স্বীকার করতো। বর্তমান বিশ্বেও এ কারণে অনেক দেশ স্বাধীন থেকেও জোটভুক্ত হয়। কারণ জোটভুক্ত থাকলে বিপদের সময় জোটভুক্ত দেশগুলোর সাহায্য পাওয়া সহজ হয়।

নাগরিকদের শ্রেণী বিভাগ

সে যুগে আরব দেশে সূত্রগতভাবে চারটি শ্রেণীর নাগরিক ছিলো যেমন— স্বাধীন মুসলমান, মুসলমান স্ত্রীলোক, মুসলমান ভৃত্য বা দাস এবং অমুসলমান। কিন্তু প্রকৃতভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জন্ম এবং আচার ব্যবহারে জাতিগতভাবে তারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজ্য ছিলো। আরব রাষ্ট্র সকল নাগরিকদের সমানভাবে দেখা হতো। প্রকৃতপক্ষে সকল স্বাধীন মুসলমান এক, কিন্তু হযরত (স)-এর আত্মীয় স্বজনদের এবং তাদের মধ্যে খুম্‌সের অংশ পাওয়ার ব্যাপারে পার্থক্য করা হতো। আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যেও পার্থক্য করা হতো। হযরতের ওফাতের পর এটা নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো

www.pathagar.com

যে, কুরাইশ ছাড়া অন্য কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না তবে তারপর আইনগতভাবে যা হওয়া উচিত ছিলো তাও হয়নি। উমাইয়াদের আমলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত নব্য মুসলমানদেরকে নিম্ন শ্রেণীর লোক হিসাবে গণ্য করতো এবং তাদেরকে খারাজ এবং জিজিয়াও দিতে হতো। এটাই ছিলো মুক্ত স্বাধীন মুসলমান এবং নব্য মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য।

শাসনতন্ত্রের আইন অনুসারে স্ত্রীলোকেরা প্রকৃতপক্ষে নিম্ন শ্রেণীর বলে বিবেচ্য হতো। সম্ভ্রান্ত মহিলারাও শাসনতন্ত্র অনুসারে খলিফা বা গভর্নর হতে পারতো না। মহিলাগণ কোনো বিভাগেরও প্রধান হতে পারতো না। মন্ত্রীত্ব তাদের ভাগ্যে ছিলো না। মহিলাদের মধ্যে কাউকেও বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ সভায় ডাকা হতো না। অনেকের মতে মহিলারা বিচারক হতে পারতো, কিন্তু আরব সাম্রাজ্যে খেলাফতের যুগে এ রকম কোনো ঘটনার ইতিহাস পাওয়া যায় না। যদি তাই হতো তাহলে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর স্ত্রী বা অন্যান্য উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহিলাগণ তা পেতেন।

দাসগণ মুসলমান হলেও তাদের নিম্ন মর্যাদা দেয়া হতো। মুসলিম ভৃত্যের জীবন ও একজন স্বাধীন মুসলমানের জীবন কখনও এক হতে পারে না, কারণ তারা কৃতদাস। যেহেতু তারা দাসত্ব মুক্ত হয়ে স্বাধীন লোকদের প্রধান হতে পারে না সেহেতু তাদের মর্যাদা স্বাধীন মুক্ত মুসলমানের সমান হতে পারে না, যদিও আইনের চোখে উভয়ে সমান মর্যাদা সম্পন্ন। তবে ইতিহাসে দেখা যায় যে, ভৃত্যগণ দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রথম শ্রেণীতেও উপনিত হয়েছিলো। আরব সাম্রাজ্যে কোনো কোনো সময় স্বাধীন কৃতদাসগণও শাসক হয়েছিলো।

তবে অমুসলিম প্রজাবৃন্দ আরব সাম্রাজ্যে কোনো সরকারী গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ পায়নি। একজন অমুসলিম কখনও সাম্রাজ্যের খলিফা, বিচারক, গভর্নর এবং মজলিসে শুরার সদস্য হতে পারতো না। তাদেরকে খারাজ এবং জিজিয়া দিতে হতো। তার বদলে রাষ্ট্র তাদের জীবনের ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করতো। সূত্রগতভাবে অমুসলিমগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো যেমন, ইয়াহুদী এবং খৃস্টান ও অন্যদিকে ঈশ্বরবাদী। ইসলামের প্রথম যুগে ইয়াহুদীগণ এ নূতন রাষ্ট্রের বিরোধিতা করায় বেশ ক্লেশ ভোগ করেছে তবে শাসনতান্ত্রিকভাবে যা পাবার তা পেয়েছে। অপরপক্ষে খৃস্টান ধর্মাবলম্বীগণ বিভিন্ন দিক দিয়ে সাহায্য পেয়েছে। ইয়াহুদীগণ মুসলমানদের বিরোধিতা করায় শত্রুরূপেই বিবেচিত হয়ে আসছে।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময় সনদ দ্বারা খৃস্টানদেরকে অনেক বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় এবং মুসলমানদেরকে এ সনদ ভংগ না

www.pathagar.com

করার জন্য আদেশ ও নির্দেশ দান করা হয়। আর সতর্ক করে দেয়া হয় যে, যদি কেউ এ সনদের বিরুদ্ধে কোনো বিরোধিতা করে তবে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। এ সনদ দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (স) খৃষ্টানদের এবং তাদের ধর্মযাজকদের ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পত্তি, জীবন এবং সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার ওয়াদাবদ্ধ হন। তাদের উপর অন্যায়ভাবে কোনো কর বসানো হবে না। কোনো ধর্মযাজককে অন্যায়ভাবে কোনো গীর্জা থেকে তাড়ানো হবে না, কোনো খৃষ্টানকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো হবে না, কোনো সাধু পুরোহিতকে তার মন্দির থেকে বিতাড়িত করা হবে না। কোনো হজ্জযাত্রিকে তার যাত্রায় বাধা প্রদান করা হবে না। কোনো মসজিদ বা মুসলমানদের গৃহ নির্মাণ কল্পে কোনো গীর্জা বা মন্দিরকে ভেংগে দেয়া হবে না। খৃষ্টান মহিলাগণও মুসলমানদেরকে বিবাহ করার অনুমতি পেলো এবং এর জন্য তাদেরকে কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখিন হতে হতো না। যদি কোনো সময় খৃষ্টানগণ তাদের গীর্জা বা মন্দির নির্মাণের জন্য মুসলমানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো তবে মুসলমানদেরকে তাদের উক্ত কাজে সাহায্য করতে হতো এবং তারাও সাহায্য পেয়ে থাকতো। আরব দেশে সেকালে মানুষ হিসাবে মানুষকে তার মর্যাদা দান করা হতো।

আল 'হীরা' অধীনস্থ হওয়ার সংগে সংগে সেখানের লোকজন যখন মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করলো তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ ঘোষণা করলেন যে, খৃষ্টানদের জান, ধন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে এবং তাদের নিয়মতান্ত্রিক কোনো বাধা দেয়া হবে না। তারাও এ ঘোষণায় তখনকার খলিফা হযরত আবুবকর (রা) এবং তাঁর পরামর্শদাতাগণ—যেমন হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী (রা) এবং হযরত (স)-এর অন্যান্য জ্ঞানী ও খ্যাতি সম্পন্ন সংগীগণ স্বীকারোক্তি জানান। এমন কি খৃষ্টানদের মধ্যে বানু নাজরান এবং বানু তাগলিবগণও সাহয্যের জন্য তাদের কাছে আসেন।

বহু বা অনেকিশ্বরবাদীদেরকে নিম্ন শ্রেণীর বলে বিবেচনা করা হতো বলেই তারা সমাজে ঘৃণিত ছিলো। তাদেরকে কোনো সুযোগ সুবিধা দেয়া হতো না। যদি তারা জিজিয়া কর দিতো বা মুসলমান হতো তবে তাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা হতো। প্রথমতঃ আরবরা যে সকল নাস্তিক্যবাদী লোকদের সংস্পর্শে আসেন তারা হলো বারবারস এবং তুর্কী। তারা নীচ সভ্যতার লোক। প্রথম অবস্থায় তারা আরবদের হাতে বেশ ক্লেশ ভোগ করে এবং পরবর্তী সময় সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। এতে প্রতীয়মান হয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্ম, সহায়-সম্পত্তি, অর্থ দ্বারা নাগরিকদের শ্রেণী বিন্যাস করা হতো। এভাবে যুগ হতে যুগান্তর পর্যন্ত চলছে এবং চলবে।

www.pathagar.com

আইনের শাসন

মূলত আইনের শাসন কেবলমাত্র স্বাধীন মুসলমান এবং জিম্মিদের জন্য প্রযোজ্য ছিলো কিন্তু বাহ্যত ব্যবহারিকভাবে এর অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষণীয়। একটা ঘটনা দিয়েই বুঝা যাবে যে, হযরত ওমর (রা)-এর পুত্র মদ খেলে তাকে কঠোর বেত্রাঘাত দেয়ার শাস্তি প্রদান করা হয় এবং ঐ সময়েই সে মারা যায়। এ রকম কোনো ঘটনা ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাসে খুবই বিরল বা পাওয়া যাবে না। তবে রাজপুত্রদেরকেও তাদের কোনো না কোনো অপকর্মের জন্য শাস্তি দেয়া হতো। রাজকীয় হত্যাকারীদের জীবনের বিনিময়ে রক্তপণ পাওয়া যেতো।

তখনকার দিনে সকলের জন্য একই আইন প্রবর্তিত ছিলো। ফ্রান্সের মতো রাজকর্মচারীদের জন্য ভিন্ন কোনো আইন ছিলো না। আইনের শাসন ছিলো বলে একই আইন দ্বারা জনসাধারণ এবং রাজকীয় কর্মচারীদের শাসন করা হতো। খলিফা ছাড়া সবাইকে আইনত বিচারকের সম্মুখে হাজির হতে হতো। তবে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের খলিফাগণ এবং স্বাধীন শাসকগণও বিচারকের দরবারে হাজির হতেন এবং আইনগতভাবে বিচারকের রায় মাথা পেতে মেনে নিতেন। বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে তাদের কোনো আপত্তি চলতো না বা কখনো কেউ করতেন না। কারণ আইনের শাসনে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করতেন। উল্লেখ্য হযরত ওমর (রা)-ও বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। খলিফা বলে ইসলামী শাসনতন্ত্রের বরখেলাপ করেননি।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ

সে সময় আরবে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র ছিলো। ইসলামের প্রথম যুগে আরবে কোনো সুষ্ঠু বিচার বিভাগ ছিলো না। তবে হাকিম এবং কাজীরা নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা যে কোনো বিষয়ের নিষ্পত্তি করতেন এতে তাদের বিচার পদ্ধতি ছিলো পূর্ণ স্বাধীন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময় আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ ছিলো স্বতন্ত্র। কোনো বিভাগের কাজ অন্য বিভাগের কাজের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত বা বিঘ্নিত হতো না। তাই হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আইন প্রণেতা, শাসক এবং শ্রেষ্ঠ বিচারক হিসেবে বিবেচিত হন।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর

খলিফাগণ নামে প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারকার্য চালাতেন কারণ পুরা সময়েই তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় ব্যস্ত থাকতে হতো। সুতরাং

www.pathagar.com

একমাত্র শুক্রবার বা নির্দিষ্ট কোনো দিন ছাড়া খলিফা কোনো বিচার কার্য পরিচালনা করতেন না। কাজী উল কুজ্জা ও কাজীগণ সাধারণতঃ বিচার কার্য চালাতেন। যেখানে কোনো মামলায় দেশের উর্ধতন ও সম্মানী ব্যক্তিগণ জড়িত থাকতেন এবং তাতে খুব কড়া শাস্তির প্রয়োজন হতো সেখানে খলিফা নিজেই বিচার করতেন। আল মামুন তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে কাজীর কাছে বিচার প্রার্থী হলে কাজী তাঁর সম্মুখে বিচার কার্যসমাধান করে দেন। সে বিচারে যুবরাজ দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে বাদীর নিকট দুঃখ প্রকাশ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিলো।

ইসলামের পূর্বে আরব দেশে ধীরে ধীরে আইনের শাসন প্রবর্তিত হয় এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময় সকল প্রচলিত আইনকে সংগৃহীত করে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরে পবিত্র কুরআন দ্বারা তার পূর্ণতা দেয়া হয়। অন্যদিকে সুন্নতও এর পূর্ণাংগতা দান করতে সহায়ক হয়। যেখানে আল কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝা যেতো না সেখানে সুন্নাহ্ দ্বারা বিশ্লেষণ করা হতো। যেখানে আইনে কোনো অসংগতি মনে হতো সেখানে এর সমাধান কল্পে আইনজ্ঞদের মতামত ও ব্যাখ্যা নেয়া হতো। খলিফাদের সময় খুব বেশী আইনের পরিবর্তন হয়নি তবে যা হয়েছে উহার মধ্যে আইনজ্ঞদের পূর্ণ সমর্থন ছিলো। খলিফা তাঁর কাজে সহায়তার জন্য তিনটি শ্রেণীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তারা হলো আইনজ্ঞ, বিচারক এবং শাসক। খলিফা নিজেও কোনো সময় এ তিনটি পদের কাজ চালিয়ে যেতেন, কারণ তাকে সকলের চেয়ে জ্ঞানী-গুণী, আইনজ্ঞ ও সাধক বলে বিবেচনা করা হতো বলেই খলিফার পদে বসানো হতো। এ তিনটি বিভাগই সরকারের শাসন ক্ষমতার প্রধান উৎস তাই সকল দায়িত্ব খলিফার উপর ন্যস্ত হতো।

শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ইমাম আবু ইউসুফ প্রধান বিচারকের পদ অলংকৃত করেন। কিন্তু এ কাজ শাসক এবং শাসন থেকে স্বতন্ত্র ছিলো। তাদের বিচার কাজের উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতো না। তারা এক দিকে শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ অন্যদিকে আইনজ্ঞ। অনেক সময় ইমাম আবু হানিফা বিচারকের কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুফতীগণ অনেক সময় আইনজ্ঞদের প্রতিনিধিত্ব করতো। তবে কুরআন ও সুন্নাহর বাহিরে কেউ কোনো রকম বিচার কার্য বা আইনের প্রয়োগ করতে পারতেন না ও করতেন না।

অব্যবহারিক এবং ব্যবহারিক এর মধ্যে পরিবর্তন

বৃটিশ শাসনতন্ত্রে দেখা যায় যে, যেহেতু তারা দেশের প্রচলিত রীতি-নীতির উপর নির্ভর করতো সেহেতু শাসনতান্ত্রিক সূত্র এবং সরকারের

www.pathagar.com

রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান ছিলো যা অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় না। এখানে ইসলামী শাসনতন্ত্রে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। যদিও বুয়াইদ এবং পরবর্তীতে মিশরের মামলুক সুলতানগণ আব্বাসীয় খেলাফতের পার্থিব স্বীকৃত আইনগুলোকে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারোপযোগী করে দেন এবং বাহ্যত তারা মনে করেন যে, রাজনৈতিক কারণে কোনো কোনো কাজ খলিফার সহি মোহরে হওয়া অত্যাবশ্যক। পার্থিব কোনো কোনো কাজ যেমন উজির ও গভর্নরদের মনোনয়নে খলিফার সহি মোহরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো কোনো ব্যাপারে যেমন শাসনকর্তার মনোনয়নের পত্রে ঘটাকরে সহি করার অর্থ দাঁড়ায় তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে চলে আসছেন। যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যে রাজা বা রাণী প্রধান মন্ত্রীর হাতের পুতুল স্বরূপ। পরবর্তীতে আব্বাসীয় যুগে ক্ষমতাবান আমীর ও সুলতানদের হাতে খলিফাগণ কাঠের পুতুলের মতো ছিলেন। তাঁদের করণীয় কিছু ছিলো না, কারণ তাঁরা নামমাত্র খলিফা বিবেচিত হতেন। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল ছিলো বলে আমীর বা সুলতানগণ কেন্দ্রের উপর তাদের কর্তৃত্ব খাটাতে পারতেন তাতে আব্বাসীয় খলিফাদের কিছুই করণীয় ছিলো না।

নমনীয়তা

আরব সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র বেশ নমনীয় প্রকৃতির ছিলো। ইসলামী আইনের মতো শক্ত ছিলো না। যদিও ইসলামী আইনের গুরুত্ব আল কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক বেশ পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তারপরও এটা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ছিলো। আল কুরআনে বর্ণিত এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) দৈনন্দিন রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধান সম্বন্ধে যা বলেছেন যুক্তিসংগতভাবে তার আবশ্যকতা ছিলো অপরিসীম। সুতরাং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা এবং এর শাসনতান্ত্রিক বর্ণনাকে সর্বসাধারণ্যে গ্রহণযোগ্য করার সম্পূর্ণ ভার শাসক এবং জনসাধারণের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। যেহেতু সে সময় সকল কাজে সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করতে পারতো না সেহেতু শাসকগণই ছিলেন সকল ব্যাপারে সার্বভৌম। প্রাগ ইসলামী যুগে বিধিবদ্ধভাবে কোনো শাসনকর্তা ছিলো না। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর শাসনকালে আরবগণ গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র লাভ করে এবং শাসক পান।

আরব সাম্রাজ্যে মুসলমানদের জীবনযাত্রা বেশ শৃংখলাবদ্ধ ছিলো। কেউ আল কুরআন ও সুন্নাহ্র বিপরীতমুখী কোনো কাজ করতে পারতেন না। তবে ইসলামী বিধানে সকলেই খুব সুখী ছিলেন। মুসলমানগণ ইসলামী সংবিধানের মধ্য দিয়ে তাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো প্রকার সরকার গঠন

www.pathagar.com

করতে পারতো। এতে বুঝা যায় যে, তখনকার দিনে মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র বেশ নমনীয় ছিলো। সরকার কিভাবে হবে সে সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মাদ (স) নিজে কোনো শাসন বা আদেশ জারী করে যাননি। তখনকার দিনে যদি সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্ত জ্ঞানী ও আইনজ্ঞ মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে কোনো জ্ঞানী ও বিজ্ঞ কিন্তু গরীব মুসলমানকেও মুসলিম সাম্রাজ্যের ও মুসলিম জাতির নেতা, খলিফা বা রাষ্ট্রপতি বানাতেন তবে তাতে কারো কোনো আপত্তি থাকতো না। তাতে আল্লাহর আদেশও অমান্য করা হতো না। এতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় মুসলমানগণ তাদের ইচ্ছানুসারে জাতির স্বার্থে ও কল্যাণের জন্য যে কোনো রকম সরকার গঠন করতে পারে। তবে সৈরাচারতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র যেহেতু ভালো সরকার নয় সেহেতু ভুলেও জাতির স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে কারো স্বার্থ সিদ্ধির জন্য খেয়াল খুশি মতো সরকার গঠন করে ক্ষমতার অপব্যবহার করা উচিত নয়। স্মরণ রাখা উচিত সীমালংঘনকারীকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করেন না। সুতরাং জাতির মংগলের জন্য সকলের একযোগে কাজ করা উচিত।

❐

www.pathagar.com

আরব শাসনতন্ত্রের মূল উৎস

আরব শাসনতন্ত্রের মূল উৎস খুঁজতে হলে প্রাক ইসলামী যুগে চলে যেতে হবে। কারণ মানুষের বসতি স্থাপনের পর সেখানে একত্রিত হয়ে বসবাস করার জন্য মানুষের কোনো না কোনো আচার-ব্যবহার ও পারিবারিক শাসনের প্রয়োজন হতো। সেরূপ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও আরব দেশে গোত্রীয় শাসন বলবৎ ছিলো। তাই প্রথমতঃ আরব সাম্রাজ্যের পূর্বেকার ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো ছিলো পক্ষান্তরে আরব শাসনতন্ত্রের উৎস। ইসলামের আবির্ভাবের পর এটাই আরব শাসনতন্ত্রের রূপ নেয়। দ্বিতীয়তঃ সরাসরি বা অন্যভাবে পবিত্র কুরআন থেকে অনেক নির্দেশ ও উপদেশ পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহীহ হাদীস আরব শাসনতন্ত্রের জন্য ছিলো অমূল্য সম্পদ। কারণ সে যুগে আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) যে সমাজব্যবস্থা কায়েম করেন আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এর নজীর নেই। চতুর্থতঃ মজলিশে শুরা এবং নবী করীম (স) যে সাধারণ সভা করতেন যেখানে তার উত্তরাধিকারীগণ আরব শাসনতন্ত্র এবং ব্যবস্থাপনার উপর যে অভিমত প্রকাশ করতেন তা আরব শাসনতন্ত্রের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। তাদের আদেশ উপদেশ ও নির্দেশ সকল জাতিকে মান্য করে চলতে হতো। পঞ্চমতঃ খলিফা হযরত ওমর (রা) যে অভিমত প্রকাশ করতেন তাও আরব শাসনতন্ত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। ষষ্ঠতঃ আইনজ্ঞদের ঐকমত্যের সমন্বয়ে যে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গ্রহণ করা হতো তাও শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় তথ্য হিসাবে পরিগণিত হতো। কারণ কুরআন ও হাদীসে যে সকল বিষয়ের পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যেতো না সেগুলোর উপর কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি হিসাবে ধরে বিধানানুসারে মতামত দেয়া হতো। বর্তমানে ইহার প্রচলন আছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার মতো বিজ্ঞলোক খুব কম পাওয়া যায়। সপ্তমতঃ কুরআন ও হাদীসের উপর বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিবন্ধ ও প্রবন্ধগুলোতে বিভন্ন ব্যাখ্যায় তাঁরা সকল অস্পষ্ট ধারাগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহর সংগে মিলিয়ে বা সম্মতি রেখে বর্ণনা দিয়েছেন। অষ্টমতঃ সকল মত আরব সাম্রাজ্যে ও বিভিন্ন ভাষাভাষি ও জাতির আচার-ব্যবহারের সংমিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত সেহেতু কোনো শাসকই তাদের প্রচলিত আচার-ব্যবহার, চলন, কর্মপদ্ধতিকে বাদ দিতে পারেনি। কারণ শাসনতন্ত্রের প্রণয়নে তাদেরও মূল্যবান অবদান আছে। নবমতঃ বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিশেষ করে আল মাওয়ার্দীর গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো ইসলামী

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে জানতে ও বুঝতে সহায়ক। সর্বশেষ ইজমার পর কিয়াস মুসলিম আইনজ্ঞদেরকে তাদের সূত্র এবং মতামতগুলোকে কুরআন ও হাদীসের সংগে সংগতিপূর্ণ করতে সহায়ক হয়েছে।

১. ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পটভূমি

পুরাকালে আরব দেশে কোনো শাসনতন্ত্র ছিলো না। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর যে সকল শাসনতান্ত্রিক পটভূমি পাওয়া গেছে তা কেবল পৌরাণিক প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষের ফল। যদিও এ দলিল-পত্রাদি খুব ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট তবুও এর ব্যাখ্যা ছিলো খুব স্পষ্ট। এর উপর ভিত্তি করে শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেয়াটা খুবই যুক্তিযুক্ত ছিলো। এদ্বারা আরব-অনারবীয়, নারী-পুরুষ এবং কুরাইশ-অকুরাইশদের মধ্যে যে বৈষম্য তা জানা গেলো। যেহেতু সেকাল থেকেই কুরাইশ এবং অকুরাইশদের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান ছিলো সেহেতু একটা ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হবে যে, হযরত ওমর (রা)-এর ছেলে একজন নিরপরাধ অনারবীয়কে হত্যা করে, কিন্তু তা শুধু প্রাক ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠন প্রণালীর জন্যই সম্ভব ছিলো। শাসনতন্ত্র পাওয়ার পর এরূপ জঘন্য কাজ করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

অনারবীয়দের প্রভাবের দরুনই দাসগণ অনেক অনেক দেশের শাসনকর্তা হতে পেরেছিলেন। এ প্রভাবও আরব দেশে পড়ে এবং ইসলামী শাসনতন্ত্রে এর পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। খেলাফত যুগে কোনো দাসই আরব সাম্রাজ্যের শাসক হতে পারেনি কিন্তু পরবর্তী সময় কালের প্রভাবে অনেক দাস আরব শক্তির সম্মুখে আরবদেরকে পরাভূত করে বহু মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন, যার নজীর ইতিহাসে পাওয়া যায়।

২. আল কুরআন

পবিত্র কুরআনকে সকল বিশ্বের মুসলমানগণ শ্রদ্ধার সংগে সম্মান ও তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসাবে কায়মন বাক্যে গ্রহণ করে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মারফত এ পবিত্র গ্রন্থ পৃথিবীতে মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেন। এ পবিত্র গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বের জন্য নিয়ামাত স্বরূপ। এ গ্রন্থে সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। কুরআন হলো বিশ্বাসীদের জন্য অমূল্য সম্পদ। এখানে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান এবং সকল বিজ্ঞানের সমাধান পাওয়া যায়। ইমাম আস সুয়ুতীর মতে মারাতিবুল ওহী বা প্রত্যাদেশ বা ঐশ্বীবাদের চারটি প্রধান আদর্শ বা রীতি আছে যেমন ঃ

www.pathagar.com

(১) কাশার ঘন্টার শব্দ শোনার মতো অস্বাভাবিক শব্দ শুনতেন যার গুরুত্ব ছিলো অর্থবহ। অতীতে একটা ধারণা সরাসরি তাঁর মনে প্রতিভাত হয় এবং এর রশ্মি বিদ্যুত চমকের মতো তাঁর অন্তরে প্রদিপ্ত হয়ে উঠে।

(২) রাসূলের মনে দাগ কাটা এবং কানে কোনো পরামর্শ শোনার মতো।

(৩) রাসূলের কাছে শারীরিক অবস্থায় কারো আগমন এবং অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এবং আল্লাহর বাণী অবিকৃতভাবে তাঁর কাছে পৌছে দেয়া।

(৪) ঘুমন্ত বা হাটা অবস্থায় আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরি প্রত্যাদেশ পাওয়া। এসব স্বপ্ন বা অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ অর্থ থাকে এবং সেই অর্থ অত্যন্ত গূঢ় ও রহস্যাবৃত।

হযরত হারিস ইবনে হিসাম হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কিভাবে আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যাদেশ বা ওহী পেয়ে থাকেন। তার উত্তরে নবী করীম (স) বললেন, "প্রত্যাদেশ কখনো কখনো আমার কাছে ঘন্টার ধ্বনির মতো আসতো এবং তা আমাকে এমনভাবে পরাভূত করতো যে, আমি ঘর্মাক্ত হয়ে যেতাম। তারপর তিনি চলে গেলে আমি তাঁর উক্তি স্মরণ করতাম" এ পদ্ধতি কঠিন ছিলো। রাসূল (স) ব্যতীত অন্য কেউ এ শব্দ শুনতে পেতেন না। যখন রাসূল (স) এ পন্থার মধ্য দিয়ে প্রত্যাদেশকে পেতেন তখন এটা তাঁর কাছে অতিশয় কঠিন বলে মনে হতো এবং এর জন্য তাঁকে খুব ক্লেশ করতে হতো কারণ প্রকৃতভাবে এটা খুব শক্ত ও কঠিন প্রকৃতির ছিলো। এটা খারাপ লোকের জন্য সতর্ক এবং ভয়াবহ ছিলো।

ঘন্টার মতো শব্দ শোনার কারণ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'তে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেমন ঃ "যখন দর্শনের মানবিক শক্তি অন্য কোনো কঠিন শক্তি দ্বারা পরাভূত তখন বিভিন্ন রং প্রকাশ পায়। সেরূপভাবে যখন শ্রবণ শক্তি হতবুদ্ধি এবং অচেতন হয়ে যায় তখন খুব অস্বাভাবিক শব্দ শ্রুত হয়।" এটি সত্যিকার জলন্ত প্রমাণ যে, এ অবস্থায় যে শক্তি রাসূলকে পরাভূত করতেন, তখনই তাঁর কাছ থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ বা ওহী পেতেন এবং তাঁর মনে হতো যে এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।

হযরত হারিস ইবনে হিসামের প্রশ্নের শেষ পর্বের উত্তরে রাসূল (স) বললেন, "কখনও কখনও ফেরেশতা আমার কাছে মানুষের আকৃতি ধরে আসতেন এবং আমাকে যা বলতেন আমি তা হৃদয়ঙ্গম করতাম।"

www.pathagar.com

এ বিষয়ে ইমাম গাজালীর উক্তি নিম্নরূপ ঃ

"When the faculty of perception is so strong that its engagement with the body dose not hinder it from reaching the sacred sources, and, at the same time, if the imagination is strong enogh to divert the brain from external senses, the faculty of perception reaches, even in walking, the bare intelligences and heavenly souls and gets knowledge of the secrets in a comprehensive way.

Then the faculty of imagination converts those secrets into particular pictures suited to them. They are then carried to the retina become sensed facts. It has happened in the case of some people that they heard versified speeches and saw beautiful appartitions addressing them in a versified language regarding things concerning them and thing relating to others."

In another place the same author writes :

"But sometimes beautiful froms of angelic essences appear to prophets and saints and reveal and inspire unto them ; so that they meet with things which others meet with in dreams. This is due to the extreme purity of their inner qualities."

এ ব্যাপারে হযরত ইমাম আল গাজালী বলেন, "যখন ধীশক্তির উপলব্ধি খুব প্রবল হয় তখন শরীরের সংগে এর মিলনে সেই পবিত্রতার মূলে পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না, এবং পরক্ষণে কল্পনাশক্তি যদি মেধা শক্তিকে বাহ্যিক জ্ঞান থেকে অন্যদিকে পরিচালিত করতে খুব কার্যক্ষম হয় তখন ধীশক্তির উপলব্ধি জাগরণে, জ্ঞানে এবং স্বর্গীয় আত্মায় পৌঁছে এবং এভাবে সঠিকরূপে গোপন বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধান পায়। তখন কল্পনার মনোবৃত্তিগুলো সেই সকল গোপন জ্ঞানের মূল সত্ত্বাগুলোকে তাদের পসন্দ মতো নির্দিষ্ট সত্ত্বার রূপান্তরিত করে থাকে। এটা ইন্দ্রিয় শক্তিতে জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দেয় এবং জ্ঞানের বিষয় হয়ে ধরা দেয়। এটা কিন্তু লোকের জন্য ঘটেছে যে তাঁরা জ্ঞানগর্ভ শুনেছে এবং সুন্দর আকৃতিকে তাঁদের সামনে উন্নত ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাদের এবং অন্যদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর বক্তৃতা করতে দেখেছিলেন তাঁরই ফলশ্রুতি।"

অন্য স্থানে ইমাম গাজালী বলেছেন, "কিন্তু কোন সময় সুন্দর আকৃতিতে রাসূলের এবং বিশ্বাসীদের কাছে কেবল ফেরেশতার বেশে এসেছেন এবং

www.pathagar.com

তাঁদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন কারণ তারা কোনো বিষয়ের সংগে প্রত্যক্ষ মিলতে বা সাক্ষাত করতে পারে যা অন্যরা স্বপ্নে পেতে পারে। ইহা শুধু তাঁদের অন্তর্নিহিত পবিত্রতা এবং গুণাগুণের জন্য।"

ইবনুল আরাবী লিখেন, "যখন একজন সাধক একজনের আকৃতি দেখেন যে তাকে অনেক বিষয় সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় যা পূর্বে কখনও তিনি জানতেন না এ আকৃতিটা ছিলো তাঁর নিজের থেকে নিজেরই। ইহা আয়নার প্রতিচ্ছবির মতো যা লম্বা, গোলাকৃতি, ছোট বড় প্রভৃতি আকৃতির যা শুধু মাত্র আয়নার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। কল্পনায় মানুষ যে প্রকৃতির কথা ভাবে তা বাহির জগতে স্থায়ীত্ব হয় না। এবং ইচ্ছাশক্তি এগুলোর স্থায়ীত্বকে রক্ষা করে এবং কখনো ইহা নিঃশেষ হয়ে যায় না। যদি কোনো জ্ঞানী এর প্রতি লক্ষ্য না দেয় তবে এরা নিজ থেকেই অদৃশ্য হয়ে যায়।"

তৃতীয় সূত্র, যার মাধ্যমে রাসূল প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাহলো ইল্‌কা। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "যিনি জিব্রাইল (আ) তিনি আল্লাহর আদেশে এসব আপনার অন্তকরণে জ্ঞাপন করেছে। রাসূল প্রায়ই অনুভব করতেন যে, তাঁর অন্তকরণে কোনো না কোনো ধারণা দেয়া হচ্ছে। তাঁর কাছে যে আদর্শ জ্ঞান আসতো তাঁর নিজের ধারণা নয় বরং এটা পরিপক্ক অবস্থায় কোনো জানা সূত্র থেকে কারো দ্বারা বা কোনো অনুমানের মধ্যে উপস্থিত হতো। এ আদর্শ কেবলমাত্র বাহির দিক থেকে তাঁর মধ্যে উপস্থিত হতো অর্থাৎ আল্লাহর কাছ থেকে, অন্য কোথাও থেকে নয়।"

প্রত্যাদেশের চতুর্থ অধ্যায় হলো স্বপ্ন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "প্রথমতঃ হযরত মুহাম্মাদ (স) স্বপ্নে দেখতেন তখনই তিনি প্রভাতের আলোর মতো দেখতেন।" ইবনুল আরাবী বলেন, হাঁটাচলা বা ঘুমের মধ্যে অথবা কল্পনার রাজ্যে প্রত্যাদেশ একটা একক স্পষ্ট চিন্তা যা সুষ্ঠু চিন্তার মধ্যে বিরাজমান। কোনো কোনো সময় এটা ধারণাক্ষম জ্ঞান বা কল্পনার মাধ্যমে আসে। এটা ছিলো রাসূলের প্রথম অবস্থা বা প্রথম দিক।

ইবনে খালদুন বলেন, "আমাদের মধ্যে সকলেই মনে মনে ছবি দেখতে পাই। যখনই কোনো শব্দ বা কথা বলা হয় তখন এর জন্য কল্পনার প্রতিচ্ছবি হয় যা মনের কল্পনায় ধরা পড়ে। বস্তুত বাস্তবিক কল্পনা, যেমন জীবন এবং তাঁরা যদি মানুষের হয়, তবে বাক্যালাপের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম।"

প্রত্যাদেশের এ চারটি দিক যেহেতু সাময়িক প্রকৃতির সেহেতু কখনও এটাকে রহিত করা হয় আবার পুনঃ পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হয়।

www.pathagar.com

এর কারণ হলো যেহেতু আল কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝা মুসকিল সেজন্য সুন্নাহ দ্বারা এর পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বা হয়ে থাকে। রাসূলের যুগেও সময়ানুপাতে রাসূল ও রাসূলের জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সহকর্মীদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উহার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হযরত ওমর (রা)-এর জিজ্ঞাসার উপর নির্ভর করে রমজান মাসের রাত্রকে হালাল করা হয়েছে এবং রমজান মাসে ঘুমের পর খাওয়া কেবলমাত্র শ্রমিক সারমাতুল আনছারীর সংকটাপন্ন দশার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদিত হয়েছিলো। রাসূলের একজন অন্ধ সংগী আমর বিন উম্মে মাকতুমের প্রতিবেদনের উপর ৪র্থ অধ্যায়ের ৯৫ পংতিকে পরিবর্তন করা হয়েছিলো, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নহে অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তার সমান নহে।" যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (সূরা নিসা আয়াত ৯৫)। অধিকন্তু হযরত ওমর (রা)-এর পরামর্শ এবং সুপারিশক্রমে অনেক সুপারিশ এ চার প্রকার প্রত্যাদেশের সূত্রের মাধ্যমে সন্নিবেশিত করা হয়েছিলো। এতে বুঝা যায় হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে সকল কিছুর সঠিক এবং পুংখানুপুংখ নির্দেশ গ্রহণ করে সে অনুসারে সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করতেন—প্রকৃতপক্ষে তাই হতো।

ইবনে মুয়াবিয়াহ থেকে ইমাম আস সুয়ূতী বর্ণনা দেন, "অনেক নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর হযরত ওমর (রা)-এর মতামত এমনভাবে থাকতো যেভাবে কুরআনের প্রত্যাদেশও ঠিক সেই অনুসারেই আসতো।" এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী বর্ণনা দেন যে, "হযরত ওমর (রা) অনেক সময় সাধারণত বলতেন, আমি এবং আমার প্রভু অনেক সময় তিনটি বিষয়ের উপর একমত হতাম। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর (প্রেরিত) দূত মাকাম ইব্রাহীমকে আমাদের প্রার্থনার ঘরে পরিণত করে দেন।' এর উপর প্রত্যাদেশ এলো, 'মাকামে ইব্রাহীমকে প্রার্থনার ঘর হিসাবে গ্রহণ করো বা লও।' তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর (প্রেরিত) দূত আমি দেখছি যে এ ঘরে জ্ঞানী, ধার্মিক এবং অসৎ চরিত্রের লোক ঢুকছে এবং আপনার স্ত্রীদের দিকে তাকাচ্ছে। এটা খুব ভালো হতো যদি আপনি তাদেরকে পর্দার অন্তরালে থাকতে আদেশ দিতেন।' পর্দার উপর স্তবক প্রত্যাদেশিত হলো, 'যখন আপনি তাদের নিকট হতে কোনো জিনিস চান (অর্থাৎ হযরতের স্ত্রীদের কাছে) তখন যেনো কোনো

www.pathagar.com

পর্দার আড়াল থেকে চান।' তখনই দেখলাম রাসূল (স)-এর বিবিগণ তার চারিপাশে হিংসুকের মতো জড়ো হলো। আমি বলেছিলাম, 'বিবিগণের মধ্য হতে কাউকে তালাক দেয়াবেন এবং তার অপেক্ষা অধিকতর ভালো স্ত্রী দান করবেন।' দেখা গেলো পরবর্তীতে এ মর্মে আয়াত নাযিল হলো।"

"হয়তো আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তিনি তোমাকে তালাক দেন, প্রতিদান স্বরূপ তোমার চেয়ে ভালো স্ত্রী প্রদান করবেন যিনি অনুগত বিশ্বাসী, আল্লাহভীরু অনুতপ্ত যিনি রোজা পালন করেন, অবিবাহিত কি না বিবাহিত।" ওমর আরো বললেন, যখন এরূপ আয়াত প্রত্যাদেশিত হলো "আমি সৃষ্টি করছি মানুষকে মাটির নির্যাস হতে" সত্যিই আমি তখন আশ্চার্যান্বিত হলাম এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম কারণ কথাগুলো অহী আকারে বর্ণিত হয়েছিলো কেবল সেজন্যই।

হযরত ওমর (রা) কুরআনের নমনীয়তা এবং প্রগতিশীল প্রকৃতির ধারাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য তর্ক দ্বারা সমর্থন করেন কারণ সে দেশের ও সমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনে আল কুরআনের অসম্পূর্ণ আদেশকে (অর্থাৎ অস্পষ্ট আদেশ) গ্রহণ নাও করা যেতে পারে কারণ স্পষ্ট কোনো ধারণা না পেলে তা দ্বারা কোনো সঠিক ব্যবস্থা বা কার্যক্রম গ্রহণ করা অসম্ভব। এটা সবচেয়ে অন্যায় হতো যদি ইরাক, পারস্য, সিরিয়া এবং মিশর থেকে পাওয়া যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির অধিকাংশ অংশ রাসূলের কিছু সংখ্যক আত্মীয়দের হাতে চলে যেতো। সুতরাং কুরআনের স্পষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও এবং শেষ পংতিতে আল্লাহর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা) রাসূলের আত্মীয় স্বজনদের পাওনা অংশ দেয়া বন্ধ করে দেন। গোড়া হানাফী এবং মালেকী মাযহাবের মতে সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট অভিমত গ্রহণ করা যেতে পারে। যে বিষয়ে কুরআনের কোনো নির্দেশ পাওয়া না যায় সেখানে ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা উহার স্থান পূর্ণ করা যায়। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা চালিত হয়ে জ্ঞানী ও আইনজ্ঞদের এবং মজলিশে শুরার অভিমত অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যায়। তবে ইজমাকে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শরিয়ত আইন সন্নিবেশিত করা উচিত।

পবিত্র কুরআন হলো ধর্মগ্রন্থ যা মানুষের উন্নতি বিধানকল্পে নৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক বিধান। এটাকে মানুষের সাহার্য্যার্থে এবং উপকারের জন্য নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। কুরআনের অনুশাসন, পদ্ধতি এবং মূল উৎসকে মেনে সে অনুসারে সঠিকভাবে মানুষের মঙ্গলার্থে কাজে লাগানো

www.pathagar.com

উচিত। কারণ কুরআনে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যাবে অন্য কোনো কিছুতেই এ সকল পাওয়া যাবে না। তাই কুরআনকে প্রথমযুগের ইতিহাসের উৎসও বলা যায়।

আরব জাতীয় শাসনতন্ত্রের উৎস হিসাবে পবিত্র কুরআন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় বর্ণনা আছে। প্রথমতঃ হযরত আবুবকর (রা) আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তিনি এ সম্মান গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন আল্লাহর রাসূলের খলিফা হিসাবে পরিচিত হতে চাই। আল কুরআনের অনেক জায়গায় আল উজীর, উজির উল উজীর প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। যখন এ শব্দগুলোকে ব্যবহার করা হয় তখন একই রকম অর্থ মনে হয়। পরবর্তী সময় যখন উজীর এবং আমীরের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এ সকল বেশ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কুরআনে অনেক জায়গায়ই দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং ন্যায় বিচারের কথা উল্লেখ আছে।

যে সকল গ্রন্থকে পূর্বে শুধু মানুষের মঙ্গলের জন্য ধারণা করা হতো, যা ছিলো মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞানের আলয়, পরক্ষণে সেই পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন মানুষের প্রত্যেকটি কাজে-কর্মে স্পৃহা শক্তিকে আল্লাহর অধীনস্থতা স্বীকার করতে বাধ্য করলো। এ ধারায় পরক্ষণে এটা সত্যবাদীদের মুক্ত চিন্তা, মুক্ত ধারণা, ইচ্ছে মুক্ত কৌশল এবং মুক্তভাবে পৃথিবীতে স্থায়ীত্বের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে নতী স্বীকার করাকে উচিত মনে করলো। সে যুগে আরব দেশে গোত্রীয় কলহ চলতো, কেউ কারো অধীনতা স্বীকার করতে চাইতো না, কিন্তু কুরআনের আবির্ভাবের পর সেই অসভ্য আরবরাও এক আল্লাহর অধীনতা স্বীকার করে কলহ বিবাদ ভুলে এক সত্য ও ন্যায়ের অনুসন্ধানে একত্রিত হলো। তারা কুরআনকে মূলত সূত্র ও ব্যবহারিকভাবে সকল কাজের উৎস ও সমাধান বলে গ্রহণ করলো। অনারবীয় এবং অমুসলিমগণও আরবদের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো। তাই ইতিহাসে দেখা যায় যে এ রকম রাষ্ট্রের মতো আর কোনো রাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি কারণ এ রকম পবিত্র গ্রন্থের মতো পরিপূর্ণ কোনো গ্রন্থও পৃথিবীতে আসেনি। আল কুরআন হলো ইসলাম ও মুসলমানের পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

৩. সুন্নাহ

আল কুরআনের পরই সুন্নাহর স্থান। সুন্নাহর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটাতে রাসূলের আচার ব্যবহার, অভ্যাস, সংস্কৃতি, আকীদা প্রভৃতিই কেবল বিশ্লেষিত হয়েছে। এটা তাঁর ব্যবহার, কার্য পদ্ধতি, আদেশ এবং

www.pathagar.com

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কথা বা উপদেশ দিয়েছেন তাঁরই বর্ণনা। এ সকল শাসনতান্ত্রিকভাবে অমূল্য সম্পদ। পরবর্তীকালে অর্থাৎ আজ পর্যন্ত এ সকল মুসলমান প্রত্যেকের কাছে মূল্যবান বিষয় বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। শাব্দিক দিক দিয়ে হাদীস বলতে বুঝায় শ্রুতি বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রেরিত বাণী এবং সুন্নাহ হচ্ছে কার্যের বিধি বা ধারণা, অথবা জীবন পদ্ধতি। হাদীস বলতে বুঝায় রাসূলে করীম (স)-এর বাণী এবং সুন্নাহ—তার কার্যকলাপ বা নিয়ম। পরবর্তীকালে এটা বিশ্বাসীদের কাছে আইনদণ্ড হয়ে দাঁড়ালো। কারণ তিনি যে কথা বলে গেছেন তা এতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ যার কোনো তুলনা আজ পর্যন্ত এ জগতে মিলে না। প্রতিটি কথাই ছিলো এক একটি পরিপূর্ণ আইন।

হযরতের জীবনের শেষ দিক ছিলো খুব উন্নতমানের ব্যবস্থা যে কোনো দু'জন মুসলমান কোথাও দেখা হলে একজন রাসূলের হাদীসের কথা জিজ্ঞাসা করতেন এবং অন্য জনে হযরতের বাক্য বলতেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর তাঁর সুন্নাহ প্রকৃতভাবে হাদীস নামে পরিগণিত হলো।

প্রথম অবস্থায় হাদীস লেখা হতো না। হযরতের সংগীরা তাঁর কাছ থেকে যে উপদেশ, আদেশ এবং নির্দেশ পেতেন বা শুনতেন পরক্ষণে তা তাদের কাছ থেকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রকাশ পেতো। এভাবে একের পর একের কাছ থেকে তাদের উত্তরাধীকারীদের মধ্যে চলতে থাকতো। পরবর্তীকালে সকল সহীহ হাদীসগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও সেকশনে লিপিবদ্ধ ও সংগৃহীত হলো। এ সংগৃহীত হাদীসগুলোকে ছয়টি পুস্তকে প্রকাশ করা হয় যাকে ছিয়াছেত্তা বলা হয়, যেমন বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ আল কাজওয়ানী এবং নাসাঈ। অধিকাংশ হাদীস শাস্ত্রই আইন, ধর্ম, দেওয়ানী এবং শাসনতান্ত্রিক বিষয়ের সংগে সম্পর্কীত যা সেকালে এবং একালে রাষ্ট্রের নূতন নূতন সমস্যা সমাধান কল্পে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআনের যদি কোনো স্থানে বুঝতে অসুবিধা হয় তবে হাদীস শাস্ত্র বিশ্লেষণ দ্বারা এর সমাধান পাওয়া যায়। হাদীস দ্বারা কুরআনের পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া সহজলভ্য। সম্ভবত প্রথম হিজরীর গোড়ার দিকে হাদীস সম্বন্ধে এ প্রবাদ পচলিত ছিলো যে, "হাদীসে কুরআনের প্রয়োজন না থাকতে পারে কিন্তু কুরআন হাদীসকে পরিত্যাগ করতে পারে না।"

এসব ব্যাপারে অনেক মতনৈক্য আছে। অনেক মুসলমান মনে করেন যে, সুন্নাহ কুরআন এর ক্ষমতাকে অতিক্রম করে কিন্তু কুরআন তা পারে না। তবে ইমাম শাফী এবং ইমাম হাম্বল এবং অন্যান্য প্রমুখ তত্ত্বোপদেষ্টারা এ

www.pathagar.com

সকল ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধতা না করে পারেননি যে, সুন্নাহ কুরআনকে পরিবর্তন করে। তবে সকলে স্বীকার করেন যে, সুন্নাহ কুরআনকে পূর্ণতা দান করে এবং এর পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে ও পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়ার সহায়ক।

হাদীসে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, খলিফাকে নিশ্চয়ই কুরাইশ হতে হবে। মঙ্গলদের দ্বারা আরব সাম্রাজ্য বা মুসলমানদের রাজ্য বিজিত না হওয়া পর্যন্ত এমনকি তার পরও এ ধারা চলছিলো। এ নীতিমালা রাসূলের হাদীসে বহু স্থানে বর্ণিত আছে যে, "ইমাম কুরাইশদের মধ্য থেকে হবে।" মানুষের শাসন করার জন্য সর্বদা কোরাইশদের মধ্য থেকে শাসনকর্তা থাকবে। খলিফা কুরাইশ গোত্রীয় হবে, আইন শৃংখলা আনছারদের হাতে থাকবে এবং আবিসেনিয়ানরা নামাজের আজান দিবে। "The Imam shall be of the Quraish, the righteous of them, the rulers over the righteous among them, and the wicked of the rulers over the wicked, among them."

এছাড়া রাসূলের অনেক হাদীস আছে বাস্তবিক পক্ষে এর মধ্যে অনেকই সঠিক নয়, কিন্তু তা শাসককে পূর্ণ ক্ষমতাবান করে। এর মধ্যে কিছু হাদীস নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ "আল্লাহর রাসূল বলেন, আমাকে সম্মান করে সে আল্লাহকে সম্মান করে এবং যে আমার বিরুদ্ধাচারণ করে সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে, যে শাসককে সম্মান করে সে আমাকে সম্মান করে এবং যে শাসকের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণ করে সে আমার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণ করে, শাসকের যাই থাকুক না কেনো তোমরা তাকে সম্মান করো। আমি তোমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছি তা থেকে যদি তারা অন্য মত পোষণ করে এবং তোমাদেরকে খারাপ পথে চালাতে চায় তবে তারা নিশ্চয়ই এ কাজের জন্য শাস্তি পাবে এবং তোমরা তোমাদের বিশ্বস্ততার জন্য পুরস্কার পাবে। হে মানব, তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলো, তোমাদের উপর আল্লাহ কোনো আবিসিনিয় দাসকেও যদি তোমাদের শাসনকর্তা পাঠায় তবুও তাকে মান্য করো।"

এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল অসামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীস এবং কিছু সংখ্যক তত্ত্বোপদেষ্টাদের মতামতের উপর নির্ভর করে পরবর্তী খলিফাগণ স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এবং পুনরায় এ সকল হাদীসের উপরে নির্ভর করে মুসলমান আমির এবং রাজাগণ তাদের মুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে পূর্ণ আনুগত্যতা চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এরূপে রাসূলের অনেক হাদীস ন্যায় বিচার, স্ত্রীলোকদের স্থান, জিম্মী, দাস এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা, দেওয়ানী ফৌজদারী ও শাসনতান্ত্রিক আইনের সমস্যাবলী এবং বহুসংখ্যক রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেন। যদি কোনো দল কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপারে আগ্রহশীল থাকে এবং তাতে যদি তত্ত্বোপদেষ্টাদের কোনো সমর্থন না থাকে কিন্তু রাসূলের হাদীসের সমর্থন থাকে তবে এটাকে সঠিক বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

৪. শুরার অভিমত বা নির্দেশাবলী

সাধারণ পরিষদ এবং মজলিশে শুরার নির্দেশাবলী সকল মুসলমানদেরকে গ্রহণ করতে হতো। অনেক বিষয়ে যখন রাসূলের হাদীস অপ্রতুল মনে হয় এবং তা দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর হয় না এবং এটা যখন রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাদের অসুবিধার কারণ হয় তখন মজলিশে শুরা রাসূলের হাদীসের ব্যাখা ও বিশ্লেষণ দ্বারা কুরআন মাফিক নূতন সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সময়ানুপাতিক মতামত এবং নির্দেশ জারী করে থাকে। যখন খলিফাদেরকে নূতন নূতন কোনো সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হতো তখন কেবল প্রজা এবং রাজ্যের মঙ্গলার্থে মজলিশে শুরা নিয়ম মাফিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তিগুলোকে রাসূল (স) বিজিত সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। আবার যেখানে উক্ত সম্পত্তিগুলোকে চাষাবাদ করার জন্য যথেষ্ট লোকজন এবং দাস পাওয়া যেতো না সেখানে সেই সম্পত্তিগুলোকে তিনি প্রকৃত মালিকদেরকে ফিরায়ে দিতেন। খায়বার যুদ্ধের পর খায়বারের বিজিত ভূমিগুলোকে তাদের মূল ও প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেন এবং সেজন্য তাদের কাছ থেকে অর্ধেক শস্য লাভ করেন। সমস্ত সিরিয়া, ইরাক এবং পারস্যের কিয়দংশ যুদ্ধে জয় লাভ করার পর হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে তাঁর সংগীগণ তা তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এবং তারা বলেন যে, তা তাদের মধ্যে বন্টন হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে মজলিশে শুরার মধ্যে মতাদ্বৈততা দেখা দেয় কিন্তু সাধারণ পরিষদ এ নির্দেশ জারী করেন যে, ঐ সকল রাজ্যের সকল যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি প্রকৃত মালিকদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অন্যদিকে রাসূলের সময় কৃষির অর্ধেক নেয়ার পরিবর্তে বিজিত হওয়ার পূর্বে যে কর দিতো তা দিতে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫. খলিফাদের মতামত ও নির্দেশ

রাষ্ট্রিয় কার্যে খলিফা দ্বিতীয় ওমর (রা) অনেক ব্যাপারেই নিজের মতামত প্রকাশ করতেন। রাসূলের সময়কাল থেকে যে মুতা বিবাহের প্রচলন ছিলো তা

www.pathagar.com

তিনি বন্ধ করে দেন। অন্যদিকে একই বৈঠকে তিন তালাকের দরুন যে বিবাহ বিচ্ছেদ হতো তাতে অভিমত দেন যে, এতে তাহলিল দরকার আছে। অপরপক্ষে রাসূলের আত্মীয়দের মধ্যে খুমুছের অংশ দেয়াও বন্ধ করে দেন। মদ্যপানের জন্য মদ্যপায়ীদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাতের প্রচলন করেন। সংস্কারমূলকভাবে নূতন নূতন প্রথা প্রচলন করেন যা রাসূলের সময় ছিলো না।

খলিফা হযরত আবুবকর (রা) ও খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর সময়কার আইনানুসারে খুমুস্ এবং ফাদাকের সম্পত্তি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আত্মীয়দের দেয়া হতো না কিন্তু খলিফা দ্বিতীয় ওমর (রা)-এর সময় তার প্রচলন করা হয় এবং ফাদাকের সম্পত্তি হযরত ফাতেমা (রা)-এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অর্পণ করে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। মৃত্যুর পূর্বে, তিন তালাকে বিবাহ বিচ্ছেদের উপর তাঁর সঠিক মত দেয়ার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কোনো অভিমত দিয়ে যেতে পারেননি। মাওলানা শিবলী নোমান-এর মতে যারা তিন তালাকে বিশ্বাসী এবং খলিফা দ্বিতীয় ওমরের (রা) মত বিশ্বাস করেন না তারাই ঠিক। ১০৪২-১০৬৯ খৃস্টাব্দে আব্বাসীয় খলিফা মুকতাদিদ উত্তরাধিকার আইনের পুনর্বিন্যাস-এর পুরাকালে আরবে কোনো লোকের মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধ ভাবে বা তার মেয়ের সূত্র ধরে বা বোনের ছেলেমেয়েদের সূত্র ধরে ফারায়েজ পাওয়া বিধি সংগত ছিলো না। কিন্তু সুন্নি আইন অনুসারে তারাও ফারায়েজের অংশীদার বটে। মুতাদিদের মতে স্ত্রীলোকদের সূত্র ফারায়েজ পাওয়া জায়েয আছে।

৬. ইজমা বা মতৈক্যে উপনীত হওয়া

ইজমার সাধারণ অর্থে বুঝায় কোনো বাপারে একমত বা মতৈক্যে উপনীত হওয়া। কোনো আইনবীদের মতে ইজমা বলতে মুজতাহিদদের মতামতের সমন্বয় অথবা আইনের প্রশ্নে কোনো বিশেষ যুগের মুসলিম আইনবিদদের মতৈক্য। ইসলাম প্রসারের সংগে সংগে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মুসলিম সমাজ এমন কতগুলো নূতন সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকলো যার সমধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ কুরআন বা হাদীসে ছিলো না। সুতরাং তার কোনো না কোনো সমাধানের প্রয়োজন ছিলো। হযরত ওমর ফরুকের (রা) আমলে কোনো জটিল সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর প্রধান সাহাবীদের সংগে পরামর্শ করে তাদের পরামর্শানুযায়ী মতবাদের উপর নির্ভর করে কাজ করতেন এবং সমাধান দিতেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলের ওফাতের পর ইজমা প্রচলিত হয়। ইসলামী কানুনের উৎস হিসাবে ইজমার বুনিয়াদ

www.pathagar.com

কুরআনের কতিপয় আয়াত ও রাসূলে করীমের (স) হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল কুরআনে বলা হয়েছে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের মত নিও না।" হাদীসে বলা হয়, "তোমাদের সম্মুখে কোনো বিষয়ে মীমাংসার জন্য এলে আল্লাহর কিতাবানুসারে ফয়সালা করো, আল্লাহর কিতাবে নেই এমন কিছু এলে রাসূলের সুন্নাতের দিকে তাকাও, সুন্নাতে নেই এমন কোনো বিষয় সম্মুখে এলে জনগণের মতৈক্যের উপর নির্ভর করো।" হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) আমলে কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ফায়সালার প্রয়োজন হলে তিনি প্রথমে কুরআনের নীতিমালা ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেন এবং এতে সমাধান খুঁজে না পেলে সুন্নাহর উপর নির্ভর করতেন। কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান না করা গেলে তখন তিনি রাসূলে করীমের (স) প্রধান সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করতেন এবং তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সমাধান দিতেন। এভাবেই জটিল প্রশ্নের সমাধান করা হতো। তবে সে ব্যাপারে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সংগীদের মতামতের উপর বিশেষ জোর দেয়া হতো। মদীনার চুক্তির ব্যাপারে মালিক ইবনে আনাছের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে সকল কিছু মিলে মনে হচ্ছে রাসূলের সংগীদের মতামতই আল্লাহর নির্দেশের সংগে সংগতিপূর্ণ ও পরিপূরক।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রনয়নে ইজমার বিশেষ অবদান। অন্যদিকে যদিও রাসূল (স) বলেননি যে কুরাইশদের মধ্য থেকে খলিফা হবে, তবে ইজমা দ্বারা এটা স্পষ্টতো প্রমাণিত হয়েছে যে খলিফা হতে হলে তাকে কুরাইশ হতে হবে। ইজমা দ্বারা এটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, ইমাম নিযুক্তি জনগণের সিদ্ধান্তের দ্বারা হতে হবে। মজলিশে শুরা এবং ইজমার দ্বারাই খলিফা হযরত আবু বকরকে (রা) জনগণের ইচ্ছার মাধ্যমে মনোনীত করা হয়।

সাআদ উদ্দিন তাফতাজানির মতে ইজমা দু প্রকার—ইজমা-ই আজীমা ও ইজমা-ই রুখসাহ। যখন কোনো যুগের সকল মুজতাহিদগণ কোন বিশেষ বিষয়ে তাদের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন তখন তাকে ইজমা-ই আজীম বলা হয়। যখন কোনো কোনো বিষয়ে সকল মুজতাহিদ একমত হতে পারেন না কিন্তু কোনো মুজতাহিদের ফয়সালা সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয়, তখন তাকে ইজমা-ই রুখসাহ বলা হয়।

ইজমার স্থান ও অবস্থা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো লোকের মতে ইজমার ক্ষেত্রে বিশেষ স্থানে জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। আধুনিক ব্যবহার

www.pathagar.com

শাস্ত্রবিদের মতে ইজমা কোনো বিশেষ যুগের বা বিশেষ সময়ের লোকদের বা বিশেষ দেশের মতৈক্যের উপর গড়ে উঠেনি, এটা হচ্ছে যে কোনো যুগে যে কোনো দেশের অধিকাংশ ব্যবহার শাস্ত্রবিদের মতৈক্যের ফল। ব্যবহার শাস্ত্রবিদ ও তত্ত্বোপদেষ্টাদের সুষ্ঠু মতবাদ দ্বারা যে কোনো কালের যে কোনো দেশের সুষ্ঠু শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব। তবে তা কেবল কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, এর কোনো বৈপরিত্যমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তা ধ্বংস ডেকে আনবে এবং তা দেশ ও জনগণের অকল্যাণ বয়ে আনবে।

৭. মুফাচ্ছিরিন এবং মুহাদ্দেসিনদের লেখা

সেকালের কুরআন ও হাদীসের লেখকগণ শুধু মাত্র পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করতে পারতেন এবং সেজন্য তাদের সুষ্ঠু মতের উপরই নির্ভর করা হতো। তাদের লেখা দ্বারাই সত্যিকারভাবে কুরআন ও হাদীসের প্রকৃত অর্থ উদঘাটন করা যেতো। সকল দেশে মুফাচ্ছিরিন ও মুহাদ্দেসিনদের ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।

৮. রীতিনীতি বা আচার ব্যবহার

ইসলামী আইন মূলত মানুষের তৈরী আইনের চেয়ে ব্যাপক এবং স্থির লক্ষ্য হলেও সমাজে প্রচলিত বহু বিষয়ই এর অংগীভূত হয়েছে। অর্থাৎ মানব সমাজে আবহমান কাল ধরে প্রচলিত বহু নির্দোষ রীতিনীতি ইসলামী বা মুসলিম আইনে গৃহীত হয়েছে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ভিন্ন গোত্রে ও দেশে স্থান কাল বিশেষ তাদের নিজেদের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং ইসলামের আবির্ভাব হওয়ার পরও সমাজের সংগে সংগতিপূর্ণ বলে যুগের পর যুগ ধরে সে ব্যবস্থা চলতে থাকে। এ রীতিনীতিগুলো কোনো তত্ত্বোপোদেষ্টা বা আইনজ্ঞদের দ্বারা গৃহীত ছিলো না। অনেক রীতিনীতি সামাজিক হওয়া সত্ত্বেও অনেক জ্ঞানী ও গুণী লোকেরা মানতে রাজী নয় কিন্তু যেহেতু এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয় তাই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ এগুলো কোনো দেশের নানান অবস্থার মধ্য দিয়ে শতসিদ্ধ হয়ে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং এ রীতিনীতিগুলোকে বাদ দেয়া চলে না। ইমাম শাফী প্রচলিত রীতিনীতিগুলোকে আইনের উৎস বলে স্বীকার করে নিয়ে বেশ সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন।

যে সকল আইন ইসলামে গৃহীত হয়েছে সে সম্বন্ধে সাধারণ যুক্তি হলো, জনগণ যা নিজেদের জন্য কল্যাণকর বলে বিবেচনা করে তা আল্লাহর

www.pathagar.com

নিকটও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। কাজেই একথা বলা যায় যে, প্রাচীন আরবে বহু নির্দোষ লোকাচার ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং পরিমার্জিতভাবে উহার অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছে।

৯. শাসনতন্ত্রের ধারা লিখন

প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে ইসলামী শাসনতন্ত্রের উপর যে সকল ইসলামী চিন্তাবিধ, জ্ঞানী ও ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণ যে মতামত লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় এবং তাই এ সকল লেখা থেকে বিভিন্ন যুগের ও সময়োপযোগী শাসনতান্ত্রিক অবস্থা জানা যায়। ইসলামী শাসনতন্ত্র লেখকদের মধ্যে আবু ইউসুফ, আল বাকীলানী, আল মাওয়ার্দী, ইবনে হাজম, ইবনে জামাহ, ইবনে খালদুন, আল ফারাবী, ইখওয়ানুছ ছাফা, সিহাবুদ্দিন আল সোহরাওয়ার্দী, নিজামুল মূলক তুসী, নাছির উদ্দিন তুসী, জালাল উদ্দিন দেওয়ানী এবং অন্যান্য প্রমুখগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠাংশে।

এদের মধ্যে আল ফারাবী, ইখওয়ানুছ ছাফা, শেখ সিহাবুদ্দিন আল সোহরাওয়ার্দী এবং জালাল উদ্দিন দেওয়ানীর লেখা খুব মূল্যবান, কারণ তাঁরা দর্শন এবং নৈতিকবাদের উপর শাসনতান্ত্রিক দিক চিন্তা করে সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত মতামত দিতে পেরেছেন যা পরবর্তীকালে আরব সাম্রাজ্যে শাসনতন্ত্রে অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

অন্যদিকে আল মাওয়ার্দী যেহেতু আইন ও নীতি বা ব্যবহার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন সেহেতু তার তথ্যপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক আলোচনা ও লেখা সে যুগ থেকে অদ্য পর্যন্ত মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

পরিশেষে ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'আল মুকদ্দমায়' ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামো দিয়ে গেছেন। ইবনে খালদুনের লিখনী পৃথিবীতে যে আলোড়নের সৃষ্টি করছে অন্য কারো লেখা ততোখানি আলোড়র সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর লেখা বহু অংশে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

১০. কিয়াস

কিয়াস ইসলামী কানুনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। "By this Qiyas is meant the reasoning by analogy of the learned doctors of islam, the mujtahidinss with reqard to certain difficult on doubtfull quetions of doctors and practice, by compare them with similar cases already select by the authors of the Quran on the Sunnah of the ijma at those arrived at the

www.pathagar.com

solution of the undecided questions;" পূর্বে অনুষ্ঠিত কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত সমস্যার সমাধান তদানুরূপ ক্ষেত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাই 'কিয়াস'। যখন কোনো বিষয়ে কুরআন, হাদীস এবং ইজমায় বর্ণিত বা গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না তখন উক্ত উৎস তিনটিকে ভিত্তি করে তদানুরূপ কিয়াস অবলম্বন করা হয়। রাসূল (স)-ও ইজতেহাদকে উৎসাহিত করেন। হাদীসে আছে কোনো এক সময়, মুয়ায ইবনে জাবালকে আমিলুস ছাদাকাত করে গরীবদের কর সংগ্রহ করার জন্য এবং তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য ইয়ামানে পাঠাতে চেয়েছিলেন। তাকে উক্ত পদের জন্য নিযুক্ত করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হে মুয়ায, এ ব্যাপারে তুমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" তিনি উত্তর দিলেন "কুরআনের আইন অনুসারে।" "কিন্তু কুরআনে যদি এর কোনো সুচিন্তিত মতামত না পাও তবে।" "তবে আমি রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে কাজ করবো।" যদি এটাও বাতিল হয়, "তবে আমি ইজতেহাদের উপর নির্ভর করে কাজ করবো।" রাসূলুল্লাহ (স) তখন হস্ত উত্তোলন করলেন এবং বললেন, "আল্লাহর প্রসংশা! যিনি তাঁর দূতের দূতকে তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালনা করে থাকেন।" অনেক জ্ঞানীদের মত যে, বহু পূর্বেই ইজতেহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কারণ যেহেতু জ্ঞানী মুজতাহিদদের অভাব সেহেতু মানুষের ধারণা সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

পবিত্র কুরআনে মদ খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অন্য দিকে মদের ন্যায় অন্য পানীয় এবং ঔষধ সেবন আরম্ভ হলে তখন মুজতাহিদগণ কিয়াস দ্বারা ঘোষণা করলেন যে, যে পানীয় এবং ঔষধ খেলে মানুষকে মাতাল করে বা সাময়িকভাবে অচৈতন্য করে তা খাওয়া নিষিদ্ধ। তাই ঐ জাতীয় সকল পানীয় ও আফিম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হলো। তেমনিভাবে অটোমান টার্কদের খেলাফত এবং আমির বিল ইজতিলা (স্বাধীন আমির বা প্রশাসন কর্তা) এর ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত আয়াত অনুসরণ করে ইজতেহাদ বা কিয়াস করা হয়েছিলো যে, "মান্য কর, মান্য কর আল্লাহর দূতকে এবং জনগণের শাসককে যিনি তোমাদের উপর কার্য পরিচালনা করেছেন।" পরে যদিও ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ দেয়া হয়েছিলো। "যারা সুলতানকে মান্য করে তারাই দয়াময় আল্লাহকে মান্য করলো।" এখানে দেখা যায় যে, শাসক তার ইচ্ছামত মতামত প্রদান করেছেন যা অগ্রহণীয় এবং ধ্বংসাত্মক।

আরো দু'-একটা ঘটনা প্রকাশ করলে সত্যিকারভাবে স্পষ্ট হবে ঃ যখন ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান সেলিম পারস্য জয় করলেন এবং খিলাফত তার পক্ষে চলে এলো তখন মুজতাহিদগণ এ পরিবর্তনের জন্য ইজতিহাদ দ্বারা

www.pathagar.com

তার নিশ্চয়তা বিধান করলেন। প্রথম দিকে যখন বুয়াইদগণ বাগদাদে আব্বসীয় খলিফাদেরকে হাতের পুতুল রূপে রেখে শাসন করতে ছিলেন তখন সুন্নি ব্যবস্থার শাস্ত্রবিদ আল বাকিলানি আব্বাসীয় খলিফা কাদিরের সময় ঘোষণা করলেন যে, খলিফা কোরাইশ গোত্রীয় না হলে কোনো ক্ষতি নেই। আব্বাসীয় পতনোন্মুখ সময় তাদের দুরাবস্থা দেখে তিনি এ ইজতেহাদ প্রকাশ করেন। ইবনে খালদুন ও আল বাকিলানীর মত গ্রহণ করেন এবং এরা বলেন যে, যেহেতু ইসলামের প্রথম অবস্থায় কোরাইশদের মধ্যে থেকে শুধু মাত্র হযরত (স)-এর আত্মীয় বলে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করা হতো না কারণ তাঁদের মধ্যে সে সময় সবচেয়ে ভাল লোক অর্থাৎ যুগশ্রেষ্ঠলোক পাওয়া যেতো বলে তাদের মধ্যে থেকে ইমাম নিযুক্ত করা হতো। যখন কুরাইশ গোত্র ধ্বংসন্মুখ তখন অন্যান্য গোত্র থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করা হতো। এভাবে কিয়াস দ্বারা ইজতেহাদের মাধ্যমে মুজতাহিদগণের সুচিন্তিত মতবাদের ভিত্তিতে এটা সম্ভব ছিল এবং বর্তমানে আছে। সত্যিকারভাবে যদি মুজতাহিদগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন তবে এখনও সামগ্রিকভাবে সকলেরই কল্যাণ আসবে এবং আসতে বাধ্য।

www.pathagar.com

আরব শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

ক্রমবিকাশের প্রকৃতি

কোনো শাসনতন্ত্র একদিনে তৈরী হয়নি বরং এটা চিন্তাবিদদের বহুকালের পরিশ্রমের ফল। আরব শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, প্রাক ইসলামী যুগে আরব দেশে কোনো শাসনতন্ত্র ছিলো না। তারা গোত্রীয় শাসনে অভ্যস্ত ছিলো। কিন্তু তাও লিখিত ছিলো না। তবে সময়ানুপাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। ধীরে ধীরে ইসলামের আবির্ভাব হবার সংগে সংগে আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের হাদীস দ্বারা প্রয়োজনীয় নির্দেশানুসারে সে সময় রাষ্ট্র পরিচালনা করা হতো। কুরআন এবং হাদীস শাস্ত্র ছিলো আরবদের শাসনতন্ত্রের প্রধান উৎস। পরবর্তী সময় দেশের রীতিনীতি এবং আচার-ব্যবহার শাসনতন্ত্রে স্থান পায় এবং আরব জাতি একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু শাসনতন্ত্র লাভ করে। পরবর্তী সময় ফ্রান্স এবং আমেরিকা তাদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য ঐ প্রকৃতির শাসনতন্ত্র দেশের সামনে পেশ করে। বৃটিশ শাসনতন্ত্র খুব বেশী দিনের নয় কিন্তু আরব শাসনতন্ত্র তার চেয়ে বহুকাল পূর্বের যার উপর নির্ভর করে বৃটিশ ও আমেরিকাবাসী তাঁদের শাসনতন্ত্র দ্বারা দুনিয়াতে সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়। তবে আরব শাসনতন্ত্র নিজেদের খেয়াল খুশীমত তৈরী কোনো শাসনতন্ত্র নয়। এটা কিছুটা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এবং রাসূল কর্তৃক প্রবর্তিত। তাই এ শাসনতন্ত্রের সঙ্গে অন্য কোনো শাসনতন্ত্রের কোনোভাবেই তুলনা হয় না। কারণ এ শাসনতন্ত্র সকল শাসনতন্ত্রের মূল। তাই ধীরে ধীরে আরব শাসনতন্ত্র এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে যা পৃথিবীর বুকে আজও অজেয়।

আরব শাসনতন্ত্র সে সময় কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় শাসনতন্ত্র ছিলো না বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু এটা ছিলো বিশ্ব মুসলমানদের বিশেষ করে একটা বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র। কারণ যে যুগে এ শাসনতন্ত্র কায়েম হয় তখন সমস্ত আরব ও পশ্চিম এশিয়া মুসলমানদের পদানত এবং একই শাসনকর্তার কর্তৃত্বাধীন। যদিও বহু রাষ্ট্র এ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের অর্ন্তগত ছিলো কিন্তু সকল রাষ্ট্রের জন্য এ শাসনতন্ত্রের রূপ ছিলো এক। সত্যিকারভাবে বলতে কি রাষ্ট্র ছিলো কতগুলো রাষ্ট্রের সমন্বয়ে এবং বিভিন্ন সভ্যতার অধিবাসীদের আবাসভূমি। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আব্বাসীয় খলিফাদের খেলাফত কাল পর্যন্ত এ শাসনতন্ত্র সকলের কাছে

www.pathagar.com

একক শাসনতন্ত্র হিসাবে গ্রহণযোগ্য ছিলো। কিন্তু তাদের পর এ মুসলিম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে তাই বিভিন্ন রকম সরকারের অধীনে দেশাচার হিসাবে শাসনতন্ত্রের রূপ পাল্টে যায়।

অগ্রজদের সভা

প্রাক ইসলামী যুগে আরব দেশে বিভিন্ন গোত্র এবং জাতি তাদের গোত্রীয় প্রধান বা শেখদের দ্বারা শাসিত হতো। তবে সে যুগেও তাদের লোকদের কথা বলার অর্থাৎ দেশের ও দশের ভাল মন্দ বলার মৌখিক অধিকার ছিলো। কোনো সময় শেখ বা দল প্রধান যদি তাদের লোকদের মতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে যেতেন তবে গণতান্ত্রিক উপায়ে অধিবাসীগণ তাদের কাজে বাধা দিতো। তাই সে যুগেও শেখকে কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করতে হলে বা কোনো নির্দেশ জারি করতে হলে জ্যেষ্ঠদের সভা ডেকে তাদের মতামত নিয়ে কাজ করতে হতো। তখনকার দিনে বয়োজ্যেষ্ঠগণ কোনো মনোনীত প্রার্থী ছিলো না তাই এটা কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা নয়। শেখ গোত্রীয় প্রধান যদি অগ্রজদের চেয়ে ক্ষমতাবান বা শক্তিশালী হতো তবে সে তাদের কথা মানতো না এবং তাদের আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করতো এমনকি লোকদেরকে অর মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য করতো।

পৌরসভা

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদেশের শহরগুলো বয়োজ্যেষ্ঠদের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হতো। তখন এ সিনেট বা বয়োজ্যেষ্ঠদের সভাকে আল মালা বলা হতো। এ মালাকেও তার সত্ত্বার উপর নির্ভর না করে নৈতিক চেতনার উপর নির্ভর করতে হতো। আল ফাছীর মতে কেউই কোনো কর্তৃত্ব করতে পারতো না যদি তাকে এটা করার আদেশ না দেয়া হতো। তখন মক্কায় 'দারুন নাদওয়াহ' নামে একটা মিটিং হলো। সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠরা একত্রে মিলিত হতেন। তবে নাগরিকদের সাধারণ সভা কাবার মধ্যে বসতো এবং সেখানে বসে সাধারণের উন্নতির কথা চিন্তা করা হতো।

তখনকার দিনে সমস্ত আরব দেশে এ প্রথা চালু ছিলো তাতে মনে হয় যে একইমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরব জাতি একইভাবে একই নীতিমালায় চলছে। তাই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যাবলী যা কিছুকাল পর্যন্ত চলে আসছিলো তা ইসলামী অনুশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র বিপ্লব এনেছিলো। ফল স্বরূপ নূতন ইসলামী সরকার কার্যত ও বাহ্যত সেই সুষ্ঠু মুক্ত স্বাধীন ব্যবস্থার প্রচলন রাখলেন।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অর্ন্তভুক্ত

ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা শাসনতান্ত্রিক যুগ সৃষ্টি হলো। তাই ইসলামকে শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে শুরু না বলে পরিবর্তীত এবং প্রতিনিধিত্ব মূলক সংস্থার ক্রমবিকাশ বলা উচিত। ইসলাম আরব দেশকে একটি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিলেন যা আজ পর্যন্ত প্রাচীন কালের অনেক আইন ও রীতিনীতি প্রচলন রাখতে সহায়ক। তবে যে আইন মানুষের উন্নতি ও মঙ্গলের পরিপন্থী তাকে নাকোচ করেও দিয়েছে এবং প্রগতিশীল ধারাকে অব্যাহত রেখেছে।

শক্তির বিকাশ

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগে সংগে কেন্দ্রীয় শক্তি বহু গুণে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তার পূর্বে সমস্ত আরবে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ছিলো না এমনকি কোনো ক্ষুদ্র রাজাগণ কেন্দ্রীয় শক্তির অধিকারী ছিলেন না। তাদের ক্ষমতা ছিলো সীমিত। এ সকল ক্ষুদ্র রাজারাও প্রজাদের হাতে নামেমাত্র রাজত্ব করতো। কিন্তু রাসূল নিজে একাধারে ইসলামী রাষ্ট্রের একক অধিপতি হলেন এবং অন্য ধারে ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণও তাঁর কাছ থেকে এ সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। রাসূল এবং তাঁর খলিফাগণও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করার জন্য আমীর নিয়োগ করতেন। এ সকল আমীরগণ শুধু রাসূলের এবং তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফাগণের কাছে সকল কাজের জন্য দায়ী থাকতেন এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন প্রদেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। প্রদেশে আমীরগণ ছিলেন স্বার্বভৌম। তারা কর আদায় করতেন এবং প্রদেশের আয় উন্নতির দিকে নজর রাখতেন। প্রাদেশিক বিচার ও শাসন বিভাগ ছিলো তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন। সুষ্ঠু বিচার করার জন্য কাজী নিয়োগ করা হতো। হযরত (স) এবং তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফাগণ শুধু মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপারে প্রধান ও সার্বভৌম ছিলেন না বরং তারা রাষ্ট্রে সর্বচ্চো ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত পরিচালনা করতেন। তাই হযরত (স) এবং তার উত্তরাধিকারী খলিফাগণের হাতে শুধু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিলো না বরং তাঁরা রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক এবং বিচার সম্বন্ধে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এতো প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও খলিফাগণ স্বৈরাচারী হতে পারতেন কিন্তু তাঁরা তা না করে আরব সমাজের উন্নাতি বিধান কল্পে সাধারণ মানুষের মতো সদাচারণ করে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ মতো জনগণের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনা করে গেছেন।

www.pathagar.com

মজলিসে শুরা

বস্তুত হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর দূত এবং আরবের রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি কখনো অযৌক্তিক কোনো কাজ করেননি। তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁর সহকর্মীদের সংগে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থির করতেন কোনো সময়ই তাঁদের সংগে আলাপ না করে কোনো ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না। কিন্তু হযরত (স)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফাগণ সর্বদা তারই সহকর্মীদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করেননি। উমাইয়াদের সময় কেবলমাত্র উমাইয়া বংশের প্রধানদের মতামত গ্রহণ করা হতো। যেমন হেজাজের গভর্নর খলিফা আবদুল আজিজের পুত্র ওমর প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে শুরা প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে তিনি খলিফা হন। খলিফা হয়ে তাঁকে শুরার আদেশ মতো কাজ করতে হতো। আব্বাসীয় খেলাফতে আব্বাসের বংশের এবং আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠায় যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিলো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের পরামর্শ নেয়া হতো। খলিফা আল মামুন প্রথমত 'কাউনসেল অফ ষ্টেট' প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য খলিফাদের আমলেও তা প্রচলিত ছিলো।

খেলাফত

হযরত আবুবকর (রা)-এর খলিফা হিসাবে মনোনয়ন লাভের সঙ্গে সঙ্গে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলো। সে সময় অধিকাংশের মত ছিলো যে যিনি খলিফা হবেন তিনি নিশ্চয়ই কুরাইশ বংশীয় হবেন। সা'দ ইবনে ওবায়দার মতো অনেকে এ মত স্বীকার করেননি তবে তাদেরকে যেভাবেই হোক আবুবকরকে খলিফা হিসাবে মেনে নিতে হয়। খলিফা হতে হলে যে কুরাইশ বংশীয় হতে হবে তা হযরত (স)-এর নিম্নলিখিত উক্তিতে প্রমাণিত হবে ঃ

১. মানুষ খনিজ পদার্থের মতো, অন্ধকার যুগে শ্রেষ্ঠ, ইসলামী যুগেও শ্রেষ্ঠ যেহেতু তারা সকল কিছু জ্ঞাত।

২. কুরাইশগণ সকল বিষয় অথবা সরকারের সকল বিষয়ই প্রভু। যারা ভাল তারা তাকে অনুসরণ করে এবং যারা খারাপ তারা খারাপকে অনুসরণ করে।

উপরোল্লিখিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় খলিফাগণ কুরাইশ বংশীয় হবে। পরবর্তী সময় অনেক জ্ঞানী প্রধানত আল বাকিলানী এবং ইবনে খালদুন বলেন, হযরতের সময় আরবে কুরাইশ সম্প্রদায় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলো সেহেতু তাদের গুণাগুণের জন্য তাদেরকে উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য করা

www.pathagar.com

হয়েছিলো কিন্তু জন্মগত অধিকার বলে নয়। যেহেতু পরে কুরাইশগণের সে গুণ নষ্ট হয়ে গেলো সেহেতু অন্য মুসলমানগণ খেলাফতের উত্তরাধিকারী হলো কিন্তু তাও কোনো জন্মগত অধিকারের বলে নয়।

তবে এখানে বলা যায় যে, খলিফা কুরাইশদের কোন গোত্র থেকে হবে তা কিন্তু নির্দিষ্ট করে কেউ বলেনি। প্রথম তিন খলিফা তিন গোত্র থেকে হয়েছিলেন। আল খোদরী ইবনে খালদুন ও আল বাকিলানীর মত ধরে বলেন, সে সময়কার অবস্থার উপর নির্ভর করে হযরত (স) একথা বলেছিলেন কিন্তু সর্বকালের জন্য মনে করেননি। হযরত (স) বলেন, "যদি কোনো গুণাগুণ সম্পন্ন নিগ্রো তোমাদের শাসক হয় তবে তাকে সম্মান করো।" কিন্তু আল মাওয়ার্দী এবং আরো অনেকে মনে করেন, হযরত (স) এটা সর্বকালের জন্য বলেছেন কারণ না হয় কেবল জন্মগত অধিকার বলে যে কোনো কুরাইশ খলিফা হতে পারতো।

প্রথম চার খলিফাদের খেলাফতকাল এভাবেই চলে। কিন্তু তাদের পর যখন উমাইয়াগণ খেলাফতে ক্ষমতাসীন হন তখন খেলাফত রাজতন্ত্রে রূপ নেয়। প্রথমত খলিফাদের মনোনয়নের ব্যাপারে কোনো সঠিক ব্যবস্থা নিরূপণ করা ছিলো না। কুরআনেও এর কোনো উল্লেখ নেই। অন্যদিকে হযরতও এ ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম জনগণের উপর ছেড়ে দিয়ে গেছেন। খলিফা হতে হলে তাঁর কি গুণাগুণ থাকবে তারও কোনো উল্লেখ নেই। অন্যদিকে খলিফা মনোনীত হবে, না জনগণের ভোটের মাধ্যমে হবে বা ভোটের মাধ্যমে হলে ভোট দাতাদের কি গুণাবলী থাকতে হবে তারও কোনো উল্লেখ নেই।

হযরত (স) ভোট দানের ব্যাপারে কোনো নিয়ম করে যাননি। সে যুগে আরবে বর্তমান নিয়ম-কানুনের প্রচলন ছিলো না। আরবের প্রাচীন নিয়ম-কানুন অনুসারে গোত্রীয় প্রধান, প্রধান রূপে পরিগণিত হতেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর ইলেকশনেও এ প্রথা চালু ছিলো। খলিফা নির্বাচনে বনু সা'দ গোত্রীয় আনছারদের মধ্যে থেকে প্রায় ৪০ জন আনছার তাহকিফা হলে উপস্থিত ছিলেন। আবুবকর, ওমর এবং আবু ওবায়দাহ (রা)-ও তথায় ছিলেন। এ চল্লিশ জনের মধ্যে তিন জন যথা, আহিদ ইবনে হাদীর, বশীর ইবনে সা'দ এবং সেলিম খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে ওমর ও আবু ওবায়দাহ (রা)-কে অনুসরণ করে আবু বকরের পক্ষে ভোট দেন বাকীগণ তখনও আবু বকর (রা)-এর প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন করেননি। তবে মদীনায় হযরত (স)-এর অধিকাংশ সহকর্মীগণ হযরত আবু বকরকে তাঁর

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে নেন। হযরত আলী (রা) হযরত ফাতিমা (রা) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আবু বকর এর প্রতি শদ্ধা নিবেদন করেননি তাঁর কারণ তাঁর মতামত যাচাই করা হয়নি। তবে হযরত আলী (রা) এবং সা'দ যারা আবু বকরের নির্বাচনে অসন্তুষ্ট ছিলেন পরে মুসলিম জাতির স্বার্থে তাঁদেরকে খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে নত হতে হয়। মৃত্যুর পূর্বে হযরত আবু বকর অধিকাংশ জ্ঞানী গুণী ও বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের পরামর্শ মতো হযরত ওমর (রা)-কে খলিফা হিসাবে মনোনীত করে যান। তবে একদশক পরে খলিফা নির্বাচন নিয়ে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। এ ব্যাপারে তিনি সকল ক্ষমতা আবদুর রহমান ইবনে আওফের হাতে ন্যস্ত করেন। এবারেও খলিফার মনোনীত প্রার্থী মনোনয়ন লাভ করে ।

হযরত ওসমান (রা)-এর মৃত্যুর পর সেই পুরাতন কায়দায় হযরত আলী (রা) খেলাফতে সমাসীন হন। বিদ্রোহী দল তাকে সমর্থন দিলেন। নানা ঘাত সংঘাতে তিনি কাজ পরিচালনা করতে থাকেন কারণ এছাড়া অন্য কোনো উপায়ও তাদের জানা ছিলো না।

সাধারণত ইয়াজিদ (প্রথম)-কে উত্তরাধিকার হিসাবে মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপারে মুয়াবিয়া (রা)-কে দোষ দেয়া হয়। তবে মুয়াবিয়ার মতে খলিফাকে মনোনয়ন দানই হলো সর্বত্তোম পন্থা। তাঁর পর থেকে দেখা যায় যে, পরবর্তী খলিফাগণ তাদের পরবর্তী উত্তরাধিকার হিসাবে তাদের প্রথম পুত্রকেই খেলাফতের জন্য খলিফা হিসাবে মনোনয়ন দিয়ে গেছেন।

উমাইয়া খলিফাদের খেলাফতের শেষের দিকে খলিফা কর্তৃক দু'জন উত্তরাধিকার মনোনয়ন এক জটিলতার সৃষ্টি করে। অনেক সময় বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে বাদ দেয়া হয় যাতে খেলাফত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের আমলে এটা খুববেশী দানাবেধে উঠে এবং এজন্যই তিনি নির্মমভাবে নিহত হন।

এখানে দেখা যাবে যে, খলিফা আবদুল মালেকের পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ওয়ালিদ খেলাফত লাভ করেন। প্রথম ওয়ালিদের পর তার ছেলে প্রথম ইয়াজিদ এবং ইব্রাহীম খেলাফত পেলেন না কিন্তু আবদুল মালেকেরই তৃতীয় পুত্র দ্বিতীয় ইয়াজিদের পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালিদ ক্ষমতা লাভের আশায় সমগ্র সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন তাতে প্রথম ওয়ালিদের পুত্রগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় ওয়ালিদ নিহত হন।

আব্বাসীয় যুগেও খেলাফতের উত্তরাধিকার নিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধে এবং ফলস্বরূপ আল আব্বাসের গোত্র দ্বিধা বিভক্ত হয়। যে জন্য আব্বাস আস

www.pathagar.com

সাফফাহ্‌র মৃত্যুর পর আল মনসুর সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁর চাচা আবদুল্লাহ বিন আলী বিদ্রোহ করেন। কিন্তু পরিণামে এর ফল হিসাবে তাকে কারারুদ্ধ হতে হয় এবং পরে গৃহ চাপা পড়ে মারা যান। আল মনসুরের মৃত্যুর পর আল মাহদী খলিফা হন এবং তাঁর পর ঈসা বিন মূসাকে খলিফা হিসাবে মনোনীত করার পরও মাহদী তাকে বাদ দিয়ে তার পুত্র আল হাদী ও হারুনকে খেলাফতের উত্তরাধিকার মনোনয়ন দান করেন। তবে ঈসা বিন মূসার শক্তি থাকলে হয়তো তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারতেন। অন্যদিকে মাহদীকে মাহদীর ব্যবস্থানুযায়ী হাদীর মৃত্যুর পর হারুনই খলিফা হবার কথা কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করে হাদী পুত্র জাফরের অনুকূলে। এ ব্যবস্থা বাতিল করতে চাইলে খলিফার এ ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে হারুন রাজদরবার ত্যাগ করে চলে যান এবং ভ্রাতা হাদীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং খেলাফত লাভ করেন। উত্তরাধিকার প্রশ্নে হয়ত হারুন অর রশিদ সাবধান হতে পারতেন কিন্তু তিনি খেলাফতে তার উত্তরাধিকার হিসাবে তার পুত্র আল আমিন, আল মামুন এবং আল মুতাসিনকে পর পর মনোনয়ন দান করে যান। হারুন অর রশিদের মৃত্যুর পর আল আমিন, আল মামুন ও আল মুতাসিন পর পর খেলাফত লাভ করেন কিন্তু তাদের নিজেদের কার্যকলাপের দরুন আল আমীন ও আল মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধও সংগঠিত হয় এবং এর পরিণতি স্বরূপ আল আমিন নিহত হন। এ সকল সমস্যা এড়াবার জন্য তার পিতার প্রতিশ্রুতি মত ভ্রাতা আল মুতাসিনকে খেলাফত দান করেন।

১২৯৮ খৃস্টাব্দে বাগদাদের পতনের পর বহু সংখ্যক স্বাধীন রাজ রাজাগণ বিভিন্ন স্থানে নিজেদেরকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন এবং নিজেদের ইচ্ছা মতো শাসনতন্ত্র প্রনয়ন করে রাষ্ট্র শাসন করতে থাকেন। এর পর থেকে সত্যিকারভাবে আব্বাসীয় খলিফা শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেননি। ১৫১৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আব্বাসীয় খেলাফতের শেষ খলিফা আল মতাওয়াক্কিল কোনো রকম খেলাফত পরিচালনা করেন পরে তুর্কির সেলিমের উপর খেলাফত ন্যস্ত হয়। এভাবে খেলাফত অকুরাইশদের হাতে চলে যায়। এতে প্রতিয়মান হয় যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলে যে কোনো মুসলমান খলিফা হতে পারতেন।

এখানে প্রকাশ থাকে যে কামাল আতাতুর্ক দ্বারা বিনষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্টোমান তুর্কীদের হাতে খেলাফত ছিলো।

মন্ত্রীত্ব

প্রথম চার খলিফা কিংবা উমাইয়াদের যুগে মন্ত্রীত্বের জন্য কোনো বিভাগ ছিলো না। আব্বাসীয়গণ পারসিয়ানদের সহায়তায় খেলাফত লাভ করেছে

www.pathagar.com

সেহেতু তারা পারসিয়ানদেরও দেয়া অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছে তার মধ্যে মন্ত্রীত্বটাও একটা প্রকল্প মাত্র।

মন্ত্রী বা উজীরগণ কখনও কখনও খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন। আসসাফাহ এবং আল মনসুরের অধীন মন্ত্রীগণ খুব সতর্কতা এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু আল মাহদী, হাদী এবং হারুন অর রশিদ-এর রাজত্বকালে অধিকাংশ সময় মন্ত্রীগণ প্রায় খলিফাদের ক্ষমতা নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। হারুন অর রশিদের রাজত্বকালে তার মন্ত্রী জাফর এবং তার বারমিকী বংশ এতোই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে যার জন্য শেষ পর্যন্ত খলিফার কুদৃষ্টিতে পড়ে গেলেন এবং পরিশেষে খলিফার আদেশে তাকে হত্যা করা হয় এবং বারমিকী পরিবারকে কারাবরণ করতে হয়। অন্যদিকে আল আমিনের অধিনে তাঁর মন্ত্রী আল ফজল বিন আর রাব্বী এবং খলিফা মামুনের রাজত্বের প্রাক্কালে তাঁর মন্ত্রী ফজল বিন ছালেহ্ পক্ষান্তরে পরোক্ষভাবে তাদের কার্যকলাপ দ্বারা শাসক হয়ে পড়লেন। পরবর্তী সময় খলিফা আল মামুন নিজ হাতে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করে রাজত্ব পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণও আল মামুনের পদাংক অনুসরণ করেন। এভাবে খলিফাগণ সত্যিকারভাবে প্রকৃত ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন।

আব্বাসীয় শাসনকাল হতে আরম্ভ করে পরবর্তী সময়কার সুলতান ও বাদশাহগণ উজীর নিয়োগ করে থাকেন। গজনীর সুলতান মাহমুদ তাঁর মন্ত্রী হিসাবে আবদুল আব্বাস ফজল ইবনে আহমদকে নিয়োগ করেন। মুসলিম বিশ্বে প্রত্যেক মুসলিম শাসকগণ উজীর নিয়োগ করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দিল্লীর সুলতান ও মোঘল বাদশাহগণও উজীর নিয়োগ করে সুষ্ঠু রাজ্য পরিচালনার ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।

কেন্দ্রীয় সভা

সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠু রাজকার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন করে তা দেখাশুনা করার জন্য প্রত্যেক বিভাগে মন্ত্রী নিয়োগ করেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অধীনে কেবলমাত্র একটি কেন্দ্রীয় সভা বসতো। সেখানে তিনিই তা পরিচালনা করতেন। মসজিদে নববীতে তাঁর প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিলো। বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারীদের সহায়তায় তিনি রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করতেন। উমাইয়া খলিফাদের অধীন সামরিক বাহিনী পরিচালনা করার জন্য একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। কিন্তু অন্যান্য কাজ পূর্বমতো চলতে ছিলো। উমাইয়াদের অধীনে কমপক্ষে পাঁচটা এবং আব্বাসীয়দের অধীনে স্বতন্ত্রভাবে ১২টার মত বোর্ড ছিলো যা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতো।

www.pathagar.com

শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে পার্থক্য

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লণ্ডনে একই সংস্থা শাসন ও আইন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে কার্যনির্বাহী এবং বিচার বিভাগের কথা পরে আসে, আরব দেশে এর বিভিন্নতা ছিলো। শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কার্যক্রম আলাদা হতো। কিন্তু এসবের সর্বোপরি হযরত (স) নিজে তাঁর পরে তাঁরই খলিফাগণ স্বতন্ত্র কাজ করতেন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সে কালেও শেখ যদিও গোত্রীয় বা দেশীয় দলীয় প্রধান হিসাবে কাজ করতেন, কিন্তু কোনো সময়েই তারা বিচারক ছিলেন না। সে সময় কোনো বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে হলে হাকিম বা কাজী নিয়োগ করা হতো। এ পদ্ধতি পরবর্তী সময় ইসলামী যুগেও পুরাপুরীভাবে স্থায়ী আসন লাভ করে। বিচার সম্বন্ধে কাজী ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁর বিচারের উপর কোনো গভর্নর বা শাসকের কর্তৃত্ব ছিলো না। তিনি বিচার করতেন তা কার্যকরী করার জন্য রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত হতো। তবে সকলকে নীতিগতভাবে আইনের শাসন মানতে হতো এবং সবাই তা মেনে চলতেন।

তুর্কী ও ইরানী প্রভাব

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যে সকল রীতিনীতি, আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিলো ইসলামী যুগে তার মধ্যে অনেকই শাসন ও সমাজব্যবস্থায় স্থান পায়। তবে গণতান্ত্রিক বিচারের মাপকাঠিতে যাচাই করে শাসনতন্ত্রে এর স্থান দেয়া হয়েছে। এখান থেকেই শাসনতন্ত্রের মূলস্তর আরম্ভ হয়। প্রাক ইসলামী যুগের শাসন অনুশাসন পরবর্তী সময় শাসনতান্ত্রিক উন্নতি বিধানে সহায়ক ছিলো। শাসনতান্ত্রিক উন্নতি বিধানের সংগে রাষ্ট্রীয় উন্নতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কারণ প্রথম অবস্থা থেকেই যেহেতু গণতান্ত্রিকভাবেই রাষ্ট্র পরিচালনা হয়েছিলো, পরবর্তী সময় সেহেতু তা রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইসলামী বিধানে কোনো সময় নির্বাচনকে উপেক্ষা করা হয়নি বরং নির্বাচনের মাধ্যমে খলিফা নিয়োগ করা হতো। যেহেতু নির্বাচনের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচন করা হতো সেহেতু নির্বাচন প্রার্থী এবং নির্বাচকদের কি গুণাগুণ থাকতে হবে তাও তত্ত্বোপদেষ্টাগণ ও মুজতাহিদগণ পুরোপুরিভাবে লিপিবদ্ধ করে যান। পরবর্তীকালে তুর্কী ও ইরানী প্রভাবে ইসলামী আদর্শ ও গণতন্ত্র প্রায় লোপ পেতে থাকে, কারণ তারা গণতান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যম ছাড়া সৈরাচারতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের মূল আদর্শ গণতন্ত্র তাই কাগজপত্রেই এটা প্রতিফলিত হতো,

www.pathagar.com

বাস্তবিক পক্ষে সে অনুসারে কাজ হতো না। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে যে সনাতন আদর্শ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন আদর্শ ও সৈরাচার তন্ত্রের সম্মুখে স্থান না পেলেও সতস্ফূর্তভাবে জনগণের মনে স্থান পায়। কেউ হয়তো বাহ্যত এ আদর্শকে গ্রহণ করতে পারছে না কিন্তু এটা যে ভাল তাও অস্বীকার করছে না। তাই ইসলামী গণতন্ত্র যখন যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে চলে আসছে সেহেতু এটা প্রতিষ্ঠি ত না হওয়ারও কোনো কারণ নেই।

❐

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব সমন্ধে ইসলামে নানা রকম থিউরী আছে। কেউ কেউ বলেন ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। আবার কেউ কেউ ধারণা করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌম হলো পবিত্র কুরআন, আবার কেউ বলেন শরীয়ত। আবার অনেকের মতে হযরত মুহাম্মাদ (স) হলেন পূর্ণ সার্বভৌম এবং তাঁর পরে তার খলিফাগণ। কেবল মাত্র বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত পোষণ করার জন্য নানান ধারণা বিদ্যমান। তাই প্রথমতঃ আমাদের কাম্য হলো সার্বভৌমত্ব কি তা ভালোভাবে উপলব্ধি করা।

বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতবাদ বিশ্লেষণ করলে অনেক ধারণা পাওয়া যায় কিন্তু সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে সঠিক কোনো মতামত পাওয়া যায় না। যে কোনো জিনিস সঠিকভাবে উপলব্ধি না করতে পারলে তা অসম্পূর্ণ বলেই ধরা হয়। তবে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতবাদ আলোচনা করলে অষ্টিনের মতবাদকেই প্রথমত প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অষ্টিন সার্বভৌমত্বের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করে গেছেন তা এখনোও একত্ববাদীদের মূল বক্তব্য হিসাবে পরিগণিত। তিনি নিজে আইনজ্ঞ ও আইনবিদ হওয়াতে আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা ছাড়া অন্য কোনো সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্ব বিশ্বাস করতেন না। তার মতে "If a determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior, receive habitual obedience from the bulk of a given socity. That determinate superior is the sovereign in that society, of that society including the superior, is a socity political and Independent."-"যদি কোনো সুনির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ (যা এক বা ব্যক্তি গোষ্ঠী হতে পারে) অন্য কোনো অনুরূপ কর্তৃপক্ষের বশ্যতা স্বীকারে অভ্যস্ত না হয়, অথচ সাধারণভাবে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির আনুগত্য লাভ করে তাহলে সেই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঐ সমাজের সার্বভৌম শক্তি হবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ সহ এ সমাজকে রাজনৈতিকভাবে গঠিত স্বাধীন সমাজ বলা হবে।" এ সংজ্ঞায় আইনত সার্বভৌমিকতার সকল লক্ষণই সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তবু এটা বিবেচ্য বিষয় যে, সার্বভৌমত্বের অধিকারী কর্তৃপক্ষ প্রকৃতপক্ষে সর্বদা প্রত্যাদেশের নির্দেশাবলী অনুসারে চালিত হচ্ছেন কিনা। আর পবিত্র কুরআনে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেই ভাবে না চললে তাকে সার্বভৌম বলা যায় কিনা।

www.pathagar.com

এর পরিপ্রেক্ষিতে হামসের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি কখনও অন্যের মতভেদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন না। সার্বভৌম সম্বন্ধে তার স্বাধীন সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করে গেছেন। তার মতে তিনি যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করেন যে কোনো মতে এবং কোনো ক্ষেত্রেই মানুষের কাছে বাধ্য নহেন তবে তিনি আল্লাহর আইন এবং প্রকৃতির আইনে আবদ্ধ। অন্যদিকে বদিনের মতে সার্বভৌম শুধু মাত্র আল্লাহর আইন অর্থাৎ প্রকৃতিগত আইন, নৈতিক আইন এবং জাতীয় আইনের কাছে বাধ্যগত। তিনি বলেন, "If we should define sovereignty as a power legibus comnibus soluta, no prince could be found to have sovereign rights, for all are bound by divine law, and the law of nature and also by that common law of nations which embodies principles distinct from these."

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বহুতত্ত্ববাদ এবং ঐতিহাসিক মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদ অষ্টিন প্রদত্ত সার্বভৌম ক্ষমতার সংজ্ঞাটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। অন্যান্যদের মতে অষ্টিনের মতবাদ বর্তমান গণতন্ত্রের আদর্শ বিরোধী। তার মতবাদ গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। তিনি আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত করে সার্বজনীন সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেছেন। বর্তমান যুগসান্নিধ্যে হয়তো অষ্টিনের মতবাদ বিংশ শতাব্দীর দার্শনিকদের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে তবে পক্ষান্তরে তার মতবাদই স্বাধীন।

তবে এখানে বর্তমান যুগের কথা বলা হয় নাই। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার উপর নির্ভর করেই সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময় সার্বভৌমত্ব একটা চিরন্তন কথা ছিলো। এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, অতীতে সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কি মতামত প্রচলিত ছিলো। অন্যদিকে সার্বভৌমত্ব মানুষের কাছ থেকে উৎপত্তি অথবা আল্লাহই কি এর প্রকৃত স্বত্বা ও উৎস। এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, এটা সবর্জন বিদিত যে, একমাত্র আল্লাহই হলেন সার্বভৌম এবং সার্বভৌমত্বের অধিকারী। হিন্দু ধর্মের মতে ঈশ্বরের অবতার হলো সার্বভৌম। ইউরোপীয়ানদের মতে "লর্ড এ্যান্ নয়েন্টেড" এবং অন্যদের মতে পয়গাম্বর হলেন সার্বভৌম। প্রকৃতভাবে আল্লাহ হলেন সকল শক্তির উৎস। তাই এ পৃথিবীতে কোনো জাতিই আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে বর্তমান যুগের লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং দার্শনিকগণও এটা স্বীকার করে গেছেন যে, আল্লাহ সার্বভৌম, তাই দার্শনিক অষ্টিনের মতবাদই হলো উহার উৎকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

www.pathagar.com

প্রকৃতভাবে এবং কার্যত সার্বভৌম হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং আইনানুগ সার্বভৌম হলেন তাঁর পয়গাম্বর অথবা খলিফাগণ যাঁরা তাঁরই আদেশানুসারে সালাত ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন অনুসারে খলিফাগণই হলেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি। তাই প্রথম চার খলীফাকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে ধরা যায়। আল্লাহকেই একমাত্র সকল কিছুর উৎস বলে গণ্য করা যায় এবং এটাই চিরন্তন। মুসলিম শাসনাধীন দেশগুলোর রাষ্ট্র প্রধানগণ আল্লাহকেই সার্বভৌম বলে জ্ঞান করেন। যদিও বিংশ শতাব্দীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর অবিশ্বাস করা হয় কিন্তু ঐতিহাসিক সভ্যতারও তা অবিশ্বাস্য বলে গণ্য হয় না। বর্তমান শতাব্দীর চিন্তাবিদগণও এ মহাসত্যকে অস্বীকার করতে পারেন না। মধ্যযুগীয় ও বর্তমান চিন্তাবিদগণও এটা অস্বীকার করতে পারছেন না বা এর বিরুদ্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করতে পারছেন না। যদি কেউ অবিশ্বাস করেন তবে তা মধ্যযুগে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের ব্যবহার ও ট্রামগাড়ী চালানোর মতো অর্থাৎ যা হবার নয় তা। কিন্তু প্রাণকে যেমন দেহের কোনো অংশে খুঁজে পাওয়া যায় না বরং সর্বদেহের সর্বাংশে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ বর্তমান থেকে দেহকে সচল, সজীব এবং চলমান করে রাখে ঠিক তেমনি সার্বভৌমিকরা রাষ্ট্র-দেহের সর্বাংশে বর্তমান থেকে তাকে প্রাণবন্ত করে রাখে। একথায় স্বীকার্য যে, বর্তমান ব্যবস্থায় কেউই কোনো আধুনিক রাষ্ট্রকেও সার্বভৌম বলে স্বীকার করে না। কারণ বিগত যুগের রাষ্ট্রীয় সমাজব্যবস্থা আর বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে অনেক ব্যবধান ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান বিশ্ব ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক ব্লোকে বিভক্ত। এখন থেকে এটা চিন্তার বিষয় যে, ইসলামী মূলনীতি ও আদর্শানুসারে কে সার্বভৌমত্বের অধিকারী ? তবে ইসলামী বিধানানুসারে আল্লাহ্ সার্বভৌম। যারা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে এ পৃথিবীতে কাজ করে থাকেন তাদেরকে আইনানুগ সার্বভৌম বলা হয়। কার্যত আল্লাহ সার্বভৌম। তাঁরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁর আদেশানুসারে চলেন সে জন্য তাদেরকে একটু কম সার্বভৌম বলে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। যেখানে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময়ে কুরআনের পরিবর্তন করা অর্থাৎ মূল কুরআনের সঙ্গে কোনো স্থানে অশুদ্ধতা প্রকাশ পেলে সংশোধন করে নেয়া হয়েছে এবং যে স্থানে বুঝা সম্ভব হয়নি সে স্থানে হাদীস দ্বারা তার ব্যাখ্যা পরিবর্ধন অর্থাৎ পূর্ণতা প্রকাশ করা হয়েছে, তখন জাগতিক সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন স্বাভাবিক। অনেক ক্ষেত্রে ইজমা তার দায়িত্ব নিয়েছে। খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর শাসনকালে, শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য আল্লাহর বিধিবদ্ধ আইন মেনে চলতেন, কারণ তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি

www.pathagar.com

স্বরূপ কাজ করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন খুমছ, তালাক এবং মুতা বিবাহ সম্বন্ধে তিনি কুরআনের অনুশাসনকে প্রয়োগ না করে মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির জন্য রাসূলের সুন্নাহ এবং হাদীসের ব্যবহার দ্বারা তার কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এমনকি আব্বাসীয় যুগে আব্বাসীয় খলিফা আল মুতাদীদ উত্তরাধিকারের অভাবে রাজাধিকার ভুক্ত সম্পত্তির বিলোপ এবং মেয়েদেরকে পুরুষদের মতো স্বগোত্রীয় করে নেয়ার জন্য আদেশ দেন। আর যখন কুরআন ও সুন্নাহর আইন মেনে চলা হয় তখন পারস্য, সিরিয়া এবং মিশর থেকে প্রাপ্ত আল খুমসের এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ রাসূল (স)-এর পরিবারবর্গকে দেয়ার কোনো যুক্তিকতা নেই। অন্যদিকে কৃষকদের হাড়ভাংগা ফসলের অর্ধেক আদায় করা বা সিন্ধের অমুসলিমদের উপর অত্যাচার করা যুক্তিসংগত কি ? খলিফাগণ আল্লাহর বিধানানুসারে সকল কিছুর সমাধান করতেন তাই পরবর্তীকালে সুলতানগণও তাদের অনুসরণ করেছিলেন। কারণ তারা ছিলো আইনানুগ সার্বভৌম অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধি স্বরূপ। যেহেতু আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের মালিক ও শাসনকর্তা সেহেতু তিনি হলেন কার্যত সার্বভৌম। যেখানে আল্লাহর আদেশ ছাড়া চন্দ্র সূর্য এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া আসা করতে পারে না, মৃত তার প্রাণ ফিরে পায় না সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য আর কাকে সার্বভৌম বলা যায়? তবে আল্লাহ যেখানে আসমান ও জমিনের মালিক এবং তাঁর আদেশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা ইত্যাদী প্রতিনিয়ত চলে তখন আল্লাহ ছাড়া আর কাকেই বা সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলা যায় ? আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط

"আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই, কে এমন আছে যে, তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○ ـ البقرة : ٢٥٥

"তাঁর সাম্রাজ্য আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। এ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোনো কাজ নহে যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

এখানে স্পষ্ট যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদ্ভয়ের মধ্যস্থিত প্রত্যেকটি জিনিসেরই তিনি একচ্ছত্র মালিক। তাঁর মালিকানায়, তাঁর ব্যবস্থাপনায়,

www.pathagar.com

কর্তৃত্বে এবং রাজত্ব ও বাদশাহীর ব্যাপারে অন্য কারো এক বিন্দু অংশ বা শরীকানা বা অধিকার থাকতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বিশ্ব ভূবনের মধ্যে মানুষ যে জিনিসেরই কল্পনা করে—করতে পারে, তা নিশ্চিতরূপে এ সৃষ্টিলোকেরই একটি বস্তু হবে। এর এ সৃষ্টিলোকের সৃষ্টি প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তি আল্লাহর মালিকানাধীন, আল্লাহর দাসানুদাস, সে আল্লাহর শরীক নহে, তাঁর বিন্দুমাত্র সমকক্ষও নহে।

মূর্খ লোকেরা নিজ কল্পনায় যতো অসংখ্য খোদা ও মাবুদই বানিয়ে রাখুক না কেনো প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সামগ্রিকভাবে আল্লাহরই সার্বভৌমত্ব। এতে অন্য কারো একবিন্দু অংশীদারিত্ব নেই। সেই অবিনশ্বর মহান সত্তার জন্য চির নির্দিষ্ট, যিনি অন্য কারো দেয়া জীবন পেয়ে নয়, নিজস্ব জীবন দ্বারাই চিরঞ্জীব এবং অনুগ্রহ শক্তির উপর ভর করে বিশ্বনিখিলের এ বিরাট ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজের বিরাট সাম্রাজ্যের যাবতীয় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনি একা নিজেই। অন্য কেউ যেমন তাঁর গুণাবলীর অংশীদার হতে পারেন না, তেমনি তাঁর ক্ষমতার ইখতিয়ার ও অধিকারেও অন্য কারো একবিন্দু অংশীদারীত্ব নেই। কাজেই তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য কাউকে মাবুদ স্বীকার করা হলে তা হবে মিথ্যা, কারণ আল্লাহই হলেন সকলের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ। যিনি সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সরাসরি অবহিত। তিনি গোটা সৃষ্টিলোককে অনাবৃত ও অন্তরাল বিহীন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন। আকাশ ও পৃথিবীর কোনো একটি জিনিসও যাঁর অগোচরে নয়, তিনি হলেন সার্বভৌম আল্লাহ।

যেখানে আল্লাহ বিশ্বজাহানের মালিক ও শাসনকর্তা সেখানে তিনি ছাড়া অন্য কাউকে সার্বভৌম বলে স্বীকার করা যায় না। তাই বিশ্বাসীদের মতানুসারে আল্লাহই হলেন সকল সার্বভৌমত্বের সার্বভৌম।

যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনিই প্রভু, যারা তাঁর সার্বভৌমত্ব মানে তারাই তাঁর গোলাম। আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও সার্বজনীনতার জন্য আল্লাহর আইন মানুষের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করে। সাম্য, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়, কারণ কারো ইচ্ছা বা স্বার্থে আইন করা বা কুরআন ও সুন্নাহর আইন রদ করার ক্ষমতা কারো নেই। আইন সভার নামে দলীয় স্বার্থে আইন করা যায় না এবং তা ঠিক নয় এবং তা টিকে না ও টিকতে পারে না। তা কেবল অশান্তি সৃষ্টি করে। তাই আল্লাহর বিধান সর্বোত্তম বিধান।

আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব অর্থ কুরআন ও সুন্নাহর আইনের সার্বভৌমত্ব। সবই আল্লাহর আইনের অধীন। একমাত্র ইসলাম ধর্মে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এতো ব্যাপক, চূড়ান্ত ও ব্যাপ্ত যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না বা

www.pathagar.com

যাবে না। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর কল্যাণকর নির্দেশ সুনির্দিষ্ট করা। ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম আল্লাহর একক ও সার্বজনীন রূপ দিয়ে ফেলেছে বলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করা মানে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মাবুদ মনে করাও এ সার্বভৌমত্বকে বিভাজ্য বলে গণ্য করা। তবে আল্লাহ অদ্বিতীয় এবং একক সার্বভৌম। যারা তাঁর সার্বভৌমত্বে অবিশ্বাস করছে তারা চিরকালের জন্য জালিম এবং তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগে অযোগ্য।

তাই সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ ـ ال عمران : ٢٦

"হে বিশ্বাধিপতি আল্লাহ ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন, যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা দান করেন, আপনার হাতেই সর্বকল্যাণ এবং আপনি সর্ব বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে তা তাঁরই জন্য এবং আল্লাহ মহা সম্পদশালী ও সপ্রশংসিত।"–সূরা লুকমান ঃ ২৬

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○ ـ البقرة : ١٠٧

"তুমি কি জানো না যে আল্লাহই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিপতি এবং আল্লাহ ছাড়া কেউই তোমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১০৭

এটা সত্য যে আল্লাহর আদেশ ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না। তাই বিশ্বে তিনি যে একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী তাতেও কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। বিধর্মীগণ যদিও এটাকে মেনে চলেন না তবে বিশ্বাসীগণের নিকট এটা সাংঘাতিক বিষয়। ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে চলা হয় না। একথা স্বীকার্য যে, আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়ে এ বিশ্ব চরাচর শাসন করে থাকেন।

www.pathagar.com

যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ق وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ-

"আর তারা যখন সবর করে এবং আমার আয়াতসমূহের প্রতি ইয়াকীন আনতে শুরু করে, তখন তাদের মধ্যে এমন অধিনায়ক সৃষ্টি করলাম, যারা আমার নির্দেশ মতো হেদায়াত দান করছিলো।"–সূরা আস সিজদা ঃ ২৪

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص ـ النور : ٥٥

"আল্লাহ অংগীকার করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসস্থাপন করবে ও সৎকাজ করবে নিশ্চয় তিনি তাদের আধিপত্য দিবেন, যেমন তিনি পূর্ববর্তীগণকে দিয়েছিলেন।"–সূরা আন নূর ঃ ৫৫

সৎকর্মশীল বান্দাগণকেই কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা আধিপত্য দিয়ে থাকেন। যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কুরআনের আইন জারী করে সে অনুসারে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করে গেছেন সেহেতু বলতে হয় আল্লাহ একক ও সার্বভৌম। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর কারো নিকট কোনো দিন প্রত্যাদেশ প্রেরিত হয়নি সেহেতু পার্থিব জগতের কথা চিন্তা করলে বলতে হয় যে, এ পার্থিবজগত যখন অন্যের অর্থাৎ মানবকুলের দ্বারা শাসিত হচ্ছে তখন এখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হয়তো সার্বভৌমত্বের অধিকারী হতে পারে। আল্লাহর প্রতিনিধিরা যখন শাসন করছে তখন পার্থিবজগতে তাদেরকেও সার্বভৌম বলা যায়। অন্য দিকে কুরআন যখন সবার মূলে তখন কে সার্বভৌম তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর যখন আল্লাহর প্রত্যাদেশ আর জগতে আসছে না তখন আমরা অন্য কাকে সার্বভৌম বলতে পারি। তাই কুরআন সার্বভৌম কিনা এ বিষয় চিন্তা করা যাক।

কুরআন সার্বভৌম

যারা ভাবেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌম হলেন আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ কুরআনের মারফত মুসলিম রাষ্ট্র শাসন করে থাকেন। কারণ কুরআনে পথিবী সম্বন্ধীয় সকল আইন লিপিবদ্ধ আছে। "That man is utterly powerless before the universal law and this whole concern in the real of the so called law making can be to try and discover the intricacies

www.pathagar.com

of that law in much the same manner as the scientist discovers the forces of nature and the economic discovers the nature relation between man and the economic wealth." তারা আরো তর্ক করেন যে মানুষের জন্য কুরআন হলো সর্বযুগের এক শ্রেষ্ঠ পূর্ণাংগ পবিত্র গ্রন্থ। কারণ এ গ্রন্থে মানুষের পক্ষে যে জ্ঞান লাভ করা যায় সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ধারক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর কুরআনের রায় হলো চূড়ান্ত। কুরআনে সকল কিছুর ব্যাখ্যা দেয়া আছে। তাদের কথা হলো যে কুরআনের প্রত্যেকটি শব্দই যখন আল্লাহর নিজের বাণী তখন সত্যকে সঠিকভাবে মেনে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা উচিত।

কিন্তু পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় কাজে কিছু সংখ্যক খলিফা এবং মুসলিম রাজারা কুরআনের কিছু কিছু নীতিকে অগ্রাহ্য করেছেন। অন্যদিকে শাসকের অভিমতকে কিছুটা অগ্রাহ্য করার জন্যও অনেককে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। সরকারের আনুগত্যের সন্দেহে হত্যা করা বা বন্দি করা হয়েছে। চুরির দায়ে হাত কাটার শাস্তির পরিবর্তে অন্য আইন পাশ করা হয়েছে। কিন্তু উমাইয়াদের সময় মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত নও-মুসলমানদের কাছ থেকে আল জিজিয়া এবং খারাজ আদায় করা হতো। অন্যদিকে কাশ্মীরের জয়নুল আবেদীন এবং ভারতের মহামতী সম্রাট আকবর অমুসলমাদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে নেন।

গোড়া মুসলিম লেখকদের মতেও ঐশ্বরিক জ্ঞানের সীমাহীন ভাণ্ডার মানবীয় সংস্থা এবং পার্থিব ভাষার মাধ্যমে আসতে বাধ্য এবং ভাষার সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাই রাসূল (স)-এর সঙ্গীরা এ সমস্যার কথা জেনে এর সমাধান কল্পে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

তবে এখন স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা বা তর্ক করে লাভ নেই যে, মুসলিম রাষ্ট্রে কুরআন সার্বভৌম, কারণ হিন্দুগণ বেদকে হিন্দুরাষ্ট্রে সার্বভৌম মনে করতে পারে। অন্য দিকে খৃস্টানগণ তাদের রাষ্ট্রে বাইবেলকে সার্বভৌম মনে করতে পারে। আবার বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে সুন্নাহ কুরআনকে অতিক্রম করে থাকে, তারও কারণ আছে। তাহলো কুরআনে যে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা বা পূর্ণ বিশ্লেষণ না পাওয়া যায় সেখানে সুন্নাহ তার স্থান দখল করে।

তবে বিজ্ঞানসম্মত গতিশীল সমাজে দিনের পর দিন এবং প্রতি মুহূর্তে নানান সমস্যার উদ্ভব হয়। কিন্তু সে সকল সমস্যা প্রত্যাদেশানুসারে সমাধান করা সম্ভব নয়, কারণ কুরআনকে বুঝা সম্ভব নাও হতে পারে। পুরাকালে দাসত্ব, বহু বিবাহ, নিজস্ব সম্পত্তি প্রভৃতির প্রচলন ছিলো কিন্তু যুগ সান্নিধ্যে

www.pathagar.com

এসব প্রতিষ্ঠান আর দৃষ্ট হয় না। মুসলিম সমাজের প্রথম দিকেও কুরআন সকল সমস্যার সমাধান করতে পারেনি কারণ সেই সময়কার সমাজব্যবস্থা বা জ্ঞানীগুণীবর্গ কুরআনকে বুঝতে সম্ভব হয়নি, তাই আবার সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা তার মীমাংসা করা হতো। পবিত্র কুরআনে যদিও সকল সমস্যার সমাধানের পথ আছে কিন্তু যুগের তালে তার সঙ্গে খাপ খায়িয়ে নেয়া মুশকিল। যেহেতু কুরআনের আইন বা প্রত্যাদেশিত সূত্র বুঝা এতো কঠিন যে তার দ্বারা সকল কাজের সমাধান করা সম্ভব নয় এবং সম্ভব হচ্ছে না। সেহেতু কুরআনকে সার্বভৌম বলা যায় না। হযরতের ওফাতের পর আর কুরআন সার্বভৌম নয়।। কারণ তাঁর ওফাতের পর আর কোনো প্রত্যাদেশ এ জগতে আসেনি। সুতরাং নূতন কোনো ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কুরআনে যদিও সকল কিছু বিদ্যমান আছে বা পাওয়া যায় কিন্তু তা বুঝে নেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ কুরআনের প্রতিটি শব্দই হচ্ছে একটা নির্দেশ, তা কেনো এবং কি অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রত্যাদেশিত হয়েছিলো তা জানার অভাব, সেহেতু মানুষ আজ অমানুষ হয়ে গিয়ে কুরআনকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরী আইন ও মতবাদ নিয়ে এগুচ্ছে যা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

পয়গাম্বর সার্বভৌম

হযরত মুহাম্মাদ (স) যতোদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন তিনিই ছিলেন এ জগতের বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌম। তিনি নিশ্চিত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তিনি অভ্যাসগতভাবে বা মানুষের শ্রদ্ধার পাত্রের চেয়ে ছিলেন নিশ্চিত মানব শ্রেষ্ঠকুল মানব। বাস্তবিক পক্ষে তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব। সে জন্য তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। রাসূল (স)-এর মতে আল্লাহ হলেন একমাত্র শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই হলেন সার্বভৌম। তাতে তাঁর সার্বভৌমত্বের ক্ষতি হয় না। আর যেখানে সমাজবদ্ধ সকল লোক রাসূল (স)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সেখানে তিনি হলেন সে সমাজে সার্বভৌম।

মুসলিম রাষ্ট্রের উপর হযরতের কর্তৃত্ব ছিলো সর্বময়। কিছু সংখ্যক মুসলিম চিন্তাবিদের মতে "সুন্নাহ কুরআন থেকে অব্যাহতি পেতে পারে কিন্তু কুরআন সুন্নাহ থেকে অব্যহতি পেতে পারে না"। যদিও এখানে এটা একটা তার্কিক ব্যাপার যে, সুন্নাহ কুরআনকে অতিক্রম করে চলে, কিন্তু কুরআন সুন্নাহকে অতিক্রম করতে পারে না। তবে এখানে কিছু উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাঁরা বলেন যে, ব্যভিচারীকে পাথর ছুড়ে শাস্তি দেয়ার প্রচলন প্রথম থেকেই ছিলো যদিও কুরআনে কেবল মাত্র বেত্রাঘাতের

www.pathagar.com

প্রচলন সন্নিবদ্ধ করা আছে। কুরআনে আছে চোর চুরি করলে তার হাত কর্তন করা হবে কিন্তু সুন্নাহ অনুসারে ভেড়া, বকরী ও খেজুর চোরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কুরআন অনুযায়ী উইলকারীর উচিত কিছু অংশ তার মাতা পিতা এবং নাবালক শিশুদের জন্য রেখে যাওয়া। কিন্তু হযরতের সুন্নাহ অনুসারে দেখা যায় যে, অবিশ্বাসীরা কোনো মুসলমানদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো কিছু পায় না এবং মুসলিমরাও অবিশ্বসীদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না।

এখন যদি শাফেয়ী এবং হাম্বলীদের চিন্তাধারার কথা উল্লেখ করা হয় তবে দেখা যাবে যে, সুন্নাহ কোনো ক্ষেত্রেই কুরআনকে অতিক্রম করে চলতে পারে না। কুরআন হলো আল্লাহর ঐশীবাণী এবং এর জন্য হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর কাছে আনুগত্যশীল। হবস, বদীন এবং অষ্টিনের মতেও রাসূলুল্লাহ (স) সার্বভৌম। কারণ, হযরত মুহাম্মাদ (স) একাধারে পয়গাম্বর, আইন দাতা, শাসক, সেনাধ্যক্ষ, প্রধান বিচারপতি এবং শাসনকার্যের সেরা ব্যক্তি। তিনি সামাজিক বন্ধন ও আইন প্রণয়ন করেন। দেশ রক্ষার জন্য সৈন্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরিচালনা করেন। তাদের দ্বারা অন্য ভূখণ্ড দখল করেন এবং তা শাসন করেন। তাই তার চেয়ে অন্য কোনো পূর্ণ সার্বভৌমের কথা চিন্তা করা যায় না।

খলিফাগণ সার্বভৌম

যাঁরা মুসলিম রাষ্ট্রে আল্লাহর কুরআন এবং শরিয়াহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন তাঁরা কখনো খলিফার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন না। আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সার্বভৌম। কুরআন হলো তার মধুর প্রত্যাদেশ, এবং কুরআনের উপর ভিত্তি করে শরিয়াহ হলো উন্নতির নীতিমালা। তবে আমাদের উচিত পার্থিব জগতের জন্য মানবীয় সার্বভৌমের খোঁজ করা। উপরে দেখা যাবে যে, রাসূল (স) হলেন পার্থিব জগতে পূর্ণ সার্বভৌম। তাই তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফাগণও সর্বশক্তি ও ক্ষমতায় তাঁরই মতো সার্বভৌম। এখানে একটা বিতর্কের বিষয় হলো, যেহেতু খলিফাগণ তাদের সকল কাজে কুরআন এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাহর উপর নির্ভর করেন ও উপদেষ্টাদের বুদ্ধি ও পরামর্শ ছাড়া তাঁরা নিজেদের থেকে স্বীয় বুদ্ধি বলে কোনো আইন প্রয়োগ করতে পারে না সেহেতু অন্যদিকে খলিফারা অন্যান্য শাসকদের মতো কুরআন এবং সুন্নাহকে অনুসরণ করেন। রাসূলের উপদেশ মতো কাজ করেন। এসব কাজ হলো খলিফাদের জন্য নৈতিক কর্তব্য, যেমন বৃটিশ পার্লামেন্ট খৃস্টানদের নীতি অনুসরণ করে থাকে। খলিফারা ইচ্ছা করলে প্রয়োজনে কুরআন এবং সুন্নাহর বাহিরেও কাজ করতে পারতেন তবে আইন ও ন্যায়নীতির বাহিরে কোনো কাজ করতে পারতেন না। অনেক খলিফা রাসূল (স)-এর অনেক

www.pathagar.com

বিধান বা রীতিনীতিকে বাদ দিয়ে নিজেদের বুদ্ধিমত্তানুসারে কাজ করতেন যেভাবে বর্তমানে বৃটিশ পার্লামেন্ট তাদের নিজস্ব ক্রিশ্চিয়ান মূল নীতিমালা থেকে সরে গিয়ে ইচ্ছাধীন আইন প্রনয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকেন। অন্যদিকে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে কিন্তু তা থাকা সত্ত্বেও কেউ তার অনুসরণ করে না বরং শাসকগণ তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মনপড়া আইনের প্রশ্রয় নিয়ে থাকেন। মুসলিম দেশগুলোর শাসনকর্তাগণ কুরআন ও সুন্নাহকে ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র তাদের খেয়াল খুশি মত আইন প্রনয়ন করে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করছে যার জন্য তাদেরকে অহরহ বিপদের সম্মুখে পড়তে হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত জীবন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতে হচ্ছে। যেমন আরব রাষ্ট্রগুলো আল্লাহকে ভয় না করে আমেরিকার শক্তিকে ভয় করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকেই সাহায্য করছে যা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থি।

খলিফারাও যে কুরআন ও সুন্নাহ আইনের অসংগতি পূর্ণ কাজ করছে তার দু'একটা বিবরণ দেয়া হলো। কুরআন যেখানে মুতা বিবাহকে এই বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, যখন তুমি স্ত্রীদের থেকে সুখ লাভ করো তখন তাদেরকে স্ত্রীধন বা মোহরানা দাও।

ইবনে আব্বাস এবং উবাই ইবনে কাবের মতে এর মূল পংক্তি ছিলো নিম্নরূপ, যেমন যখন তুমি স্ত্রীলোকের কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য সুখ আহরণ করো (স্ত্রী সহবাসে) তখন তাদেরকে তাদের স্ত্রীধন অর্থাৎ প্রাপ্য মোহরানা দাও।

অনেক হাদীস শাস্ত্রবিদ যেমন আল বুখারী এবং মুসলিমের মতে মুতা বিবাহ রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায়ও প্রচলিত ছিলো। তবে কোন্ সময় এ মুতা বিবাহ বন্ধ হলো তার সঠিক হাদীস পাওয়া খুব মুশকিল। আবদুর রাজ্জাক, আবু দাউদ, ইবনে জারীর এবং ইবনুল মুনযির-এর মতে খলিফা ওমর (রা) মুতা বিবাহকে নিষিদ্ধ করে দেন। যাক বিভিন্ন ছোটখাটো ব্যাপারে অনেক মতদ্বৈত ঘটেছে তবে তালাকের ব্যাপারেও ঠিক মতদ্বৈত আছে। সময়ের সঙ্গে সংগতি রেখে ইজমা, কিয়াস, ইজতেহাদ ও ইজতেদালের মাধ্যমে তত্ত্বোপদেষ্টাদের মতামতের ভিত্তিতে কাজ করা হতো। খলিফারা পরবর্তী সময় কুরআন এবং হাদীসের উপর নির্ভর করে নিজেদের বিবেক বিবেচনা ও হাদীস শাস্ত্রবিদদের মত গ্রহণ পূর্বক কাজ করতেন। হয়তো সুন্নাহর সঙ্গে বা কুরআনের সঙ্গে সংগতি থাকতো না কিন্তু সময়ের সঙ্গে এর বিশেষ সামঞ্জস্য থাকতো।

www.pathagar.com

এখানে আর একটা ঘটনা উল্লেখ করতে হয় যে, স্ত্রীকে তিন তালাকের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা) কুরআন ও সন্নাহর উদ্ধৃত আয়াত ও বর্ণনাকে রদ করে ছিলেন। প্রথমাবস্থায় মুসলমানগণ প্যাগানদের মত যতবার খুশী তালাক দিতে পারতো এবং ইদ্দত পূর্ণ হবার পূর্বে গ্রহণ করতে পারতো। একদা একজন মুসলমান তার স্ত্রীকে বললো, "আল্লাহর কসম আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে তালাক দেইনি বা গ্রহণ করিনি, যদিও তুমি আমার স্ত্রীরূপেই আছ।" স্ত্রী লোকটি তখন বললো, "এটা কিভাবে সম্ভব।" ঐ লোকটি তখন বললো, "আমি তোমাকে তালাক দিবো এবং ইদ্দত পূর্ণ হবার পূর্বেই তোমাকে গ্রহণ করবো।" তখন ঐ স্ত্রীলোকটি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলেন এবং ঘটনাটি বললেন, তিনি তখন একথা রাসূল (স)-এর নিকট বর্ণনা করলে রাসূল (স) যতোক্ষণ আল্লাহর নিকট হতে কোনো প্রত্যাদেশ না পেলেন ততোক্ষণ অপেক্ষা করলেন তারপর প্রত্যাদেশ হলো ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ط

"তালাক কেবল দুবার অনুমদনীয়, তারপর উভয় দল কোনো সমঝোতা শর্তে এক সঙ্গে বাস করতে পারে বা সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯

এ থেকে দেখা যায় যে, সমঝোতার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী তালাক দিতে পারে বা পূর্ণ মিলতে পারে তবে তালাকের ক্ষেত্রে ভিন্ন দুটো ঘটনায় তালাক উচ্চারিত হতে হবে। আল বেদওয়াই বলেন ঃ "এক তালাকের পর, আর এক সময় (অন্য সময়) বলা।"

আল্লামা ইউসুফ আলী বলেন, একদা একজন লোক রাসূল (স)-এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আল্লাহর প্রত্যাদেশ দেখেন না যে তালাক কেবল দুবার ? তৃতীয় বার কোথায় ?" তিনি উত্তর দিলেন ঃ "সমঝোতার মাধ্যমে তালাক হওয়া বা বিচ্ছেদ ঘটানোটা হলো তৃতীয়।"

আবু আব্বাস (রা) বলেন, "যদি কোনো লোক তার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিনবার তালাক শব্দ উচ্চারণ করেন তবে উহাকে একবার তালাক হয়েছে বলে ধরতে বা মানতে হবে।"

এ নিয়ম রাসূল (স)-এর সমগ্র জীবনে চলছিলো। এমনভাবে হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়কাল এবং হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতের দু'বছর কালেও এ নিয়ম প্রচলিত ছিলো। কিন্তু হযরত ওমর (রা) একই

www.pathagar.com

বৈঠকে তিন তালাক ঘোষিত হলে তার অর্থ দুটোকে সমঝোতা হিসাবে দেখেছেন বা ধরেছেন।

এখানে আরো বলতে হয় যে, যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর এবং সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ বাদে বাকী অংশ সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হতো। তবে সেই পঞ্চমাংশের এক অংশ আল্লাহর নামে, রাসূল (স)-এর জন্য এবং তার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এবং অনাথ ও পথিকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। তবে রাসূল (স)-এর সময় ঐ এক-পঞ্চমাংশকে কাবা ঘরের জন্য ব্যয়িত হতো। কিন্তু রাসূল (স)-এর ওফাতের পর তাঁর অংশ সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হতো। অনেকের মতে বা বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর অংশ তাঁর বিবিদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। কুরআন অনুসারে তাঁরা তাদের অংশ পেতেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর সময় রাসূল (স)-এর আত্মীয়-স্বজন যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির কোনো অংশ পেতেন না।

খলিফাগণ ছিলেন পূর্ণ সার্বভৌম। যেহেতু তারা কুরআন অথবা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহকে প্রধান্য দিতেন এবং মান্য করে চলতেন সেহেতু তাঁরা ঐসকলের সার্বভৌমত্বকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। সার্বভৌমত্বের উপর হব্‌স তাঁর নিজ দৃষ্টিভংগীতে বলেন, "একজন সার্বভৌম তাঁর শাসনতান্ত্রিক সুষ্ঠু কাজ পরিচালনার জন্য কোনো লোক বা লোকসমষ্টি নিয়োগ করতে পারেন।" আইনকে বিধিবদ্ধ করতে যদি খলিফা কোনো আইনবিশেষজ্ঞকে তাঁর কাজে সাহায্যকারী নিয়োগ করেন বা তাঁর পরামর্শ চান তবে এতে ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, আইন বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে খলিফার কোনো ক্ষমতা নেই। তবে এ ব্যাপারে অনেক ঘটনা আছে যে, রাষ্ট্রীয় কাজে এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে রাষ্ট্র পরিচালনায় খলিফাগণ অনেক সময়ও বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তবে ইহা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মতো খলিফারাও সার্বভৌম ছিলেন।

রাজা সার্বভৌম

আরব সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব পর্যন্ত খলিফাগণ মুসলিম সাম্রাজ্য ও সমাজের প্রধান বলে বিবেচিত হতেন। তবে আরব সাম্রাজ্যের বিভাজ্য হওয়ার পর বিভিন্ন মুসলিম স্বাধীন দেশের শাসকগণ নিজেদেরকে খলিফাদের সহকারী মনে করতেন তাতে তাদের স্বাধীন ক্ষমতার কোনো খর্ব হতো না বরং এর দ্বারা তাঁরা তাদের শাসনকার্যে আইনগতভাবে স্বীকৃতি পেতেন। এমনকি গজনীর সেই শক্তিশালী শাসক সুলতান মাহমুদও সেই সময়ের দুর্বল খলিফার স্বীকৃতি চেয়ে ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তার স্বীকৃতি নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা

www.pathagar.com

করেন। অল্প কথায় বলতে হয় যে, সত্যবাদীদের নেতার কাছ থেকে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত নিজ রাজত্বকে আইনানুগ প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচনা করতেন না।

পরবর্তীকালে খলিফাদের দুর্বলতা এবং শাসনতান্ত্রিক আনুগত্য প্রকাশে ব্যর্থতার কারণে সুযোগ পেয়ে বা প্রাদেশিক গভর্নরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা দ্বারা ক্ষমতাকে বিভক্ত করে নিজেদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা দ্বারা খলিফাদের আনুগত্য অস্বীকার করেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে রাজতন্ত্র চলে আসে। তবে প্রথম অবস্থায় দেখা যায় যে, খলিফাগণ দুর্বল হলেও স্বাধীন শাসকগণ তাদের অধিনতা স্বীকার করতেন কিন্তু পরবর্তীকালে এমন কি কোনো মোঘল বাদশাহগণও খলিফাদের অধিনতা স্বীকার করতো না। চেঙ্গীস খানের বংশধররা তাদের চেয়ে কাউকেও শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করতো না।

প্রথম দিকে খলিফা হতে হলে তাকে কুরাইশ হতে হতো এবং সকল মুসলমানদেরকে তাঁর একক শাসনাধীনে একত্রিত হতে হতো। আল বাকীলানীর মতো আইনজ্ঞ ঘোষণা করেন যে, যেহেতু গোত্রীয় বিভাগ বা ভাঙ্গনের জন্য কুরাইশগণ দুর্বল হয়ে পড়েছে সেহেতু খলিফা কুরাইশ বংশের হতে হবে তার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। ইবনে খালদুনও এ মত অভিব্যক্ত করেছেন। তৈমুরলং বলেছেন যে, সৃষ্টিকর্তা যখন এক তখন তাঁর প্রতিনিধিও হবেন একজন এবং তাই প্রজাগণকে জানতে হবে যে রাজা কারো করতল গত নয়। নিজ সত্ত্বায় নিজেই বেঁচে আছেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সম্রাট বাবরের ধ্যান-ধারণা ধর্মের চেয়ে খুব ব্যবহারিক ছিলো। তৈমুরের বংশধররা খলিফাদের আইনানুগ শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করতে চাইতো না। তবে তারা দুর্বল অটোমানদের সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয়নি। কারণ তারা তাদেরকে অটোমানদের চেয়ে উন্নত মনে করতো। বাদশাহ হুমায়ুন তাঁর কার্য দ্বারা মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি ঐশ্বরিক শক্তি প্রদত্ত।

আকবরের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জাগে না। কারণ যেখানে চেঙ্গিস খানের বংশধরগণ তাদের চেয়ে কাউকে শ্রেষ্ঠ মনে করেননি এবং হুমায়ুন কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেননি, তাই মহামতি আকবর তাঁর চেয়ে কাউকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিবেন এ ধারণা জাগতে পারে না। ভারতে মোঘল রাজাদের পক্ষে যা সত্য পৃথিবীর অন্যান্য অংশের স্বাধীন মুসলিম রাজা বা বাদশাহদের পক্ষে সেটাই সত্য ছিলো। যেহেতু তাঁরা সকলেই সার্বভৌম ছিলেন সেহেতু অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না

www.pathagar.com

সর্বশেষ একথা বলতে হয় যে, রাসূল (স)-এর পরে তাঁর খলিফাগণ এবং পরবর্তী সময় স্বাধীন মুসলিম রাজ-রাজাগণ তাঁদের স্বাধীন সার্বভৌমত্বের ব্যবহার করেছেন এবং তাঁরা যে যেই রাষ্ট্র শাসন করেছেন সে সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ছিলেন।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের মতে সার্বভৌমত্ব কোনো শাসকের হাতে ন্যস্ত থাকে না। কারণ রাষ্ট্রের জনগণ হলেন সকল সার্বভৌমত্বের মূল উৎস। তবে আরব রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ভাল করে পড়লে এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সার্বভৌম ক্ষমতার মূল আধার হলো জনগণ।

প্রথম যুগ থেকে খলিফাগণ ছিলেন জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত খলিফা। তাঁরা যতোদিন সদ্ব্যবহারের দ্বারা জনগণকে ন্যায়সংগতভাবে শাসন করতে পারতেন ততোদিনই ছিলো তাঁদের আয়ুস্কাল। এখানে একথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সকল সময় খলিফাগণ ঘোষণা করতেন যে, যতোদিন পর্যন্ত জনগণ তাঁদের উপর বিশ্বাস রাখবেন ততোদিন পর্যন্ত তাঁরা রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থে শাসন কার্য পরিচালনা করবেন। কিন্তু জনগণের বিশ্বাস হারালে তাদেরকে শাসন ভার ছেড়ে দিতে হবে। সে যুগেও শাসনকর্তা বা খলিফাগণ জনগণের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশগুলোতে এর কোনো চিত্র পাওয়া যায় না। হয়তো কোনো দেশের শাসকগণ বলে থাকেন যে, যতোদিন জনসাধারণ আমাকে চাইবে বা ভালবাসবে ততোদিন আমি জনগণের খেদমত করবো। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে যে, জনগণ না চাইলেও তাঁরা সরকারের কাজে নিয়োজিত থাকেন। এখানে কথা ও কাজের কোনো মিল বা সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

সেখানে খলিফাগণ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত এবং তাদের উপর নির্ভর করতেন তখন জনসাধারণই সার্বভৌম। কারণ জনগণের উত্তম রায়কে খলিফা বা শাসকদেরকে মেনে নিতে হতো। তবে জনসাধারণ বুঝাতে এখানে সকল জনসাধারণকে বুঝানো হয়নি কারণ সরকারের কাজে রাষ্ট্রের প্রত্যেক জনগণই অংশ নেন না। তাই শিক্ষিত, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান জনগণকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় শাসন ও আইনে কেবলমাত্র যাদের দক্ষতা আছে। তাই সরকারের স্থায়ীত্ব সেই দক্ষ ও জ্ঞানী চিন্তাবিদদের মতামতের উপর নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অবস্থারও ধারা পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে ইজমা, কিয়াস ও ইজতেহাদ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। যেখানে যে সমস্যার বিধান কল্পে কুরআন এবং শরিয়াহর মধ্যে

www.pathagar.com

কোনো সনাতন ধারা পাওয়া যায় না সেখানে চিন্তাবিদ বা মুজতাহিদগণ, ইজমা, কিয়াস, ইজতেহাদ প্রভৃতির দ্বারা এর সুষ্ঠু সমাধান করে থাকেন। তবে সেকালে জনগণের দ্বারা সুষ্ঠু আইনে কুরআন ও সুন্নাহর ধারা উপধারা সংযোযিত থাকতো। কুরআন ও সন্নাহর সাহায্য ছাড়া সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হতো না। তাই সূত্রগতভাবে সকল আইনই কুরআন এবং হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেহেতু সূত্রগতভাবে আল্লাহই সার্বভৌম কিন্তু ব্যবহারিক-ভাবে জনগণ সার্বভৌম।

কুরআন হলো জ্ঞানী ও গুণীদের জন্য—জ্ঞানী ও গুণীজন ছাড়া কুরআন বুঝতে সক্ষম নয়। তাই ভালভাবে অনুসন্ধান করলে কুরআন ও হাদীসের মধ্যেই সকল সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাবো।

❐

www.pathagar.com

খলিফা

কার্যপদ্ধতি

খলিফাদের কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় অনুশাসনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন খলিফা। হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং বিশেষ করে আরব এবং মুসলিম বিশ্বের পার্থিব মুক্তিদাতা ও শাসনকর্তা। তিনি একাধারে ছিলেন রাজাধিরাজ আর অন্যদিকে ছিলেন ঐশ্বরিক নেতা। আল খুদরীর মতে খিলাফত হলো ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা পার্থিব নেতৃত্ব।

ধার্মিক খলিফাগণ যেহেতু মহান রাসূলের পরবর্তী পার্থিব উত্তরাধিকার সেহেতু হজ্জের ও সালাতের নেতৃত্বদানকারী নেতা। এ ধর্মীয় ব্যবস্থা তাঁদের কার্য এবং অফিসের সঙ্গে সংযুক্ত। খলিফাদের কার্যক্রমের সঙ্গে ধর্মীয় কার্যক্রম অঙ্গাআঙ্গিভাবে গ্রথিত। তবে উমাইয়া খলিফাদের রাজত্বকালে তাঁদের অফিসের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়, কারণ ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা উদাসীন ছিলেন এবং পূর্ববর্তী খলিফাগণের ন্যায় ধর্মীয় নেতৃত্ব তাদের মোটেই আওতাধীন ছিলো না।

আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় এসে প্রাথমিক যুগের মুসলিম রাষ্ট্রের মতো সত্যনিষ্ঠ এবং অপক্ষপাত শূন্য শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে ব্রত হন। যে ন্যায়নিষ্ঠ বিপ্লব মক্কায় কুরাইশ, ফারাসের সালমান, আরবের কোনো সম্ভ্রান্ত লোক, নিগ্রো বিলাল, সাধারণ একজন বেদুইন এবং জাবালহ এর মতো একজন রাজ পুত্রকে সমান মর্যাদা দিয়েছিলো, সে বিপ্লবেই উমাইয়াদের সময় অনারবদের প্রতি অভদ্রসুলভ ব্যবহার এবং পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য বিরুদ্ধবাদ শক্তি হিসাবে কাজ করে এবং তাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করে। তবে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসাবে আব্বাসীয়গণ ধর্মীয় অনুশাসন এবং ইমামতের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যত্নবান হন। আব্বাসীয়দের খেলাফতে আসীন হওয়ার প্রায় অর্ধশতাব্দী পর খলিফাতে রাসূলুল্লাহ খলিফাতুল্লাহ এবং পৃথিবীতে জিললুল্লাহ হলেন।

অফিসের সময়কাল

নির্বাচনের পরে খেলাফতে আসীন হয়ে খলিফা আবুবকর (রা) যে বক্তব্য রাখেন তাতে প্রতিয়মান হয় যে, যতো দিন তিনি জনগণের বিশ্বাসভাজন থাকবে ততোদিনই তিনি শাসকের পদ অলংকৃত করবেন। অপরপক্ষে

www.pathagar.com

খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে একদল লোকের অসন্তোষ ছিলো এবং সে কারণে তারা খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর পদত্যাগ দাবী করেন। খলিফা হযরত ওসমান (রা) এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যে, যে পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে জাতির বিশ্বাসভাজন হিসাবে কাজ করতে পারবেন ঠিক ততোদিনই খলিফা হিসাবে খেলাফতের কাজ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি কোনো খারাপ কাজ করেননি বা রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস হারাননি যার জন্য তাকে পদত্যাগ করতে হবে। তবে সে যুগে সকল জনগণের মতামত গ্রহণ করতে অপারগ হন এবং কিছু দুষ্ট গ্রহের চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়।

উমাইয়া খলিফাগণ স্বীকার করতেন যে, খলিফার কার্যকাল তাঁর ভালো কাজ এবং জনগণের বিশেষ করে মুসলমানদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। খলিফা ওমর (দ্বিতীয়) খারিজীদেরকে বলেন যে, যতোদিন পর্যন্ত তিনি ভালো কাজ করবেন এবং মুসলমানদের বিশ্বাস ভাজন থাকবেন ততোদিন পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁর পরেও ইয়াজিদ (তৃতীয়) ঠিক এ পথই অনুসরণ করেন।

আব্বাসীয় খলিফাদের আমলেও এ নীতির প্রচলন ছিলো। খলিফা আল মামুন খারিজীদের বক্তব্যের প্রতিউত্তরে এ নীতিকে সঠিক বলে স্বীকার করেন। তাঁর নীতি ছিলো যে, প্রত্যেক খলিফা নির্বাচিত হবেন এবং তিনি যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাসভাজন থাকবেন ততোদিন খেলাফত পরিচালনা করবেন। কিন্তু সে যুগে এমন কোনো সঠিক পদ্ধতি ছিলো না—যার মাধ্যমে জনগণ একত্রিত হয়ে খলিফার পরিবর্তন করতে পারে বা অপরিহার্য প্রয়োজনে পরিবর্তন করা উচিত। সে যুগে যাতায়াতের এবং সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কোনো সুব্যবস্থা ছিলো না বলে জনগণ খলিফার কার্যবিধি সম্বন্ধে সকল কিছু জানতেন না। সেহেতু খলিফাকে অপসারণ দরকার হলেও প্রয়োজনে তা করা সম্ভব হতো না। আবার কিছু সংখ্যক স্বার্থপুষ্টের দল তাদের নিজেদের প্রয়োজনে হয়তো খলিফা ভাল কাজ করলেও তাঁর পরিবর্তন চেয়েছেন। তবে বর্তমান বিশ্বে দেখা যাচ্ছে যে, সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য যেখানে জনগণ সরকারের অপসারণ চায়, সেখানে সরকার তাদের নিজ শক্তিতে উল্টো জনগণকেই নেস্তনাবুত করে ক্ষমতায় থাকার সকল চেষ্টা করে থাকেন। বর্তমান বিশ্বে কেউ জনগণের কথায় কর্ণপাত করতে চায় না কারণ জগত হলো স্বার্থপুষ্টের জন্য। যেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সেখানে কোনো করুণ আর্তনাদও জায়গা পায় না। বর্তমান বিশ্বে কেবল মাত্র আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড ছাড়া সর্বত্রই নির্বাচন একটা প্রহসন মাত্র। শুধু মাত্র শক্তির বলে খেয়াল খুশি মতো বর্তমান শাসকগণ তাদের গদি আঁকড়ে থাকেন।

www.pathagar.com

খলিফাদের কর্তব্য

এখানে একটা বিষয় স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) একাধারে শাসক অন্যদিকে ধর্মীয় নেতা ছিলেন। রাজনৈতিক সর্বময় ক্ষমতা ও নীতি তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিলো। তিনি জনগণের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর প্রত্যাদেশানুযায়ী সকল নীতি নির্ধারণ করে থাকতেন। যে সকল আরবীয় গোত্র তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করতেন কেবল তাদের দূতদেরই তিনি সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তাদেরকেই খাজনা ও কর আদায়ের জন্য সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করতেন। সামগ্রিক বিষয়ে তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর আদেশেই সৈন্যবাহিনী পরিচালিত হতো। তাঁর আদেশ না পেলে সৈন্যরা তাদের নিজেদের ইচ্ছামত কোনো অভিযান পরিচালনা করতে পারতো না, কারণ তিনি ছিলেন একাধারে সেনাধ্যাক্ষ এবং রাষ্ট্রপতি। তিনি একাধারে আইনজ্ঞ ও ব্যবস্থাপক ছিলেন। তিনি কেবল মাত্র বিধিসংগত আইনই ঘোষণা করেননি বরং কাজী উল কুজ্জাত হিসাবে সকল মামলার নিস্পত্তি করতেন, যার বিরুদ্ধে কারো কোনো আপিল চলতো না বা করতো না। এছাড়াও তিনি প্রত্যেক সালাতে (নামাযে) ইমাম হিসাবে ইমামতি করতেন। এক সঙ্গে এ সকল কাজ তাঁর কোনো সময় ভুল বশতঃ কোনো ভুল হওয়ার নজীর পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

আল মাওয়ারর্দীর মতে খলিফাদের নিম্নোক্ত ১০টি গুণাবলী ও কর্তব্য জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

(১) ধর্মের সাথে কোনো নূতন বিষয়ের সংযোজন বা পরিবর্তন করা যাবে না এবং প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, প্রত্যেক লোক যেনো এ অনুশাসন মেনে চলে এবং এর প্রতি বাধ্যগত থাকে। অপরপক্ষে ধর্মে যে সকল কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তা থেকে মুক্ত রাখে।

(২) ন্যায় বিচার করা এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে সত্যবাদীদেরকে রক্ষা করা।

(৩) আইন প্রতিষ্ঠা দ্বারা রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপন করা।

(৪) রাষ্ট্রীয় আইন এবং নৈতিক আইন ভংগকারীদেরকে আইনের মাধ্যমে যথাযথ শাস্তি বিধান করা।

(৫) রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষা করা।

(৬) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর লোকদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য আহবান করা এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে অস্বীকার করলে তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করা।

www.pathagar.com

(৭) কর দিতে অস্বীকৃতি জানালে করদাতাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে খারাজ এবং সাদাকাত আদায় করা।

(৮) যারা সাহায্য এবং ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে নিয়মিত সাহায্য করা এবং ষ্টাইপেণ্ড দেয়া।

(৯) কেবল মাত্র সত্যবাদী এবং যোগ্য লোককে তাঁর স্থলাভিসিক্ত করা। বিশ্বাসী ও ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে গভর্নর ও আমির নিয়োগ করা। খুব বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ এবং বিশ্বাসী লোকদেরকে কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা।

(১০) রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজের প্রতি পুরোপুরী নজর দেয়া এবং যারা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অপরিপক্ক লোকদের পরামর্শ না নিয়ে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিয়ে সতর্কতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করা। কারণ স্বার্থান্বেষীরা মুনাফেকী ও চক্রান্ত করে সরকারকে পর্যদস্তু বা হেস্তনেস্ত করতে পারে। সকল সময় মোনাফেকদের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা।

খলিফাদের যোগ্যতা

আল মাওয়ার্দী মনে করেন খেলাফত হলো একটা নির্বাচক সংস্থা। এ জন্য তিনি নির্বাচক মণ্ডলী এবং নির্বাচন প্রার্থী উভয়েরই প্রায়োজনীয় যোগ্যতার উপর আলোকপাত করেন। তার মতে খলিফাকে অবশ্যই কুরাইশ গোত্রীয় হতে হবে, উক্ত বিষয়ের উপর কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান থাকতে হবে, পুরুষ হতে হবে, পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে, উন্নত চরিত্রের হতে হবে, দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে এবং ইমামতী করার যোগ্যতা থাকতে হবে। আইনসঙ্গতভাবে সকল মামলার নিষ্পত্তি করার সুষ্ঠু জ্ঞানও থাকতে হবে। সরকারী কাজে সুক্ষ্মদর্শী এবং পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব ও সীমানা রক্ষাকল্পে তাঁকে সাহস ও শক্তি দেখাতে হবে। "নির্বাচনী সার্বভৌমত্বের ধারণার প্রকৃত ফলাফলে আল মাওয়ার্দী সার্বভৌম জাতির মধ্যে দ্বিপক্ষীয় যুক্ততাকে সম্মান করেন। অপরপক্ষে কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য যেহেতু তিনি সার্বভৌমের উপর কিছু কাজ এবং কর্তব্য চাপিয়ে দেন সেহেতু জনগণ তার কাছে আনুগত্য এবং বাধ্যতা স্বীকার করেন।" আল মাওয়ার্দী সামাজিক যোগ্য সূত্রের সুপারিশ করতে পারতেন যেমন নাকি রুশো করেছেন ঃ "রাজনীতির ধারাকে এমন সহজ এবং সহজবোধগম্য গ্রহণ করেছেন যা আরবদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রকৃষ্ট ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ।"

www.pathagar.com

খলিফা সম্বন্ধে আল মাওয়ার্দীর প্রথম যোগ্যতার মাপকাঠি হলো যে, তাঁকে কোরাইশ হতে হবে। কিন্তু সকল মুসলিম চিন্তাবিদগণ এ মতবাদকে গ্রহণ করেননি। "কালের স্রোতে অনেক রাজনৈতিক দল গঠিত হলো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর অনেক বিরুদ্ধবাদ মতামতের প্রকাশ হলো এর মধ্যে হয়তো বাস্তবিক পক্ষে নির্বাচন সূত্র এবং উত্তরাধিকার নির্বাচনই হলো মূল বিষয়। বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন মত, কিন্তু সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত দল সকল সময়ই গ্রহণযোগ্য নিষ্পত্তি গ্রহণ করতেন এবং খলিফাকে আইনানুগ নির্বাচিত বলে স্বীকার করতেন। কারণ খলিফাগণ সবচেয়ে জ্ঞানী, প্রসিদ্ধ ও প্রভাবান্বিত লোকের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। তবে সে সময় এর বিরুদ্ধে কেবলমাত্র শিয়া গোত্র দাঁড়ালেন এবং ঘোষণা করলেন যে হযরত আলী (রা)-এর বংশধরগণ খেলাফতের যোগ্য। অপরপক্ষে গণতান্ত্রিকমনা খারিজীরা উপরোক্ত অভিমতের বিপরীতে মত প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন যে, আল্লাহভীরু যে কোনো ধার্মিক মুসলমান সে যে কোনো গোত্রের হোক, হোক কৃষক অথবা একজন নাবাতিয়ানী, সে মুসলিম সমাজে খলিফা নির্বাচিত হতে পারেন।" কারণ ইসলামী বিধানে সকল মুসলমানের মর্যাদা সমান কেউ কারো চেয়ে ছোট বা বড় নয়।

পদমর্যাদা

প্রথম অবস্থায় খলিফাদেরকে তিনটি পদবীতে ভূষিত করা হতো যেমন— খলিফা, আমিরুল মোমেনিন এবং ইমাম। তবে খলিফা শব্দের সঙ্গে সত্যের প্রবর্তক আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, কারণ তাঁরই উত্তরাধিকার হিসাবে প্রতিনিধি স্বরূপ খলিফাগণ কাজ করে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ আমিরুল মোমেনিন রাষ্ট্রের শাসন কার্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার নেতা ও সমর কৌশলী। ইমাম বললে ধর্মীয় নেতা বলেই বেশী বিবেচিত হয় কারণ এ পদমর্যাদা কেবল নেতাদের দেয়া হয়ে থাকে। শিয়াগণ তাদের নেতাকে ইমাম বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের ধারণা যে, তাদের ইমাম ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রদত্ত। খলিফাদের মধ্যে আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন মুদ্রায় প্রথম আল ইমাম শব্দ ব্যবহার করেন।

সরাসরি কোনো ঐশ্বরীক সমর্থন নয়

ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কুরআনে খিলাফত সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হয়নি এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও সরাসরি তাঁর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কোনো সঠিক উপদেশ দিয়ে যাননি। তবে খলিফা, ইমাম বা এ জাতীয় একই অর্থপূর্ণ বিভিন্ন শব্দ কুরআনে পাওয়া যায় কিন্তু অনেক সংখ্যা সম্বন্ধীয় সূত্র

www.pathagar.com

এবং খলিফা শব্দটির ঐতিহাসিক শব্দের সঙ্গে সম্পূরকভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না। কুরআনে খলিফা সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা দেয়া আছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○ ـ البقرة : ٣٠

"স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি, তারা বললো, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে ? আমরা তো আপনার প্রশংসা, স্তুতি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি, তিনি বললেন ঃ আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

যদিও হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর উত্তরাধিকার মনোনয়নের ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দিয়ে যাননি তবুও কিছু সংখ্যক লোক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তার গুণাগুণের সঙ্গে এ গুণ যোগ করে দিয়েছেন যে, তাঁর উত্তরাধিকার হতে হলে তাকে কোরাইশ হওয়া উচিত। আর যেই ক্ষমতায় আসুক তাকে এ শর্তটি মানতে হবে। তবে শাসনকর্তার প্রতি সকলকে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে এবং তাকে মেনে চলতে হবে। তিনি যদি কোনো সময় কোনো কাজ করতে আদেশ দেন তা যদি হযরত (স)-এর নির্দেশের বিরুদ্ধবাদও হয় তবে সে নির্দেশ ও আদেশ মেনে চলতে হবে এবং যে পর্যন্ত না ক্ষমতা হযরত ঈসা (আ) অথবা ইমাম মেহেদীর উপর বর্তায় সে পর্যন্ত উক্ত ক্ষমতা আব্বাসের বংশধরদের হাতে থাকবে। কল্পনাকারীদের ব্যাখ্যায় বা ভাবনায় যাই হোক না কেনো এটা সত্য যে, এ খলিফার খেলাফত কেবল মাত্র সময়ের প্রয়োজনে এসেছে, কিন্তু কাল্পনিকদের প্রতিনিয়ত সমর্থন নয় বা কোনো চিন্তাবিদদের চিন্তা ও ধারণায় আসেনি।

মতবাদ এবং ব্যবহারের মধ্যে প্রসারতা

মানব সৃষ্টির সূত্রগতভাবে ব্রিটিশ রাজা সর্বেসর্বা। তিনি "ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীকে নিষিদ্ধ করতে পারেন, নৌবহর বিক্রয় করতে পারেন, যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন, ব্রিটিশ রাজ্য ছেড়ে দিতে পারেন। প্রত্যেকটা ব্রিটিশ জনগণকে দস্যু বানাতে পারেন। সরকারী চাকুরীজীবিদেরকে বরখাস্ত করতে পারেন আর রাজত্বে যে কোনো ক্রিমিনালকে ক্ষমা করতে পারেন এবং আরো অনেক।" কিন্তু সত্যিকারভাবে বলতে গেলে তিনি একজন পাপেট ভিন্ন আর কিছুই নয়। অপরপক্ষে সূত্রগতভাবে খলিফারও কোনো আইনানুগ ক্ষমতা

www.pathagar.com

নেই, কারণ ঐশ্বরীক আইনকে কেবলমাত্র বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে তাকে চলতে হয়। আল্লাহর বিধানের বাহিরে তার কিছুই করার নেই। শরীয়াহকে কেবলমাত্র ইসলামী চিন্তাবিদ বা ফিকাহ শাস্ত্রবিদ এবং বিজ্ঞ আলেমগণ সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু খলিফাগণ অনেক সময় নিজস্ব এবং সরকারী আইনের সংশোধন, সংযোজন, পুনর্বর্ধন প্রভৃতি করতে পেরেছিলেন। তবে আল্লাহ প্রদত্ত আইনকে মেনে চলাই ইসলামী বিধান।

স্বীয় গুপ্ত বিষয়ক সম্পত্তি

মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর পরিবার পরিজন এবং নিজের খরচের জন্য রাষ্ট্রীয় দ্রব্যের মধ্যে আটটি বিষয় নিজের অধিনে রাখেন। তবে পরিবার পরিজন এবং নিজের খরচের পরে যদি উহা হতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো তা তিনি বহিরাগতদের জন্য খরচ করতেন।

প্রথম দফাতে তাঁর সাতখণ্ড জমি ছিলো যেমন, আল মুনবিত, আস সাফিয়াহ, আদ দালাল, আল হুছনা, আল বুরিকাহ, আল আরাফ এবং আল মাছরাবাহ। ওহুদের যুদ্ধের পূর্বে এ জমিগুলো একজন ইহুদী দার্শনিক নুহায়রিক এর ছিলো। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের পূর্বেই তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে উক্ত সম্পত্তিগুলোকে রাসূল (স)-এর নামে উইল করে দেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং শহীদ হন। দ্বিতীয় দফায় তিনি বানু নাদিরদের সম্পত্তি লাভ করেন। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চমদফায় তিনি খাইবারের আটটি শক্তিশালী ঘাঁটির মধ্যে তিনটি ঘাঁটি আল খুমস ও আল ফাই লাভ করেছিলেন। তবে আল খুমস এবং আল ফাই দ্বারা এ তিনটি সম্পত্তি হযরতের নিজস্ব সম্পদ হলো। ৬ষ্ঠ পর্যায় তিনি ফাদাকের অর্ধাংশ, সপ্তম দফায় ওয়াদিউল কুরার এক-তৃতীয়াংশ এবং অষ্টম পর্যায় মাহর ওয়াধাকার বাজার লাভ করেন।

রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসাবে এ সকল সম্পত্তি ছাড়া তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সম্পত্তি ও সম্পদ লাভ করেন। পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি উম্মে আইমান নামক একজন আবিসিনিয়ান কৃতদাসীকে পান এবং তৎসঙ্গে সুক্রান ও তার ছেলে সালেহকে দাস হিসাবে মাতার উত্তরাধিকার সূত্রে মদীনার 'সুবু'বানী উলা নামক স্থানে থাকার জন্য ঘর লাভ করেন এবং অন্য দিকে তাঁর স্ত্রী বিবি হযরত খাদিজা (রা)-এর কাছ থেকে সুকু আতারিন-এর পশ্চাতে মক্কাতে ছাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসের জন্য বাড়ী-ঘরসহ অনেক সম্পত্তি ও সম্পদ লাভ করেন। তাঁর স্ত্রী

www.pathagar.com

বিবি খাদিজার কাছ থেকে জায়েদ বিন হারিসাকে উপঢৌকন স্বরূপ পান। হযরত পরবর্তী সময় তাঁর সকল দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেন কিন্তু উম্মে আইমানকে জায়েদের নিকট বিবাহ দেন।

অন্যদিকে তাঁর পরবর্তী খলিফাদের কথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হযরত আবুবকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর নির্বাচনের পর পরবর্তী ছয় মাস পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যবসায় তদারকি করেন। পরে যখন দেখলেন যে, নিজের ব্যবসার দরুন রাষ্ট্রীয় কাজে অনেক ক্ষতি হচ্ছে তখন ব্যবসা ছেড়ে দেন এবং এর পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাঁর ভরণপোষণের জন্য সামান্য গ্রহণ করতেন। তাঁকে বাৎসরিক ৬০০০ দিরহাম দেয়া হতো। কিন্তু এ অর্থও তিনি খুব সংকোচের মধ্যে গ্রহণ করতেন। তবে এর প্রতিদান স্বরূপ মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর নিজস্ব সকল সম্পত্তি মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করেন।

খলিফা হযরত ওমর (রা) একজন সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। ইসলামের সেই প্রথম অবস্থায় তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কার্যের জন্য বাৎসরিক বৃত্তি হিসাবে ৫০০০ দিরহাম পেতেন। খাইবারের ইহুদীদের সম্পত্তির ন্যায্য প্রাপ্য দিয়ে যখন দেশান্তরী করা হলো, খলিফা ওমর (রা) সেই সম্পত্তিকে ১৫৮০ ভাগে ভাগ করেন এবং এটা থেকে তিনি তাঁর নিজের জন্য কিছু অংশ রাখেন। এ সকল থেকে মনে হয় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা প্রথম খলিফা থেকে ভালই ছিলেন। তিনি খলিফা আবু বকরের মতো তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করেননি।

খলিফা হযরত ওসমান (রা) মুসলমান হওয়ার পূর্বে একজন বিত্তশালী লোক ছিলেন। তিনিও হযরত ওমর (রা)-এর মতো সরকারী কোষাগার থেকে বাৎসরিক বৃত্তি স্বরূপ ৫০০০ দিরহাম গ্রহণ করতেন। এছাড়া হযরত মুহাম্মাদ (স)-এবং প্রথম দুই খলিফার অধীনে বহু ফিফ্স গ্রহণ করেন। তাঁর নিজ শাসন আমলেও অনেক সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি নগদ ১,৫০,০০০ দিনার, ১০,০০,০০০ দিরহাম এবং বিভিন্ন জায়গায় যেমন ওয়াদিউল কুরা, হুনায়েন এবং অন্যান্য স্থানে ১,০০,০০০ দিনারের সম্পত্তি রেখে মারা যান। ইহা ছাড়া তিনি অগণিত উট এবং ঘোড়া রেখে গেছেন। সে সময় তার ঘোড়াশালা ছিলো খুব প্রসিদ্ধ।

হযরত ওমর (রা) ও হযরত ওসমান (রা)-এর মতো হযরত আলী (রা)-ও খেলাফতে সমাসীন হয়ে বাৎসরিক বৃত্তি হিসাবে ৫,০০০ দিরহাম নেন এবং রাসূল (স) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকেও অনেক ফিফ্স

www.pathagar.com

পান। রাসূল (স) তাঁকে চার খণ্ড জমি ফিফ্স স্বরূপ দেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে ইয়ানবু ছাড়াও এর এক খণ্ড জমি ফিফ্স স্বরূপ দেন।

খলিফা মুয়াবিয়াহ তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি রাজকার্য পরিচালনার জন্য ২,০০০ দিরহাম পেতেন। খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর শাসন কালে মুয়াবিয়াহর অনুরোধে তিনি সিরিয়ায় প্রেট্রিসিয়ানদের পরিত্যক্ত জমি এবং বিদ্রোহীদের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। এছাড়া ফাদাকের সম্পত্তি তার ও তাঁর কর্তৃত্বাধীনে চলে গেলো। তৎকালে মুয়াবিয়াহর অধীনে অনেক সহায় সম্পত্তি ছিলো যা পরবর্তীকালে তিনি তাঁর সুবিধার জন্য এর কিয়দংশ নিজস্ব সহকর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেন।

মুয়াবিয়ার অধিকাংশ সম্পত্তি খলিফা আবদুল মালিকের হস্তগত হয়েছিলো। তবে তিনি নিজেও অনেক অর্থ ও সম্পত্তির অধকারী ছিলেন। তাঁর পুত্র হিসাবে সে যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভূমিস্বর ছিলেন। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের বক্তৃতা থেকে জানা যায় যে, উমাইয়া খলিফা এবং তাদের পুত্রদের কতো সম্পত্তি ছিলো। "হে মারওয়ানের বংশধরগণ! তোমরা অনেক মান-সম্মান ও সম্পদের অধিকারী। আমার ধারণা জনগণের সম্পদের অর্ধেক নয়তো দুই-তৃতীয়াংশ তোমাদের করতলগত।"

ওমর বিন আবদুল আজিজের কথা প্রশ্নাতীত। একদিন তাঁর স্ত্রী ফাতেমা তাঁকে কাঁদতে দেখে বিনয় বসত ও স্নেহের সুরে তাঁর দুঃখের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সেই মহান খলিফা তাঁর প্রতি উত্তরে বললেন, "হে ফাতেমা! আমাকে মুসলমান এবং আগন্তুকদের শাসক বানানো হয়েছে এবং আমি দুঃখী ও গরীবদের কথা চিন্তা করি, তারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে এবং দুর্বলরা আশ্রয়হীন, যারা ছন্নছাড়া ও বিবস্ত্র তারা আরো অসহায় এবং অত্যাচারিত, জীর্ণ ও ছিন্নমূল আগন্তুকরা বন্দীবাসী, শ্রদ্ধেয় বয়স্কগণ যাদের পরিবার পরিজন অনেক বেশী কিন্তু আয় কম তারা যারা এ পৃথিবীতে বাস করে এবং দূর প্রান্তে থাকে আমার ধারণা যে, আমার প্রভু শেষ বিচারের দিনে আমার কাছে তাদের হিসাব চাইবেন। আমি ভীত যে, সে সময় কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যাবে না এবং আমাকে কাঁদতে হবে।"

শাসনভার গ্রহণ করার পর রাজকীয় আস্তাবলে তাঁর জন্য যে ঘোড়া ছিলো তা বিক্রি করে উহার অর্থ তিনি বায়তুলমালে জমা দেন। অন্যদিকে তিনি তাঁর স্ত্রীকে তার সকল গহনা রাজকীয় কোষাগারে ফেরত দিতে বাধ্য করেন এবং সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের কাছে পত্যর্পণ করেন। তিনি নিজের জন্য প্রতিদিন এক দিরহাম গ্রহণ করতেন এবং উহাও বেসরকারী রন্ধনশালায় জমা দিতেন

www.pathagar.com

এবং সেখান থেকে খাবার নিয়ে গরীবদের সঙ্গে বসে খেয়ে নিতেন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এ ব্যাপারে সুখী হতে পারেননি, কারণ তিনি বেশী দিন শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেননি। কারণ তাঁর উত্তরাধিকারীগণ বহু সম্পত্তির ও অর্থের মালিক ছিলেন।

আব্বাসীয়গণ তাদের বৃত্তি লাভ করতেন এবং অন্যদিকে যুদ্ধলব্ধ অর্থ ও সম্পত্তির অংশ নিতেন। রাজকীয় সম্পত্তি ছাড়াও তারা বহু নিজস্ব সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ঐগুলো তত্ত্বাবধায়নকল্পে তাঁরা "দিওয়ানুধ দিয়া" নামক একটা বিভাগও খোলা রেখেছিলেন।

এ প্রসংগে বলতে হয় যে, প্রথম চার খলিফা এবং পরবর্তী খলিফা এবং পরবর্তী সময় বিশেষ করে খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ যেভাবে তার সকল কিছু মুসলমানদের উন্নতি কল্পে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তার নজীর অন্য কোনো সময় কোনো মানুষের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশগুলোতে দেখা যায় যে, শাসনকর্তা হওয়ার পর নিজের কিছু না থাকলেও পলকের মধ্যে নিজের জন্য বা আত্মীয় পরিজনদের ভোগ বিলাশের জন্য নিশ্চুপে সরকারী অর্থেই অনেক কিছু করে ফেলেন যার নজীর ইতিহাসে দ্রষ্টব্য। তবে এ জগতে শাসকগণ ছাড়া সবাই দুর্বল। কারণ শাসকদের হাতে ন্যস্ত থাকে অপরিসীম ক্ষমতা তাই জনগণ নিরস্ত্র, ক্ষমতাহীন ও হতভাগা।

ব্যবস্থাপক, কার্যনির্বাহী এবং বিচারালয় সম্পর্কিত ক্ষমতা

মুসলিম রাষ্ট্রে খলিফাগণ হলেন বিধিগতভাবে শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ, নির্বাহী এবং বিচারক। রাষ্ট্রীয় বিধি কার্যকরণে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর যে সকল আইন প্রচলিত ছিলো তা সংখ্যায় খুব নগণ্য। এগুলো বিধিবদ্ধতার চেয়ে কোনো কিছুর নিষ্পত্তিতে খলিফার মতামত শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতো। তবে এমন কোনো উদাহরণ পওয়া যায় না যে, খলিফার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো আইন কার্যকরী করা হয়েছে। হযরত আবুবকর (রা) প্রাণীর উপর যাকাত নির্দিষ্ট করে দেন। খলিফা (রা) আদেশ জারী করেন যে, কোনো মুসলমান খারাজ জমি দখল করতে পারবে না এবং এক বসায় বা একই সময় কোনো স্ত্রীলোককে তিনবার তালাক দিলে তা একবার ধরা হবে, মুতা বিবাহ এখন হতে চলবে না। ঘোড়ার উপর যাকাত দিতে হবে। প্রচলিত রীতি অনুসারে নূতনভাবে দখলকৃত ভূমি থেকে খারাজ আদায় করতে হবে। শ্রেণী হিসেবে জিজিয়া আদায় করতে হবে। খুমস দেয়ার পরিবর্তে বনী হাসিমদেরকে বেশী পরিমাণ বৃত্তি দিতে হবে। কিন্তু

www.pathagar.com

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের সময় তিনি এ রীতিনীতি ও আদেশের অনেক আদেশ ও নির্দেশকে বাতিল করে দেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জারীকৃত তালাকে বাইনও বাতিল করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। খলিফা আল মুতাদিদ মৃত্যুর পূর্বে উইল ও উত্তরাধিকার আইন সংস্কার করেন। এ রকম একটা উদাহরণই নয়, বহু উদাহরণ আছে যা খলিফার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিধিবদ্ধ আইন কার্যকরী হতো না। খলিফা কেবলমাত্র আইনদাতাই ছিলেন না বরং প্রধান নির্বাহী ছিলেন। অপরপক্ষে খলিফার কর্তব্য ছিলো আইনের শাসন কায়েম হয়েছে কিনা তা পুরোপুরিভাবে লক্ষ্য রাখা, আইনের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা যে দেশে আইনের শাসন কায়েম করাই ছিলো এর মূল উদ্দেশ্য। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে অনেক ব্যবস্থাপক ও সংস্থাপক নিয়োগ করা হতো এবং তাদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে অযোগ্য কর্মচারীদেরকে বরখাস্ত করার দায়িত্ব খলিফা বা তার উজীরের উপর ন্যস্ত ছিলো। এভাবে তিনি রাজ কর্মচারী এবং সৈন্য বিভাগের লোকদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করতেন। খলিফাগণ যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। সাম্রাজ্যের সকলের অর্থের ভার তার অধীনে ছিলো। তিনি রাষ্ট্রের কোনো অংশকে ছেড়ে দিয়ে তার জন্য অর্থ গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি নিজে সকল বৈদেশিক সম্বন্ধ স্থাপন করতেন। বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে তিনি নিজেই সকল দূতদেরকে পরামর্শ দিতেন এবং সকল দূত তাঁর আদেশ মতো কাজ করতেন। তাঁর নির্দেশে সকল কিছু হতো। আব্বাসীয় যুগে খলিফাদের উজীরগণ সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন। তারাই খলিফার রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহী এবং ব্যবস্থাপনায় কাজ সমাধা করতেন। সে সময় খলিফাগণ রাষ্ট্রীয় কাজ উজীরদের উপর ছেড়ে দিয়ে এক রকম নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করতেন।

"খলিফা আল মাহদী এবং হাদীর সময় এবং হারুন আল রশিদের রাজত্বের অধিকাংশ সময় উজীরগণই বাস্তবিকপক্ষে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সকল আদেশ দিতেন এবং তাদেরই নির্দেশ পালিত হতো, কারণ উজীরগণ ছিলেন খলিফার একমাত্র বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী।"

আল আমিনের অধীনে আল ফজল ইবনে আর রাব্বী এবং মামুনের শাসনকালের প্রথমদিকে আল রাজী ইবনে সালেহ Defecta (ডিফেকটা) শাসনকর্তা হিসাবে ইতিহাসে পরিচিত ছিলেন।

মামুন কর্তৃক বাগদাদের ক্ষমতা লাভের পর তিনি নিজে সকল ক্ষমতার অধিশ্বর হলেন এবং পরে তাঁর দুই উত্তরাধিকার তার পথ অনুসরন করেন। তাদের পর প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা খলিফাদের উজীরদের হস্তে চলে যায়। খলিফা ছিলেন ন্যায় বিচারের ক্ষেত্র। তিনি রাষ্ট্রে নিজে প্রধান বিচারকের কাজ

www.pathagar.com

করতেন। প্রাদেশিক কাজীগণ সরাসরি খলিফা কর্তৃক নিয়োজিত হতো বা তার আদেশে প্রাদেশিক গভর্নরগণ কাজীদেরকে নিয়োগ করতেন। অনেক সময় প্রয়োজনে কাজীগণ আইনের ব্যাখ্যা চেয়ে খলিফার কাছে পত্র লিখতেন। ওমর বিন আবদুল আজিজের সময় মিশরের কাজী ইয়াদ ইবনে উবায়দুল্লাহ কোনো এক প্রতিবেশী ও অংশীদারের মধ্যে প্রিআমশনের মীমাংসার ব্যাপারে লিখিতভাবে খলিফার কাছ থেকে সঠিক অধিকারী সম্বন্ধে উপদেশ এবং নির্দেশ চান। তার উত্তরে ওমর রায় প্রদান করলেন যে, প্রতিবেশীর চেয়ে অংশীদারের দাবী অগ্রগণ্য।

হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর পরবর্তী মহান উত্তরাধিকারীগণ রাষ্ট্রের সকল অংশের লোকদের আপীল শুনতেন এবং প্রত্যেকের দোষ ত্রুটি জেনে নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে বিচার কার্য সমাধা করতেন। হযরত আলী (রা)-এর হত্যা এবং মুয়াবিয়াহ্কে হত্যার ষড়যন্ত্র হওয়ার পর খলিফাগণ জনসমক্ষে খুব একটা বের হতেন না। কিন্তু সকল উমাইয়া শাসকগণ প্রায় জনসাধারণের অর্থাৎ বিচার প্রার্থীদের নালিশ ও আপিল শুনতেন এবং প্রত্যেকের দোষ ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরুপণ করে রায় প্রদান করতেন। খলিফা আবদুল মালিকই যিনি জনগণের দাবী দাওয়া শুনা এবং তাদের বিচারের জন্য একটা দিনকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ ও তাঁর উত্তরাধিকারের পথ অবলম্বন করেন। আব্বাসীয় খলিফাগণও এ প্রথা চালু রাখেন। খলিফা আল মামুন সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করার জন্য রবিবারকে নির্দিষ্ট করে নেন। প্রত্যেক খলিফাগণ জনগণের দুর্দশা লাঘবকল্পে জনগণের কথা শ্রবণ করতেন এবং আইনানুসারে উহার সমাধান করতেন।

❐

www.pathagar.com

উজীর (মন্ত্রী)

মানব সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উজীরাত বা মন্ত্রী পরিষদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উজীরাত একটি প্রাচীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আদিকাল হতে এর প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড প্রচলিত ছিলো। যেহেতু একজন রাজা বা মহারাজা এককভাবে একটি রাজ্যের ভার বহন করতে পারে না, রাজ্য পরিচালনার জন্য সভাসদ প্রয়োজন, সেহেতু সার্বভৌম রাজ্য বা রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মন্ত্রীবর্গকে নিয়ে একটি মন্ত্রীসভা বা উজীরাত ঠিক হতো। প্রত্যেক উজীরকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হতো যা বর্তমানে একটা সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক আকারে রূপ নিয়েছে। কাউটিলিয়া নামক একজন ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বলেন, "সার্বভৌমত্ব কেবল সহযোগিতার দ্বারা সম্ভব। একটি চাকা যেমন নিজে ঘুরতে পারে না তেমন কোনো রাজাকেও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মন্ত্রী পরিষদ প্রয়োজন। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাদের মতামত অত্যাবশক।" ইসলামী চিন্তাবিদ আল ফকরীহ, আল মাওয়ার্দী, নিজামুল মুলক তুসী এবং অন্যান্য চিন্তাবিদগণ রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার এবং রাষ্ট্র প্রধানকে সহায়তা প্রদান করার জন্য মন্ত্রী পরিষদের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সাধারণভাবে তাই দেখা যায় যে, মানব সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য দেশে এবং আরব দেশেও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মন্ত্রী পরিষদ বা উজীরাত ছিলো।

মন্ত্রীত্ব বা উজীরাতের মূল কথা

আল উজীরাত এর মূল চিন্তা করলে দুইটি মতামত পাওয়া যায়। ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামে দেখা যায় যে, ফ্রানজ বাবিনজার মত প্রকাশ করেছেন যে, "উজীর এবং উজীরাত উভয় শব্দই সাসানিয়ান রাজত্ব কালের প্রচলিত প্রথা থেকে নেয়া হয়েছে।" আরথার ক্রীশটেনসেন এবং ফিলিপ কে হিট্রি ঐ মতের সঙ্গে একমত। হেরেল্ড বোয়েন এর মতে, "উজীর পারসিয়ান থেকে এসেছে এবং আব্বাসীয় খলিফাগণ উহার প্রচলন করেন। তবে তাদের কর্মকাণ্ড ও বিচার বিভাগের কার্যাবলী যথাসম্ভব সাসানিয়ানদের প্রচলিত রীতিনীতির উপর নির্ভর করে প্রণয়ন করা হয়েছে বলে ধরা হয়।"

www.pathagar.com

এ থিউরী বাস্তবিক একটা চলমান বাস্তবতা। ঘটনা প্রবাহে দেখা যায় যে, অনেক ইরানী এবং প্রসিদ্ধ বার্মেকিয়গণ আব্বাসীয় খলিফাদের শাসন আমলে মন্ত্রীত্ব নিয়েছিলেন। তবে সাসানাইড শাসকদের ধ্যান ধারণা মুসলমান লেখকদের প্রভাবান্বিত করেছিলো। আব্বাসীয় শাসনকালে ইরানী বংশদ্ভূদ লোক ছাড়া বিভিন্ন বংশের ও বিভিন্ন দেশের লোকজন মন্ত্রী পরিষদে ছিলেন। বার্মেকিয়রাই কেবল প্রথম উজীর ছিলেন না। তাদের পূর্বপুরুষগণ বৌদ্ধ ধর্মের ছিলেন তবে যোরাষ্টিয়ান ছিলেন না বিধায় তারা কখনও মৌলবাদী সাসানাইড যোরাষ্টিয়ান প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। মুসলমান লেখকদের মতে উজীরগণ হুবহু অথবা প্রকৃতভাবে সাসানিয়ানদের মতো ছিলেন। বলা যায় যে, "প্রাক ইসলামী রাজত্বে এমন কি বাইজেনটাইন, রোমান, ইণ্ডিয়ান, এবং চীন সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজা বা সম্রাটকে সাহায্য করতেন। এটা সত্য যে সাসানাইড রাজা খসরু আনুসিরভানেরা শাসনামলে বুজুরগ মিহের নামক একজন মুসলিম উজীর ছিলেন। তবে টমাস নোয়েল ডেক-এর মতে বুজুরগ মিহেরের কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা পাওয়া যায় না। ডবলিউ ব্যার্থ হোল্ডোর মতে এটা কোনো ঐতিহাসিক বুজুরগ মিহেরের ব্যাপারে নয় যিনি আব্বাসীয় শাসনামলকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন, তবে এটা একটা বহুল প্রচলিত উপাখ্যানের মতো যা বার্মিকী উজীরদের প্রোপোটাই পদের মতো ছিলো।

উজীর শব্দের মূল

অনেক চিন্তাবিদ ও জ্ঞানীদের মতে উজীর (WAZIR) শব্দটি পাহলভী "ভিসির" (VICIR) থেকে এসেছে। অন্যরা মনে করেন যে, উক্ত শব্দটি GEZIRPAT শব্দ থেকে এসেছে। চিকাগার অধ্যাপক এসপ্রিংলিং-এর মতে "VICIR" হলো লিগাল ডকুমেন্টস অথবা সিদ্ধান্ত, কিন্তু উহা কোনো কর্মকর্তা, শ্রেণী অথবা মানুষকে বুঝায় না। তবে তালমুদদের বেবিলিয়ন ইহুদীরা তাদের গ্রাম্য নিম্ন বর্ণের লোকদেরকে GEZIRPAT বলে আখ্যায়িত করতো। শব্দের তাত্ত্বিক অর্থ দ্বারা বিবেচনা করা সম্ভব নয়, তবে উজীর শব্দ যে পারসিয়ান শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়নি তা স্বীকার করা যায়।

মুসলিম চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে উজীর শব্দটি আরবী থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং এটা মূলত আরবী। ডাচ ভাষা তত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক মিঃ দা গোয়েজী মনে করেন যে, উজীর শব্দটির মূল শব্দ আরবী এবং আরবী থেকে এসেছে। প্যালেষ্টাইনে এস, ডির গুয়েতিনও বলেন উজীর শব্দের মূল আরবী। উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আল মাওয়ার্দী বলেন ঃ

www.pathagar.com

প্রথমতঃ ইহা নিশ্চয়ই আল উজীর থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ বোঝা। কারণ একজন উজীরকে রাষ্ট্রের বোঝা ও দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহা আল উজীর থেকে এসেছে কারণ এর অর্থ ছায়া দেয়া। সেজন্য উক্ত ব্যক্তিকে উজীর বলা হয়, কারণ একজন শাসককে একজন উজীরের পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। তৃতীয়তঃ ইহা "আজব" শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। কারণ "আজব" শব্দের অর্থ পৃষ্ঠপোষকতা। একজন উজীর একজন শাসককে সর্বদা পিছন থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় একজন শাসক একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্র প্রধান হতে পারে। আরবী ভাষায় আল উজীর শব্দের অর্থ সাহায্যকারী বলা হয়েছে। পবিত্র আল কুরআনেও সাহায্যকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং দুই জায়গায় হারুনকে মূসা (আ)-এর সাহায্যকারী হিসাবে বলা হয়েছে। এই শব্দটিকে সচরাচর হাছান বিন তাবিত, কা'আব বিন মালিক, আবসাস বিন মির্জা এবং অন্যদের কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে। এ সম্পর্কে উমাইয়া খলিফাদের সময় এক মহিলা কবি যায়িদ বিন আবিহিকে উমাইয়াহ এর উজীর হিসাবে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"লাহ মান শারামাতাহ উয়াজীর অর্থাৎ মুয়াবিয়ার সাহায্যকারী হিসাবে (মন্ত্রী) সকল মানুষের মধ্যে উজীর জঘন্যতম ছিলো।"

কবি হারিছ বিন বদরও যায়িদকে মুয়াবিয়ার উজীর হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

উজীরাতের প্রাথমিক ইতিহাস

ইসলামের প্রথম দিকে এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পরবর্তীকালে চার খলিফা এবং উমাইয়াদের রাজত্বকালেও কোনো মন্ত্রী সভা ছিলো না। তবে আব্বাসীয় খলিফাদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হয় এবং রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। আস সাফ্ফাহ-এর আমলে আবু সালমাহ আল খাললাল প্রথম উজীর নিযুক্ত হন এবং তিনিই কুফাতে আব্বাসীয়দের মুখ্য প্রচারক হিসাবে কাজ করেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবারের উজীর ছিলেন বলেও সকলের কাছে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেজন্য পরবর্তীকালে হযরত আলী (রা)-এর সমর্থক বলে চিহ্নিত করে তাকে ফাঁসিতে হত্যা করা হয়। তারপর সাফফাহ আবু সামহকে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। অনেকের মতে তিনি খালিদ ইবনে বার্মাককে মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন বলেও জানা যায়। খালেদ একজন ইরানী ছিলেন এবং আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে

www.pathagar.com

তিনি সকল প্রকার সহায়তা করেন। যদিও খালিদ বিন বার্মাক মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতেন তবে তাকে মন্ত্রী বলা হতো না, কারণ ভয় ছিলো হয়তো তাকেও আবু সালমাহ-এর মতো ভাগ্য বরণ করতে হয়।

খলিফা আস সাফফাহ ও আল মনসুরের সময় মন্ত্রীগণ খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন, কারণ তারা সকল সময় খলিফাদের কড়া নজরে থাকতেন। তবে আল মাহদী ও আল হাদীর আমলে এবং খলিফা হারুন অর রশীদের সময় উজীরগণ মূলতঃ সর্ব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং উজীরদের কথায় রাষ্ট্র পরিচালনা হতো। তারা এতো ক্ষমতাবান ছিলেন যে, একমাত্র খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী ব্যাতিরেকে তারা প্রয়োজনে যে কোনো কর্মকর্তা নিযুক্ত করতে পারতেন এবং বরখাস্তও করতে পারতেন। উজীরগণ প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন এবং নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হলে সে সকল মামলা শুনে বিচক্ষণতার সঙ্গে রায় দিতেন। যাদের উপর খলিফাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকতো তাদের উপর বেশী করে ক্ষমতা দেয়া হতো এবং সেজন্য তারা মূলতঃ রাষ্ট্রীয় আর্থিক সুযোগ সুবিধা ও সুখ ভোগ করতেন। তবে আব্বাসীয় আমলে যারাই মন্ত্রী ছিলেন তারা অনেকেই আব্বাসীয় খলিফাদের রাজনৈতিক শিক্ষক ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া খলিফা আল মাহদীর রাজনৈতিক শিক্ষক ছিলেন এবং পরে মন্ত্রীও ছিলেন। ইব্রাহীম ইবনে দাকওয়ান আল হারানী বা খুসাহ বিন মূসা আল হাদীর গৃহশিক্ষক ছিলেন। আল মাহদীর খেলাফত লাভের পর তিনি মাহদীর মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। খালিদ বিন বার্মাক হারুন অর রশিদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। আল ফাদিল বিন ইয়াহিয়ার পর আল আমিন তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মামুনের গৃহশিক্ষক জাফর বার্মাককে খলিফা হারুন অর রশীদের সময় হত্যা করা হয়। পরবর্তীকালে মামুন খলিফা হলে তার রাজনৈতিক গৃহশিক্ষক ফাদিল বিন সাহাল মামুনের উজীর হন। খলিফা আল মাহদীর সংস্কৃতি, এবং কারু শিল্পের ভক্ত ছিলেন বিধায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তার উজীর ইয়াকুব বিন দাউদের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ ইয়াকুব সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং সেই পরবর্তীতে খলিফার সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেন এবং শেষ পর্যন্ত কঠিন শাস্তির মধ্যে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে অন্ধ কবি বাসার বিন বুরদ বলেন প্রকৃত খলিফা ছিলেন ইয়াকুব বিন দাউদ যাকে কেবল মদ, মেয়েলোক ও গান-বাজনার মধ্যে পাওয়া যেতো।

খলিফা হারুন অর রশীদ হয়তো ইয়াহইয়া বিন বার্মাক সম্পর্কে বলেছেন, "আমি আপনার উপর আমার সকল প্রজার দায়-দায়িত্ব প্রদান করলাম।

www.pathagar.com

আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবে তাদেরকে পরিচালনা করতে পারেন এবং আপনার সন্তুষ্টি মতো অর্থ খরচ করতে পারেন। তবে রাষ্ট্রীয় কাজের জন্য আমি কোনো প্রকার আপনার সঙ্গে দায়ী হবো না। আপনার কাজের জন্য কেবল আপনি দায়ী হবেন। এর কিছু দিন পরে সরকারী সকল দপ্তর ও বিভাগ দেখা শুনার জন্য ইয়াহিয়ার উপর ন্যস্ত করা হয়। এবং খেলাফতের কার্য পরিচালনার জন্য খলিফার সীল মহরও তাকে প্রদান করা হয়েছিলো।"

সরকারীভাবে খলিফা হারুন অর রশীদ জাফরকে ভ্রাতা হিসাবে সম্বোধন করতেন এবং তার বিশ্বস্ততার প্রতিক হিসাবে খেলাফতের সকল রাজকীয় টাকশালের ভার তার উপর অর্পণ করেন এবং খলিফার নামের সাথে রাজকীয় কার্যে তার নাম অংকিত করার নির্দেশ দেন। ১৭৭-১৮৬ হিঃ সালের মধ্যে মুদ্রার প্রচলন করা হয়েছিলো। জিরযান, কিরমান, রায়ই বাগদাদ এবং রাফিকা থেকে পরবর্তীকালে যে সকল মুদ্রার আবিষ্কার হয় তাতে খলিফার নামের সঙ্গে জাফর এর নাম অংকিত ছিলো। এ সকলও জাফরকে নিদারুণ ও কঠিন মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারেনি। বরং মৃত্যুর পথকে প্রশস্থ করে দিয়েছিলো।

তবে বার্মকীয়দের পতনের পর উজীরের ক্ষমতাকে অনেকের মধ্যে বিভক্ত করে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যদিও জাফরের পর আল ফজল ইবনে রাব্বি উজীর হন কিন্তু রাজকীয় এষ্টেটের জমির খাজনা, সরকারী বা বেসরকারী এবং গোপনীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় ব্যাপার ইসমাঈল ইবনে সুবাইয়াহ এর উপর ন্যস্ত ছিলো।

খলিফা মামুনের রাজত্বকালে পুনরায় আবুল ফজল বিন সাহল খুব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন কারণ ফজল বিন সাহল তার গৃহশিক্ষক ছিলেন এবং তারই পরামর্শে খেলাফত পরিচালনা করতেন। অপরপক্ষে মামুনের সান্নিধ্যে এসেই ফজল বিন সাহল ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হন। যেহেতু মামুন ফজল বিন সাহল-এর দক্ষতা, ক্ষমতা ও সহযোগিতার কারণে খেলাফত লাভ করেছিলেন সেহেতু কৃতজ্ঞতা বশতঃ খলিফা মামুন তাকে একাধারে উজীর ও সামরিক কর্তৃত্ব দান করেন (রিয়াসাত আল হারব ওয়া রিয়াসাত আত তাদবীর) এবং "দুর রিয়াসাতাইন" খেতাবে ভূষিত করেন, কারণ তিনি দ্বৈত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মামুনের ক্রাউন প্রিন্স ও খলিফা থাকাকালীন সময় যে কোনো সরকারী সভায়ও ফজল বিন সাহলের মর্যাদা সমুন্নত রাখা হতো। খলিফা আল মামুনের খেলাফত কালে স্বর্ণ মুদ্রায়ও ফজলের নাম অংকিত ছিলো।

কিন্তু একদা খলিফা মামুন যখন তার উজীরের ক্ষমতা অপব্যবহারের ঘটনা উপলব্ধি করতে পারলেন তখনই তিনি খেলাফতের সকল দায়িত্ব

www.pathagar.com

নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। ফজল বিন সাহলের অদূরদর্শিতার জন্য ঠিক তাকেও জাফরের মতো ভাগ্য বরণ করতে হয়। প্রানদণ্ড প্রাপ্ত উজীর ফজল বিন সাহলের পর তার ভ্রাতা আল হাসাব খলিফা মামুনের অধীনে কিছু ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে উজীর পদে নিযুক্ত হন। বিশ্বস্ততা রক্ষার্থে খলিফা মামুন উজীর হাসানের কন্যা বুরানকে বিবাহ করেন। যদিও খলিফা মামুনের উত্তরাধীকারীগণ উজীরদের উপর খুব একটা ক্ষমতা ছেড়ে দেন নাই তবে তাদের শেষ শাসকগণ ডিফেকটা শাসক হিসাবে ছিলেন। কিন্তু সকল ক্ষমতা প্রধান উজীরের উপর ন্যস্ত ছিলো।

খেলাফত কালে উজীরগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার অধিকী ছিলেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কিছু সংখ্যক উজীরের মধ্যে জাফর বার্মাক এবং আল ফজল বিন সাহল অসাধারণ ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে খলিফার নামে তারাই খেলাফতের কাজ পরিচালনা করতেন এবং স্বর্ণ মুদ্রায় খলিফার নামের সঙ্গে তাদের নাম অংকিত করেছিলেন। এ সকল কারণে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্যই মর্মান্তিক পরিণতি ভোগ করতে হয়। এসব কারণের জন্যই প্রধান উজীরের ক্ষমতা দুই বা ততোধিক উজীরের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে প্রধান উজীরে আলার ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় খলিফাগণ তাদের তুর্কী উজীরদের হাতের পুতুলের মতো থাকতেন কারণ উজীরগণ ছিলেন সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। উজীরগণের ইচ্ছার উপর কোনো খলিফার মনোনয়ন ও খেলাফত কাল নির্ভর করতো।

উজীরের যোগ্যতা

সে যুগে উজীর হওয়া ও উজীরের ক্ষমতা রক্ষা করা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। একজন উজীরকে একদিকে সৈরাচারী শাসকের মন রক্ষা করে চলতে হতো অপরপক্ষে দোদুল্যমান প্রজার মনও রক্ষা করতে হতো। এ সকল কাজে কোনো রকম বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতা হারালে তাকে চাকুরী হারানো সহ সকল সম্পত্তি হারাতে হতো, এমনকি ফাঁসিতে প্রাণ দিতে হতো। আব্বাসীয় যুগে সকল ক্ষমতাচ্যুত উজীরগণ প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হতেন। তাই উজীরদেরকে সর্বদা সতর্কতার সংগে শাসন কার্য পরিচালনা করতে হতো। কারণ অনেক সময়ই দেখা গেছে সভাসদগণ উজীরদের প্রতি ঈর্ষা বশতঃ শাসকদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলতো। সেজন্য উজীরকে সকল সময় প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হতো এবং বিচক্ষণতার সংগে শাসকের মনস্তুষ্টি সহকারে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে শাসন কার্য পরিচালনা করতে হতো। শাসকগণ উজীরের

www.pathagar.com

কাছ হতে এটাই প্রত্যাশা করতো। এসব কারণের জন্য উজীরকে দাবা ও পলো খেলায় পারদর্শী হতে হতো। গীটার ও যন্ত্র সংগীতেও পারদর্শী হতে হতো। অপরপক্ষে গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, কাব্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, কবিতা আবৃতি ও গল্প বলায় পারদর্শী হতে হতো। এসব কারণে দেখা যায় যে, খেলাফত যুগের উজীরদের আচার ব্যবহার ও শাসনকার্য পরিচালনার ধারা সম্বলিত পুস্তকাদী খুবই উন্নতমানের যার দরুন প্রাচ্য সাহিত্য কর্ম সমৃদ্ধি লাভ করেছিলো।

ইসলামী চিন্তাবিদ আল মাওয়ার্দী বলেন ঃ

"যদিও ধর্মীয় অনুশাসনে উজিরের যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো কিছু বলা নেই তবে পার্থিব প্রয়োজনে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষের মংগল ও জাতির উন্নতি কল্পে ঐ সকল যোগ্যতা ও গুণাবলী অত্যাবশ্যক।"

একজন আদর্শবান উজীরের গুণাবলী সম্বন্ধে খলিফা আল মামুন বলেন, "আমার রাষ্ট্রীয় শাসন পরিচালনার জন্য এমন একজন মানুষ চাই যার মধ্যে অনেক গুণাবলীর সমন্বয় থাকা উচিত। তাকে সৎচরিত্রবান, ধর্মশীল, আচার আচারণে সংগত ও দৃঢ়চেতা, মার্জিত ও সভ্য সংস্কৃতিমনা, অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার রক্ষক, ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার, সততা ও মানমর্যাদা সম্পন্ন, নিষ্ঠাবান, কথা বলায় পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিচায়ক, ভাগ্যে আস্থাবান, সামান্য বা ছিড়া বস্ত্রে সন্তুষ্ট, সামরিক নৈপুণ্যতা, দার্শনিকদের ধৈর্য চিন্তাবিদদের সহনশীলতা, আইনজ্ঞ, ভালোর জন্য কৃতজ্ঞতা এবং কোনো খারাপের জন্য ধৈর্যধারণ করা, বর্তমানে ভালো কাজে সন্তুষ্ট এবং আগামী কালের জন্য অসন্তুষ্ট না হওয়া, কথার দ্বারা মানুষের অন্তরে দুঃখ না দেয়া, কথায় পরিমার্জিত ভাষা ব্যবহার করা এবং নিজের ষ্টাইল দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত না করা।"

আল ওয়াজীরাত দুই প্রকার

ইসলামী চিন্তাবিদ আল মাওয়ার্দী ও অন্যান্য চিন্তাবিদদের মতে আল ওয়াজীরাত দুই প্রকার—এক প্রকার তাফইদ অর্থাৎ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, অন্য প্রকার তানফীদ অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী। তাফইদ সম্বন্ধে আল মাওয়ার্দী বলেন ঃ

"ইমাম একজন উজীর নিযুক্ত করেন যিনি তার নিজ বিবেচনা ও বুদ্ধিমতা দ্বারা রাষ্ট্রের সকল প্রকার কাজ পরিচালনা করেন। এটা কোনো নিষিদ্ধ ওয়াজীরাত নয়। কোনো ইমামকে রাষ্ট্রের সকল কাজ এককভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয় সেহেতু উজীররাও সহকর্মীদের সাহায্য গ্রহণ

www.pathagar.com

করে থাকতেন। সুষ্ঠু প্রাশাসনের জন্য খলিফা বা ইমামের সংগে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্যই উজীর নিযুক্ত করা হতো। ইমাম বা খলিফা সকল সহকারী উপ-সহকারীদের কাজ তদারকী করে থাকেন বলে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ভুল ভ্রান্তি অনেক কম হতো এবং কোনো ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হতো না। ওয়াজীরাতই তাওফিদ নীতি নির্ধারণ করতেন এবং সে অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকতেন। এ কারণে উজীরকে আইনজ্ঞ ও চিন্তাবিদ হতে হতো। উজীরকে যুদ্ধের সময় অমিতব্যয়ী এবং খাজনা ও ট্যাক্স সংগ্রহে পরিপক্ক, তিক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিরচয় দিতে হতো। সকল ব্যাপারে উজীরকে অভিজ্ঞ হতে হতো।"

আইনজ্ঞদের মতে "উজীরে তাওফিদ কেবল তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তিনি খলিফা বা ইমামের মতো নিজ দায়িত্বে মামলার নিষ্পত্তি এবং বিচারক নিয়োগ করতে পারেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্থদের বা আল মাজালিমদের বিরোধ নিষ্পত্তি অথবা উক্ত কাজ সমাধা করার জন্য সহকারী নিয়োগ করতে পারেন। তিনি নিজে কোনো অভিযান পরিচালনা করতে অথবা উক্ত কাজে কোনো সহকারী নিয়োগ করতেও পারেন। তিনি নিজে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনা করতে অথবা উক্ত কাজ কোনো সহকারীর মাধ্যমে করতে পারেন। তবে তিনটি জিনিস বাদে একজন উজীর ইমামের মতো অন্যসব কার্যাদী করতে পারেন। তিনি ইমামের উত্তরাধীকার নিয়োগ করতে পারেন না। কোনো নাগরিক ইমাম হওয়ার ব্যাপারে কেবল ইমাম তার নাগরিক অধিকার খর্ব করতে পারেন। উজীর কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল লোককে একজন ইমাম চাকুরীচ্যুত করতে পারেন কিন্তু উজীর তার বিপরীত কোনো কাজ করতে পারেন না। এ তিনটি কাজ ছাড়া একজন উজীরে তাফাইদ তার উপর অর্পিত অন্য সকল কাজ তার নিজ ইচ্ছা মাফিক করতে পারেন।"

উজীরে তাফাইদ যদি কোনো সময় কোনো প্রশাসনিক নির্দেশ জারী করেন অথবা কোনো সম্পত্তির বিরোধ সম্পর্কীয় ব্যাপারে রায় প্রদান করেন আর তাতে খলিফা বা ইমাম যদি মনে করেন যে, ঐ সকল নির্দেশ ও রায়ে ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে তবে তিনি পুনঃ নির্দেশ ও রায় ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু উজীর এ ব্যাপারে পুনঃ কোনো নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না বা পূর্বোক্ত নির্দেশ বা সিদ্ধান্তকে বাতিল ঘোষণা করতে পারেন না। অপরদিকে উজীর যদি কোনো গভর্নরকে নিয়োগ বা যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন খলিফা বা ইমাম নিজ ক্ষমতা বলে ঐ সকল নিয়োগ ও সিদ্ধান্তকে বাতিল ঘোষণা করতে পারেন।

www.pathagar.com

উজীরে তাফাইদ অনেক কম ক্ষমতার অধিকারী। সেজন্য তাদের অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় কাজে খলিফা বা ইমামের মতামতের উপর নির্ভর করতে হতো। এ সকল উজীরগণ একদিকে খলিফা বা ইমাম অন্যদিকে জনসাধারণ ও গর্ভনরের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করতো। উজীর কেবল খলিফা বা ইমামের পক্ষে খলিফা বা ইমামের আদেশ ও নির্দেশকে কার্যকর করতো। কোনো গভর্নর নিয়োগ করতে হলে বা যুদ্ধে যেতে হলে পূর্বেই তা খলিফা বা ইমামকে গোচরীভূত করতে হতো। গভর্নরের কার্যক্রমও ইমামকে জানানো হতো। খলিফা বা ইমাম যদি ঐ সকল ব্যাপারে তার সংগে পরামর্শ করতেন তবেই সে উজীর হিসাবে গণ্য হতো। আর যদি এ সকল ব্যাপারে তার সংগে পরামর্শ বা আলোচনা করা না হতো তবে উজীরকে কেবল খলিফা বা ইমামের একজন এজেন্ট বা সচিব হিসাবে গণ্য করা হতো।

এ রকম একজন উজীরকে সাতটা গুণের অধিকারী হতে হতো। উজীরকে একজন বিশ্বাসী ও বিশ্বাস ভাজন, সত্যবাদী, লোভহীন, শত্রুতা বিজীত, পুরুষ, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এবং অস্ত্রহীন হতে হয়। তাকে স্বাধীন মানুষ বা একজন বিদ্যান না হলেও হয়। একজন জিম্মিও উজীর হতে পারে তবে সে কখনো উজীরে তাফাইদ হতে পারে না। উজীরে তাফাইদকে চারটি বিষয়ে অনুমতি প্রদান করা হয় কিন্তু উক্ত বিষয়ে উজীরে তানফিদকে অনুমতি দেয়া হয় না। উজীরে তাফাইদ মামলার রায় প্রদান করতে পারেন, গভর্নর নিযুক্ত করতে পারেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন, সরকারী কোষাগার থেকে পরিমিত অর্থ নিতে পারেন কিন্তু উজীরে তানফিদ ঐ সকল কর্ম করতে পারেন না। সুতরাং উজীরে তানফিদকে স্বাধীন লোক, মুসলিম জ্ঞানী বা মুসলিম আইনে অভিজ্ঞ না হলেও বা যুদ্ধের কেবল কৌশল বা খারাজ নেয়ার নীতি ও পদ্ধতি না জানালেও চলে। কিন্তু ওয়াজীরাতে তাফাইদকে উক্ত চারটি গুণের অধিকারী হতে হয়।

খাজনা ও ট্যাক্স আদায়ের জন্য উজীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করে থাকেন কিন্তু তিনি সকলের উপর কাজের পূর্ণ তদারক সহ সকল ব্যয়ের হিসাব ও তদারকী করেন। তার সহকারীগণ বিভিন্ন বিভাগ হতে প্রাপ্ত সকল খরচের বিবরণ পরীক্ষা করেন এবং তারই অফিস হতে খরচের বিবরণের সঠিকতা যাচাইয়ের পর অনুমোদন করা হয়। সিভিল ও মিলিটারী বিভাগের খরচের জন্য উজীরের অনুমোদন ছাড়া পাশ করা হয় না। একজন উজীর একজন গভর্নর নিয়োগ করতে পারেন এবং তাকে চাকুরীচ্যুতও করতে পারেন কিন্তু খলিফা কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত গভর্নর বা কোনো কর্মকর্তাকে উজীর বরখাস্ত করতে পারেন না। উজীরের দপ্তর হতে জ্ঞানী ও গুণীদেরকে ভাতা

www.pathagar.com

প্রদান করা হতো এবং এ দপ্তরই "আল্ল যাকাত" বিভাগের প্রশাসনিক অধিকর্তা ছিলো। তবে এটা ছাড়াও কোনো পাবলিক দপ্তরও তার আওতার বহির্ভূত ছিলো না। তিনিই কেবল সিভিল ও মিলিটারীর ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সেজন্য গভর্নর হতে একজন সামান্য প্রজাও তার সংগে যে কোনো ব্যাপারে দেখা করে তার সমস্যার সমাধান চাইতে পারতেন।

সীমিত ক্ষমতা দিয়ে খলিফা বা ইমাম তার প্রয়োজনে অধিক সংখ্যক নিয়োগ করতে পারতেন। তবে আব্বাসীয় খেলাফত যুগে উজীরে তাফাইদ ছিলো এবং মাওয়ার্দীর মতে আরব সাম্রাজ্যে উজীরে তানফিদও ছিলো।

খেলাফত যুগে খলিফাগণ ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। খলিফাদের অধীন অনেক কেন্দ্রীয় বোর্ড ছিলো। প্রত্যেকটি বোর্ড পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিলো একজন দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তার উপর। কাতিবুদ দেওয়ান এবং সাহিবুল বাইতুলমাল খলিফার উপর অধিন্যস্ত ছিলো এবং কাতিবুদ দেওয়ান, কাতিবুর রাসাইল, সাহিবুল বায়িদ এবং সাহিবু বাইতুলমাল উমাইয়াদের অধিন্যস্ত ছিলো। মাওয়ার্দীর মতে এক একটি দপ্তর এক একজন উজীরের উপর ন্যস্ত থাকতো এবং দপ্তরের কার্য পরিচালনার জন্য উজীরগণ খলিফার সংগে পরামর্শ করতেন। এটা অতীব সত্য যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কেন্দ্রের ও খলিফাদের সংগে আলোচনা হতো তবুও সেখানে কোনো উজীরে তাফাইদ ছিলো না। কিন্তু আব্বাসীয় খলিফা মাহদীর সময় বর্তমান গণপরিষদের মতো গণপরিষদ ছিলো এবং সেখানে প্রধান মন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের দপ্তর ছিলো। পর্ষদ প্রধান খলিফা কর্তৃক নিয়োজিত হতো তবে সেখানেও কিছু ব্যতিক্রম ছিলো। উজীর জাফর ও ফজল বিন সাহলও পরবর্তী কালে আব্বাসীয় পুতুল সরকারের আমলে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলো, যে কারণে তাদেরকেও কঠিন শাস্তি পেতে হয়।

www.pathagar.com

আশ শুরা

শুরার অর্থ হলো পরামর্শ সভা। হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাগণ রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য মজলিসে শুরার মতামত গ্রহণ করতেন। খেলাফত যুগে হযরত (স)-এর প্রধান প্রধান সাহাবীদের মতামত গ্রহণ করা হতো। পবিত্র কুরআনে সূরা আশ শুরায় শুরা বা পরামর্শ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে। অন্যদিকে ঐ সূরার ৩৮ আয়াতে ভালো মুসলমানদের গুণাগুণের ব্যাখ্যা দেয়া আছে এবং বলা আছে যে, যারা নিজের মধ্যে নীতিগতভাবে পরামর্শ করে কোনো সমস্যাবলীর ফয়সালা করে তারাই ভালো মুসলমান। পবিত্র কুরআনে সূরা শুরার ৩৮ আয়াতে পরস্পর পরামর্শ গ্রহণের নীতিকে মুসলমানদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা তাদের প্রভুর আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে সৎকর্মে দান করে তারাই প্রকৃত ঈমানদার। আল কুরআনে অন্য জায়গায় বর্ণিত আছে, হে মুহাম্মাদ শাসন কার্য পরিচালনার ব্যাপারে ঐ সকল লোকের পরামর্শ নিন। তবে হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর নিজের, সরকারী ও বেসরকারী কাজে এর প্রতিফলন দেখিয়েছেন। কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তিনি পরামর্শ সভা ডেকে তাদের মতামত গ্রহণ করতেন। পরবর্তী কালে ইসলামের শাসকগণও সেই পথ অবলম্বন করেন। সে সময় সমাজে পরামর্শ সভার প্রচলন ছিলো কিন্তু বর্তমানে এর কথা চিন্তাও করা যায় না। তবে বর্তমানে বিভিন্ন দেশে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে পরামর্শ সভা ডেকে দেশের শাসন প্রনালীর ব্যাপারে আলোচনা করা হয় তাতে বেশীর ভাগ বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানীলোকের মতামতের প্রয়োজন হয় না। তাই এ পরামর্শ সভা পুরাকালের পরামর্শ সভা থেকে ভিন্নতর। ইসলমী যুগে বিভিন্ন গোত্র তাদের পরামর্শ সভা ডেকে বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোচনা করে যে নীতি নির্ধারণ করতেন সেভাবে কাজ হতো। কিন্তু বিশ্বে এর প্রচলন নেই। এখন বিজ্ঞ হোক, আর অনভিজ্ঞ হোক জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির মতামতের উপর আইন পাশ হয়ে থাকে তাতে অন্য কারো মতামত খাটে না।

কুরআন ও শুরা

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ

www.pathagar.com

وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

"বস্তুত তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম স্থায়ী তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে, যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধবিষ্ট হলে ক্ষমা করে দেয়। যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয় সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসম্পাদন করে তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।"–সূরা আশ শুরা ঃ ৩৬-৩৮

উপরোক্ত আয়াতসমূহে ইসলামী সমাজবদ্ধ সকল লোকদের সকল সমস্যা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিস্পত্তি করার জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট লোকদের মত প্রকাশের সুযোগদান ও উত্তম মত গ্রহণের নীতি অনুসরণ জরুরী করে দেয়া হয়েছে। জীবন জীবিকা আহরণ ও উৎপাদন এবং জীবন ধারা গ্রহণেও তা-ই কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। সামাজিক তথা জাতীয় আদর্শ নির্ধারণেও কর্মসূচী গ্রহণ জনগণের মত অবশ্যই জানতে হবে। উন্নয়নমূলক কার্যসূচী ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে জনমত উপেক্ষা করা চলবে না। প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচী সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালন, রাজনেতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি গ্রহণ ও নির্ধারণে জ্ঞানী ও গুণীদের মতামত গ্রহণকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে যাতে ভুলভ্রান্তি ও স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সূরা আলে ইমরানে বর্ণিত আছে ঃ

"এবং হে নবী! আপনি লোকদের (সাহাবীগণের) সাথে পরামর্শ করুন। অতপর আপনি যে সংকল্প গ্রহন করবেন, তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেই ফেলুন। মনে রাখবেন আল্লাহ নিসন্দেহে তাওয়াক্কুলকারী লোকদের পছন্দ করেন, ভালোবাসেন"।

নবী করীম (স) আল্লাহর নিকট হতে অহীপ্রাপ্ত হয়ে অহী অনুসারে কর্ম সম্পাদন করতেন। কারণ আল্লাহর বিধানের উপর কারো কোনো মত দেয়ার প্রশ্ন ওঠতো না। যখন অহী প্রাপ্ত হতেন না তখন মজলীশে শুরায় আলোচনা করে নীতিগতভাবে স্থিরকৃত মতামতকে গ্রহণ করতেন। সামান্য ব্যাপারেও পরামর্শ সভায় আলোচনা করে সকলের মতামত মেনে নিতেন।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য বদর যুদ্ধের সময় যখন আল্লাহর নিকট হতে কোনো সুস্পষ্ট বিধান বা কার্যপদ্ধতি পাননি তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামদের মতামত চান। সে অবস্থায় সাহাবীগণ পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে প্রাণ খুলে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এবং আনসারগণের মতামত যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় তিনি তাদের মতামত গ্রহণ করেন এবং সেভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

হাদীস ও শুরা

অনেক হাদীসেও শুরার কথা উল্লেখ আছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

যখন তোমাদের শাসক ও কর্মকর্তাগণ হবে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিরা, তোমাদের ধনশালী লোকেরা হবে তোমাদের মধ্যে অধিক দানশীল এবং তোমাদের সামষ্টিক ব্যাপারাদিতে পরামর্শ ব্যবস্থা কার্যকর হবে। তখন জীবনে বেঁচে থাকা মৃত্যের তুলনায় উত্তম হবে। আর বিপরীত হলে পরামর্শ দেয়া নেয়ার ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে না, তখন মৃত্যুই জীবনের তুলনায় উত্তম।

রাসূল (স) বলেছেন ঃ

(১) বুদ্ধিমান লোকের নিকট তোমরা পথনির্দেশ চাও, তার পথনির্দেশ অমান্য করো না। তাহলে তোমরা লজ্জিত-দুঃখিত হবে।

(২) পারস্পরিক পরামর্শ অপেক্ষা অধিক দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য নীতি আর কিছু হতে পারে না। আর সব কাজ গভীর চিন্তা-ভাবনার মতো বুদ্ধিমত্তাও কিছু হতে পারে না।

বুদ্ধিমত্তা বলতে কি বুঝায়, জিজ্ঞেস করা হলে নবী করীম (স) বললেন ঃ

মতামত দেয়ার যোগ্য লোকদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের কথামত কাজ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা।

রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন ঃ

(১) যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হবে, সে হবে একজন আমানতদার পরম দায়িত্বশীল। তার নিকট পরামর্শ চাওয়া হলে সে এমন পরামর্শ দেবে যা সে নিজের জন্য করতে প্রস্তুত।

(২) তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের নিকট পরামর্শ চায় তাহলে অবশ্যই পরামর্শ দিবে।

(৩) যে পরামর্শ গ্রহণ করে কাজ করলো, সে কখনোই লজ্জিত হবে না।

(৪) যে লোক তার ভাইয়ের নিকট পরামর্শ চাইলো সে যদি না বুঝেশুনে খারাপ পরামর্শ দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমানত খিয়ানত করেছে।

www.pathagar.com

(৫) পরামর্শ গ্রহণ না করে কোনো ব্যক্তিই চলতে পারে না।

(৬) যে ব্যক্তি কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলো পরে সে বিষয়ে সে পরামর্শও করলো এবং তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো সে সর্বোত্তম পন্থায় কাজ করলো।

নবী করীম (স)-এর প্রতি "পরামর্শ কর" বলে আল্লাহর নির্দেশ নাযিল হবার পর তিনি বলেছেন ঃ

মনে রাখবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল পরামর্শ করার মুখাপেক্ষী নন। তা সত্ত্বেও পরামর্শের এ বিধান আল্লাহ নাযিল করেছেন আমার উম্মতের প্রতি রহমত স্বরূপ। অতএব যে লোক পরামর্শ করবে সে সঠিক পথ কখনই হারাবে না। আর যে লোক পরামর্শ করবে না সে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবে না।

রাসূলে করীম (স)-কে দেয়া আল্লাহর নির্দেশে দুটো তত্ত্ব নিহিত আছে তন্মধ্যে একটা হচ্ছে নবী করীম (স)-কে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধান ও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রধানদের কর্তব্য হচ্ছে পরামর্শ করা, বিভিন্ন মত ও রায় শ্রবণ করা, মতের বিভিন্ন দিককে সুক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা এবং বিচার বিবেচনার পর সার্বিক দৃষ্টিতে যে মত সর্বোত্তম বিবেচিত হবে তা গ্রহণ করা। আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতা সহকারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

যে কোনো সমস্যার সমাধান কল্পে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে" একথা স্পষ্ট করে দেয় যে আসলে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও ক্ষমতা স্বয়ং রাসূল করীম (স)-এর যদিও তা পরামর্শের পর।

নবী করীম (স) বদর যুদ্ধকালে সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) তাদের নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন। শেষে হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হোন। আমরা আপনার সঙ্গেই রয়েছি। বনী ইসরাঈলরা তাদের নবীকে যেমন বলেছিলো আপনি ও আপনার রব যান ও যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই আসন গেড়ে বসলাম—আমরা তেমন কথা নিশ্চয়ই বলবো না। বরং বলবো আপনি ও আপনার রব অগ্রসর হোন আমরা আপনাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি।"

নবী করীম (স) এ মতটিকে খুবই পছন্দ করলেন এবং তিনি তার জন্য দোয়া করলেন। ওহুদ যুদ্ধকালে কুরাইশরা মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে

www.pathagar.com

জানতে পেরে তিনি সাহাবাদেরকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন এবং প্রশ্ন রাখলেন মদীনার মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করা হবে না বাহিরে গিয়ে কুরাইশদের মোকবিলা করা হবে। উভয় দিক দিয়েই মতামত প্রকাশ করা হয়েছিলো, কিন্তু যারা মদীনার বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন সেই মতই গ্রহণ করেছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধ কালেও পরামর্শ করতে গিয়ে নবী করীম (স) বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী মতের সম্মুখীন হলেন। শেষে হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর মত গ্রহণ করে মদীনা নগরের বাহিরে পরীখা খনন করলেন এবং যুদ্ধে জয়ী হলেন। কারণ এ নূতন পদ্ধতি আরবদের জানা ছিলো না।

তায়েফ যুদ্ধকালেও পরামর্শ গ্রহণের সময় একই ব্যাপার ঘটেছিলো। তায়েফ যাত্রাপথে একটা দূর্গ দেখা গেলো। নবী করীম (স) সঙ্গীদের নিয়ে তথায় অবতরণ করলেন। ইতোমধ্যে হুবার ইবনুল মুনযির (রা) উপস্থিত হয়ে বললেন, আমরা দূর্গের নিকট পৌছে গেছি। এখন আল্লাহর নির্দেশ কিছু থাকলে আমরা তাই করবো অন্যথায় এ দুর্গ আক্রমণে বিলম্ব করাই শ্রেয় মনে করি।

রাসূল করীম (স) তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন। কিন্তু হুদায়বিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত সাহাবী মক্কার কাফিরদের সাথে কোনোরূপ সন্ধি করার মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূল করীম (স) সন্ধি করলেন ও তা কার্যকর করলেন।

এসব ঘটনা থেকে পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে নবী করীম (স)-এর এ নীতিরই সন্ধান মিলে যে, নেতা পরামর্শ চাইবে সংশ্লিষ্ট লোকেরা পরামর্শ দিবে। কিন্তু যেটি অধিক সঠিক ও কল্যাণকর বলে বিবেচিত হবে সেটিই গ্রহণ করবে। অধিকাংশ লোকের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। তবে সঠিক মতামত হলে তা গ্রহণ করা হবে। কোনো একজনের মত সঠিক বলে বিবেচ্য হলে তাও গ্রহণ যোগ্য এবং গ্রহণীয়। তবে মজলিশে শুরায় আলোচনার পর কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো।

প্রজাতান্ত্রিক মনোভাব

মধ্য আরবীয় এমনকি তাদের পার্শ্ববর্তী বহু রাষ্ট্রের শাসন প্রণালী প্রজাতান্ত্রিক ছিলো। কারণ তারা রাজার দ্বারা শাসিত হতো। তবে কোনো রাজাই মক্কা-মদীনা অথবা তায়েফের উপর রাজত্ব করেনি। কোতাইবার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মক্কার বানু আসাদ গোত্রের ওসমান ইবনে

www.pathagar.com

আল হাওয়ারিত কনষ্টানটিনোপালে গিয়ে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সে সময় বাইজেনটাইন সম্রাট তাকে মক্কার রাজা বানিয়ে পাঠান এবং সেখানকার জনগণকে এ মর্মে হুশিয়ার করে দেন যে, প্রত্যেক অধিবাসী যেনো তাকে রাজা বলে স্বীকার করে নতুবা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে দেয়া হবে। বিধি-নিষেধ আরোপ করা সত্ত্বেও মক্কার লোকেরা তাদের প্রজাতান্ত্রিক ধারণা পরিহার করেননি এবং আল হাওয়ারিতকে রাজা বলে স্বীকার করেনি।

ইসলামের প্রাক্কালে মরুবাসী আরবগণ তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ শেখ দ্বারা শাসিত হতো, তবে শেখ তার গোত্রের উন্নতির ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠদের সভা ডাকতেন এবং সভায় সিদ্ধান্ত অনুসারে গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতেন। অনেক ক্ষেত্রে শেখ গোত্রীয় ইচ্ছা ও আকাংখা পূরণের জন্য নিজের মতামত অনুসারে কাজ করতেন। কোনো গোত্রের কোনো শেখ যদি মারা যেতো তবে ঐ গোত্রের সবচেয়ে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী সদস্যের উপর গোত্রীয় কর্তৃত্ব চলে যেতো। সেখানে কোনো নির্বাচন ছিলো না তবে তাদের বয়স, কাজ এবং কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে শেখ মনোনীত হতো। কোনো প্রতিনিধি ঠিক হলে প্রত্যেক সদস্য তার প্রতি আনুগত্য দেখাতেন এবং কিন্তু বিরুদ্ধতা করতে পারতেন না।

নির্বাচন পদ্ধতি

সে সময় গোত্রীয় প্রধান ঠিক করার জন্য কোনো নির্বাচন হতো না, তবে গোত্রীয় লোকজন একস্থানে বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গোত্রীয় নেতা ঠিক করতেন। এ পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর প্রশ্ন ছিলো না। সকলে একমত হয়ে যে সিদ্ধান্ত নিতেন তাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো। এ পদ্ধতিকে নির্বাচন না বলে মনোনীত বলা যায়। পুরাকালে জার্মান ও গ্রীকদের মধ্যেও এ প্রথা প্রচলিত ছিলো।

বিবাদ নিষ্পত্তি

বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ সভা গোত্রীয় বিবাদ মীমাংসা করতো। তারা সকলেই জানতেন বলে যে কোনো বিবাদের সত্যতা সহজেই উদঘাটন করতে পারতেন। গোত্রের মধ্যে কেউ কারো সংগে বিবাদ করে সত্যকে চাপা দিতে পারতো না কারণ বয়োজ্যেষ্ঠরা যে কোনো প্রকারে সকল ঘটনা অবহিত হয়ে যেতেন। বিবদমান লোকেরা সহসা সত্য ঘটনাকে চাপা দিতে পারতো না কারণ তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মুখে

www.pathagar.com

মিথ্যা কথা বলতে পারতো না। সেখানে মিথ্যা বা বানোয়াট ঘটনা সৃষ্টি করার কোনো রকম স্থান ছিলো না।

মক্কায় পরামর্শ সভা (সিনেট)

শহুরে বাসিন্দাদের জন্য ভিন্ন প্রকৃতির সরকার ছিলো। প্রত্যেকটি শহরে সিনেট ছিলো এবং সিনেট দ্বারা শাসিত হতো। সিনেটের সদস্যদেরকে মালা বলা হতো। তখন মক্কা এবং পালমিয়াতে সিনেট ছিলো। চল্লিশের উর্ধে ব্যক্তিবর্গ কেবল মক্কার সিনেটে যোগ দিতে পারতেন। কুসাইর পুত্র বিজ্ঞ বিজ্ঞানী ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত হওয়ায় এ ব্যাপারে বয়সের তারতম্য থেকে তাকে রেহাই দেয়া হয়েছিলো। পরে এ ব্যাপারে আরো উদার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিলো যেমন ত্রিশ বছর বয়সে আবু জেহেল মক্কায় সিনেটে স্থান পান। তিনি একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন বলে তাকে বয়সের উপর নির্ভর না করে জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সিনেট সদস্য হিসাবে গণ্য করা হয়।

মালাদের সভা করার জন্য কুসাই কাবা থেকে কয়েক গজ দূরে 'দারুন নাদওয়াহ' নামে একটা দরবার কক্ষ স্থাপিত করেন যা পরে কাবাঘরের সম্প্রসারনের জন্য ভেঙ্গে ফেলা হয়। সাধারণত সবসময় সিনেটের সভা হতো না। কেবলমাত্র বিশেষ কোনো কারণ হলে সিনেট বসতো। তবে দারুন নাদওয়াহতে বসে যুদ্ধ ঘোষণা বা কোনো সন্ধিপত্র খসড়া করা হতো এবং কোনো কোনো সময় বৈদেশিক অতিথিদেরকে আপ্যায়ণ করা হতো।

মালা ছিলো বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ সভা। তারা বিবদমান গোত্রের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতো। যদি কোনো দল মানতে রাজী না হতো তবে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হতো। পক্ষান্তরে সকলেই তাদের আদেশ ও উপদেশ মানতে বাধ্য ছিলো। কারণ এ সভায় সিদ্ধান্ত ছিলো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত।

পালমায়রদের সরকার

মক্কার পূর্বে পালমায়রদের শহরে একটা জনপ্রিয় সরকার ছিলো। খৃস্টীয় প্রথম দিকে পালমায়রা শহরের প্রসিদ্ধ জনসাধারণের ভালো মন্দ, পথিকদের আচার ব্যবহার, কর্তব্য এবং রাজাদের কাজ দেখাশুনা করতেন।

রোমানদের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর পালমায়রগণ রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। জারমানিকাসেবের সময় শুল্ক কর আদায় করা হতো। হাদরিয়ানা সরকারের আমলে এর পুনঃ বিন্যাস করা হয় এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে শুল্ক

www.pathagar.com

ধরা হয়। পরবর্তীকালে পালমায়রগণ রোমান কলোনী এবং ষ্টটিগায় অর্থাৎ কাউন্সিলও জনগণের সমকক্ষতা ও মর্যাদা লাভ করেন।

ওয়ার্ড কাউন্সিল

মক্কাতে কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল কমিটি থাকার পরও অনেক ওয়ার্ড কাউন্সিল ছিলো। ল্যামেসের মতে এগুলোকে মজলিস বলা হতো। তবে মদীনার তাহকিফাহ্‌র মতো কমিটি বিরাজমান। স্থানীয়ভাবে তারাই জনগণের মঙ্গলার্থে কাজ করে থাকেন।

জনসাধারণের সভা

মক্কাতে স্থায়ী সিনেট এবং গোত্রীয় সভা ছাড়াও প্রায় কোনো জটিল সমস্যা সমাধান কল্পে জনসাধারণের সভা আহবান করা হতো। এ সকল সভাকে নাদিউ কাওম বলা হতো। এ সভা শহরের জনসাধারণ নিয়ে কাবা গৃহের চত্তরে বসতো এবং তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতো।

বিভিন্ন প্রকার সাধারণ সভা

এভাবে মক্কাতে আমরা তিন রকম কাউন্সিল দেখতে পাই যেমন মালা, মজলিস এবং জনসাধারণের সভা (নাদিউ কাওম)। পালমায়ারদের কাউন্সিল মালার মতো স্থায়ী কাউন্সিল ছিলো এবং প্রয়োজনে কেবল তারাই কোনো কোনো সময় মিলিত হতো। ট্রাইবেল সমাজে বয়োস্কদের সভা প্রায় হতো। তবে যাযাবর গোত্রের দুটো কাউন্সিল ছিলো যেমন মজলিস এবং নাদিউ কাওম।

আরবদেশে এ সকল কাউন্সিলগুলো প্রায় একরকম ছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আরব দেশে একটা কেন্দ্রীয় সরকার গঠন হলো, সেখানে এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্বীকার করা হয়নি।

ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এ মজলিস কেবল স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতো এবং এর প্রতিকার করতো। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পরবর্তী খলিফাদের সময় আরবে দুটো কাউন্সিল ছিলো। একটা ছিলো হযরতের সাহাবাদের সভা অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ সভা এবং আর একটা মুসলমান জনসাধারণের সভা। তবে সাহাবীদের সভা বা শুরা খলিফা মামুনের রাজত্বকালের পূর্ব পর্যন্তও স্থায়ীভাবে বসতো না। হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর পর খলিফাদের আমলে উহার পুরোপুরি কাজ হতো। হযরত (স) এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদিন গোত্রীয় সম্মানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ

www.pathagar.com

করে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন কিন্তু পরবর্তী কালে এ কর্মধারার কিছু পরিবর্তন ঘটে। কোনো জটিল প্রশ্ন দেখা দিলে বা সমগ্র জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন উঠলে সে সময় সকল লোকের সভা ডাকা হতো। এবং এক জায়গায় সভা করে সকলের সুনির্দিষ্ট মতামত গ্রহণ করে সে অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা হতো।

শুরা এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)

পূর্বাপর স্বীকৃত সত্যের আলকে এবং আল কুরআনের পবিত্র বাক্যের নির্দেশের উপর নির্ভর করে নবজাত মুসলিম রাষ্ট্রকে রক্ষা কল্পে হযরত মুহাম্মাদ (স) সকল সময় আনছার এবং মুহাজেরদের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক জ্ঞানী ও গুণী লোকের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। প্রয়োজনে রাষ্ট্রের খাতিরে অত্যাবশ্যক বিধায় কোনো কোনো সময় মুসলমানদের সাধারণ সভাও আহবান করতেন। মুসলমানদের স্থায়ী আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রথমত মক্কাবাসী তাদের মদীনাগামী ক্যারাভ্যান রক্ষা এবং হযরত (স) ও তার অনুসারীদেরকে প্রয়োজনে আক্রমণ কল্পে প্রস্তুতি নিলে এ সকল উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য হযরত সকল মুসলমানদের এক সাধারণ সভা ডাকতেন এবং তাদের মতামত চাইতেন যে, এমতাবস্থায় তাঁরা মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে কিনা। এ সভায় অনেক প্রসিদ্ধ যোদ্ধাও উপস্থিত থাকতেন এবং তারাও এতে অংশ নিতেন। তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, মিকদাদ ইবনে আমর, সা'আদ ইবনে মুয়ায প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধের ব্যাপারেও হযরত মুহাম্মাদ (স) মদীনাবাসীদের কথায় বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং তাদের মতামতকে প্রধান্য দিতেন।

যখন মক্কাবাসীরা মদীনা আক্রমণ করলো তখন হযরত তার সংগীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং তাদের কাছে সঠিকভাবে জানতে চাইলেন যে, এ অবস্থায় মদীনা শহরে থাকা তাঁর পক্ষে ভালো হবে না মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ঠিক হবে। হযরত পূর্বের সিদ্ধান্তে থাকতে মনস্থির করলেন কিন্তু সংখ্যাগুরু দল মত প্রকাশ করলেন যে, এমতাবস্থায় মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা শ্রেয় হবে। হযরত (স)-কে বাধ্য হয়ে অধিকাংশদের মতামত গ্রহণ করতে হলো। হযরত সর্বদাই আরবদের পূর্বঐতিহ্য অনুসারে চলতে চাইতেন এবং কোনো বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে তাঁর সহকর্মী বা আসহাবদের সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণ করে পরিকল্পনানুসারে কাজে হাত দিতেন। অনেক সময় অধিকাংশের মতের ফল ভালো হতো না। তবুও সে অনুসারে কার্য করে যেতেন। ওহুদের যুদ্ধে আবদুল্লাহ বিন ওবাই তার সহচর এবং বানু সালমা এবং বানু খাজরাজদের সহ যুদ্ধের মাঠ পরিত্যাগ করলে

www.pathagar.com

হযরত (স) অন্যদের নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রয়ে গেলেন কিন্তু এ যুদ্ধে হযরত (স)-কে বেশ মূল্য দিতে হয়। তিনি নিজে আহত হন কিন্তু পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্ধ চালিয়ে যান।

এভাবে সকল বড় কাজে হযরত অধিকাংশ মুসলমানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা স্থির করতেন এবং অন্যদিকে প্রত্যেকটি কর্মের সকল ব্যাপার জানার জন্য কিছু সুনিপুণ লোকের পরামর্শও গ্রহণ করতেন। এভাবে তিনি চিরাচরিত প্রথার প্রচলন রাখেন। অন্যরাও এর বিপরীতমুখী কোনো কাজ করতো না। আরবরা সর্বদা স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং সেজন্য সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে কাজ করতেন। সকলে হযরত (স)-কে তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক নেতা হিসাবে স্বীকার করেন অন্যদিকে হযরত (স)-ও সকলের সঙ্গে আলাপ না করে কোনো কঠিন কাজে হাত দিতেন না। যে কোনো কাজের পূর্বে অধিকাংশ মুসলমানের মতামত গ্রহণ করতেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়কালীন শুরার অবস্থা

হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছিলো পরবর্তী সময় তাঁর উত্তরশুরীরা তা অনুসরণ করে চলেন। যেমন খলিফা আবুবকর (রা) হযরতের উত্তরশুরী হিসাবে তাঁর সকল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে তিনিও বয়োস্কদের কাউন্সিলের (Elders Council) বা মজলিশে শুরার মতামত গ্রহণ করতেন এবং কোনো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের অত্যাবশ্যক হলে অধিকাংশ মুসলমান জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করতেন। অধিকাংশের মতামত মতো করতেন। কোনো কোনো সময় তিনি এমনকি হযরতের ঘনিষ্ট সহচর হযরত ওমর (রা)-এর পরামর্শও গ্রহণ করতেন। তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, হযরত তাঁর অসুস্থতার পূর্বে যায়েদ বিন হারিসার নেতৃত্বে সিরিয়ায় এক অভিযান প্রেরণ করেন। এ অভিযানে হারিসাহ শাহদাত বরণ করলে তিনি বালক উসামা বিন যায়েদকে উক্ত অভিযানের অধিনায়ক করে পাঠান। সে সময় মুসলিম সৈন্যগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে উদ্ধত এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন এ অভিযান ছিলো মুসলমানদের জন্য চরম পরীক্ষা। ঠিক সে সময় হযরত মুহাম্মাদ (স) তার প্রধান সহচর হযরত ওমর ও আবুবকর (রা)-কে উক্ত অভিযানে শরীক হতে আদেশ দেন কিন্তু এর কিছু দিন পর হযরত মুহাম্মাদ (স) ইন্তেকাল করেন। এ সময় একদিকে সিরিয়ার

www.pathagar.com

লোকজন যাকাত দিতে অস্বীকার করলে এবং অন্য দিকে হযরতের উত্তরাধিকার মনোনয়নে অসুবিধা দেখা দিলে হযরতের শ্রেষ্ঠ সহচর হযরত ওমর হযরত আবুবকরকে এ অভিযান বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু হযরত আবুবকর (রা) তাঁর উপদেশ কর্ণপাত না করে উসামার নেতৃত্বে সে অভিযান প্রেরণ করেন। উসামাহ সফলতার সাথে সিরিয়ায় অভিযান করেন এবং বিদ্রোহীদেরকে দমন করে যাকাত প্রথা চালু করে যাকাত আদায় করেন এবং এ প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করেন।

যাই বলা হোক না কেনো হযরত আবু বকর (রা)-এর এ সিদ্ধান্তে সে সময় সুফলই দিয়েছিলো। হযরত ওমর (রা)-এর নির্দেশ মতো কাজ করলে কি ফল হতো তা কেউই জানে না তবে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা রাষ্ট্রের জনগণের জন্য শুভ এবং কল্যাণকর হয়।

হযরত ওমর (রা)-এর সময়কালীন শুরার অবস্থা

হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত কালে কাদেসিয়ার যুদ্ধে নিজে অথবা অন্য কেউ যুদ্ধ পরিচালনা করবেন কিনা তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় এবং অন্যদিকে ইরাক ও সিরিয়ার বিজিত ভূমি ও সম্পত্তি সৈনিকদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে কিনা তৎপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য খলিফাকে মুসলমানদের সাধারণ সভা ডাকতে হয়।

পারস্যের কিছু অংশ দখল করার পর হযরত ওমর (রা)-এর আদেশে অগ্রাভিযান বন্ধ করা হয়েছিলো। কিন্তু পারসিয়ায় নূতন সম্রাট ইয়াজদির্জাদ মুসলমানদের হাত থেকে উক্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার কল্পে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। অন্যদিকে ইরাকেরও কিছু সংখ্যক বিজিত জেলা আবার মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়ে গেলে এবং এ সংবাদ হযরত ওমর (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি মুসান্নাহকে মুসলিম সৈন্যদলকে আরবের অগ্রবর্তী সীমান্তে পাঠাতে আদেশ দিলেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। এ অভিযানে শরীক হওয়ার জন্য মুসলমানগণ দলে দলে সাড়া দিয়েছিলো। খলিফা হযরত ওমর (রা) হজ্জব্রত পালন করে ফিরে এসে মদীনার পাদপ্রান্তে সমাবেশ দেখে নিজেই যুদ্ধ পরিচালনার অভিপ্রায় জানালেন এবং সম্মুখ সমর ভাগের দায়িত্ব হযরত তালহার উপর অর্পণ করলেন। অন্যদিকে ডান ও বাম দিকের ভার যথাক্রমে যুবায়ের এবং আবদুর রহমান বিন আউফের উপর অর্পণ করলেন। যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করার পর খেলাফতের অস্থায়ী ভার হযরত আলী (রা)-এর উপর দিয়ে হযরত ওমর (রা) মদীনা ত্যাগ করার পর ইরাকের দিকে অগ্রসর হলেন। এ যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা

www.pathagar.com

নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূচনা হয়। খলিফা হযরত ওমর (রা) নিজেই সৈন্য পরিচালনার অভিপ্রায় জানিয়ে মুসলমানদের প্রার্থনা সভার আহবান করার নির্দেশ দিলেন। এখানে তিনি এ সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তাদের উত্তর চাইলে সকলে সমস্বরে সমর্থন জানালেন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে যাবার অনুরোধ জানালেন। তিনি তাদের কথামতো যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন এবং আরো বললেন, যে পর্যন্ত ভালো পরামর্শ না পাওয়া যায় সে পর্যন্ত আমি আপনাদের কথামতো কাজ করবো। তারপর তিনি এ ব্যাপারে জনগণের সভার (Dhawi'r Ra'i) মতামতের জন্য পাঠান। এখানে হযরত (স)-এর প্রধান সহচরগণ এবং আরবের প্রধান প্রধান নেতারা উপস্থিত হলে তিনি তাদের মতামত চাইলেন। এ পরামর্শ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, হযরত (স)-এর সংগীদের মধ্য থেকে অন্য কাউকে এ যুদ্ধের অধিনায়ক করে পাঠানো হোক এবং আরও সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে তাঁকে পশ্চাতে থেকে যাওয়া একান্ত উচিত, কারণ জয়ের জন্য এর চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত আর কিছুই হতে পারে না। কারণ, যদি মুসলমান সৈন্যদের পরাজয় নেমে আসে তবে তাদের সাহায্য করার জন্য অন্য সৈন্য দল পাঠাবার জন্য তাঁর প্রয়োজন হবে এবং এভাবে শত্রুকে পরাভূত করা সহজ হবে। অপরপক্ষে মুসলমানদের জয় সুনিশ্চিত হবে।

অন্য বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, তালহা ছিলেন খলিফা ওমর (রা)-এর যুদ্ধে যাওয়ার পক্ষে, অন্যদিকে আবদুর রহমান বিন আউফ ছিলেন বিপক্ষে। কারণ আবদুর রহমান বিন আউফ মনে করেন যে, খলিফা নিজে যদি যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং তাতে যদি পরাজয় হয় বা খলিফার মৃত্যু হয় তবে এ নব্য মুসলিম রাষ্ট্রের বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে। তাই খলিফা ওমর (রা)-কে মদীনায় থেকে যাওয়া সংগত হবে। তবে আল বালাজুরারীর মতে হযরত আলী খলিফা ওমর (রা)-এর যুদ্ধ পরিচালনা করার পক্ষে ছিলেন।

হযরত (স)-এর প্রধান সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণের পর তিনি সকলকে নামাজে উপস্থিত হওয়ার জন্য ঘোষণা করলেন। তাঁর ঘোষণায় উদীপ্ত হয়ে জনগণ উপস্থিত হলে খলিফা তাদেরকে উদ্দেশ করে নিম্নোক্ত বক্তৃতা দেন ঃ

"যিনি মহান, যিনি সম্মানিত, নিশ্চয় তিনি সেই আল্লাহ যিনি ইসলামের মাধ্যমে জ্ঞানীগুণীদেরকে একত্রিত করেছেন এবং তাদের সকল আত্মার একত্রে সমাবেশ করেছেন। তিনি ইসলামের মাধ্যমে সকলকে ভাই হিসাবে রূপান্তরিত করেছেন। মুসলমানগণ একটা সংস্থার মতো এর মধ্যে যদি কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে অন্য অংশ এর ফলাফল থেকে অব্যহতি

www.pathagar.com

পায় না এবং এজন্য মুসলমানদের কর্তব্য হলো প্রত্যেকটা বিষয়ে তাদের মধ্যে পরামর্শ করে এবং প্রয়োজনে চিন্তাবিদদের (Dhawi'r Ra'i) মতামত অনুসারে সকল সমস্যা নিষ্পত্তি করে নেয়া সংগত। সাধারণ মুসলমানদের উচিত হবে তারা যেনো কর্তৃপক্ষের পথ অনুসরণ করেন এবং তাদের সিদ্ধান্তে মত দেন। যারা কর্তৃত্বাধীন আছেন তাদের উচিত হবে তাদের চেয়ে যারা জ্ঞানী তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা এবং তাদের কাজে সহায়তা করা। তবে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে যারা জ্ঞানী ও সুধী তাদের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করা কর্তৃপক্ষের উচিত হবে।

হে মানবগণ! আমি আপনার সঙ্গে একা, (আমার নিজের যুদ্ধে যাওয়া উচিত কিনা) যে পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতাগণ আমাকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ না করেন সে পর্যন্ত আমার মত হলো আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে। অন্য কাউকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পাঠানো উচিত হবে না। আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যাকে আমি অগ্রভাগে পাঠাবো এবং যাকে পশ্চাতে রেখে যাবো তাদেরকে আসার জন্য আদেশ দিয়েছি।"

"আলীকে তাঁর উত্তরাধিকার করে মদীনায় রেখে দেয়া হলো আর তালহাকে আল আওয়াছ অগ্রাভিযানে সেনাধ্যক্ষ করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করা হলো।"

হযরত ওমর (রা) এ ব্যাপারে প্রত্যেককে ডেকে পাঠালেন যে, তিনি নিজে যুদ্ধে যেতে চান। তবে জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, "হযরত ওমর (রা)-কে মদীনায় থেকে যাওয়া উচিত এবং তার পরিবর্তে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে বৃহৎ সৈন্য বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ করে পাঠানো হোক।" অন্যদিকে সিরিয়া ও ইরাকের বিজিত সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে মতদ্বৈততা দেখা দিলে খলিফা হযরত ওমর (রা) সাধারণ সভা ডাকলেন, কারণ অল্পেকের মত ছিলো যে, বিজিত শত্রু সম্পত্তি সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোক। এ ব্যাপারে অনেক পূর্ব স্বাক্ষর আছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) তার জীবদ্দশায় বানু নাযীর ও বানু কোরাইজাহর সকল সম্পত্তি সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করেন। তবে খাইবার জয়ের পর উহার ছোট অংশ রেখে বেশীর ভাগ সম্পত্তি খারাজ পাঠানোর বিনিময় প্রকৃত মালিকদের নিকট হস্তান্তর করেন।

নানা কারণে হযরত ওমর (রা) তা নাকোচ করে দিয়ে বললেন, প্রকৃত মালিকদের সন্তানদেরকে উক্ত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সরকারের স্থায়ীত্ব, উন্নতি প্রভৃতি নির্ভর করে কেবল কৃষক সমাজের উপর। তাই তাদেরকে কষ্টে

www.pathagar.com

রেখে কখনোও সরকারের স্থায়ীত্ব আসতে পারে না । অপর পক্ষে সরকারী কর্মচারী ও সৈন্যদেরকে বেতন-ভাতাদী ও অস্ত্র ক্রয়ের নিমিত্তে স্থায়ীভাবে রিভিনিউ পাওয়া উচিত, তা না হলে সরকারকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সকল বিজিত সম্পত্তি যদি কেবল মাত্র সৈন্যদের হাতে চলে যায় তবে অর্থাভাবে রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব নষ্ট হতে বাধ্য এবং এ বিজিত সাম্রাজ্য যদি তাদের হাতে চলে যায় তবে বৈবাহিক স্থিতিবান আরব জাতি সহজেই আরাম আয়েসে কালাতিপাত করতে চাইবে এবং তাদের বৈবাহিক আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং হযরত ওমর (রা)-এর মতে বিজিত সম্পত্তি কোনোক্রমেই সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা উচিত হবে না। এ ব্যাপারে হযরত আলী, হযরত ওসমান এবং তালহা (রা) তাকে সমর্থন দান করেন। অন্যদিকে আবদুর রহমান, খুবায়েব এবং বিলাল (রা) মত প্রকাশ করেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) যেভাবে বিজিত সাম্রাজ্য বন্টন করতেন সেভাবে বন্টন করা হোক। এ ব্যাপারে খলিফা ওমর (রা) মুসলমানদের সাধারণ সভা ডাকলেন। এ সভা অনেকদিন চললো। তাতে এ আলোচনা হলো যে, ভবিষ্যত বংশধরদের উন্নতির জন্য কেবল মাত্র এ সম্পত্তি পূর্বের মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া যায় কিনা। বিরুদ্ধ দল বললেন, এর উপর ভবিষ্যত বংশধরদের কোনো অধিকার নেই। হযরত ওমর (রা) পরিশেষে কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন যে, পৃথিবীর সকল কিছুর মালিক যখন আল্লাহ তখন তাঁর দূতের উচিত হবে দরিদ্র, অনাথ, পথিক, অসহায় মুহাজিরদেরকে সাহায্য করা। অন্যদিকে পরবর্তী মুসলমানগণ 'ফাই' হিসেবে ফেরত পাবেন সে জন্যও পরামর্শ গৃহীত হয়েছিলো।

শুরার নিয়মাবলী

(১) প্রচলিত নিয়ম ছিলো যে, সাধারণ মানুষ যারা সরকারে আছে তাদেরকে সম্মান করে চলা এবং তাদের কাজে সহায়তা করা এবং অপরপক্ষে যারা সরকারে আছে তাদের উচিত হবে শুরার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া। হযরত ওমর (রা)-এর সময় শুরা হযরত (স)-এর প্রধান সহচর নিয়ে গঠিত হয়েছিলো।

(২) যেখানে দু'টি শাসনতান্ত্রিক সংস্থা ছিলো তার মধ্যে একটা হলো শুরা অন্যটি সাধারণ সভা।

(৩) শুরার সদস্যকে খলিফা ব্যক্তিগত পত্র দ্বারা দাওয়াত পাঠাতেন, অন্যদিকে নামাজে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সাধারণ সভায় উপস্থিত হবার দাওয়াত ঘোষণা করা হতো।

(৪) সাধারণ সভার চেয়ে শুরার সিদ্ধান্ত ছিলো অর্থপূর্ণ।

www.pathagar.com

(৫) তবে ইরাক এবং সিরিয়ার বিজিত সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে শুরার সদস্যদের মধ্যে মতদ্বৈত হলে সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো।

শুরার সদস্য গ্রহণে কোনো ধরাবাধা নিয়ম ছিলো না। খলিফা কেবলমাত্র মদীনার নেতৃস্থানীয় লোকজনদেরকে ডাকতেন কারণ তারাই প্রথমত ইসলাম গ্রহণ করে এবং হযরতের সকল কাজে সহায়তা করেন। তবে খলিফাগণ যাকে উপযুক্ত মনে করতেন হযরত (স)-এর প্রধান সহচরদের সংগে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করে তাকে শুরার মজলিশে গ্রহণ করতেন। শুরার আলোচনা চলাকালেও অনেক সদস্য নেয়া হতো। কারণ, তাদের পরমর্শ সাধারণ লোকের জন্য অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হতো। যারা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলো হযরত ওমর (রা)-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে প্রাধান্য দেয়া হতো।

হযরত ওসমান (রা)-এর এবং হযরত আলী (রা)-এর সময়কার শুরার অবস্থা

খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফত কালে বহু পরিবর্তন ঘটে। কারণ তখন হযরত (স)-এর বহু সহচর ইন্তেকাল করেন এবং অন্য দিকে ঐশ্বর্যশালী উমাইয়াগণ এবং মাখজুমিসগণ প্রাধান্য লাভ করে। এ সময় ওসমান (রা)-এর আত্মীয়স্বজনদের চাকুরীতে নিয়োগ দেয়াতে হযরত (স)-এর অনেক প্রধান সহকর্মীদের সন্তান-সন্ততিগণ বাদ পড়ে যায়। অন্যদিকে সরকারী কর্মকাণ্ডে তার আত্মীয়স্বজন স্থান পায়। হযরত ওমরের সময়ে যে শুরা প্রচলিত ছিলো তা বিলুপ্ত হয়ে গেলো। এ কারণে পরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে হযরত ওসমান (রা) শুরার পরিবর্তে তার গর্ভনরদের সভা ডাকতেন এবং তাদের পরামর্শ মতো কাজ করতেন।

আলীর স্বল্প খেলাফত কাল শুধু মাত্র গৃহ বিবাদ ও নানান ঝঞ্ঝাটপূর্ণ ছিলো বিধায় তিনি শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে মোটেই মনোনিবেশ করতে পারেননি। যদিও অনেক বিষয়ে সকলের চেয়ে তাঁর অধিক জ্ঞান ছিলো এবং তিনি সুষ্ঠু মতামতের অধিকারী ছিলেন, তবুও অনেক ব্যাপারে বারে বারে তার ধূর্ত ও চপল স্বভাবের জন্য অনুচরদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতো। তারা দেশের স্বার্থে কাজ করছে না জেনেও তাদের মতামত গ্রহণ করা হতো। কারণ তাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিলো অবাধ। এখানে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং পরবর্তী খলিফাগণের সময় মোটামুটি যে শুরার প্রচলন ছিলো পরবর্তীকালে উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের যুগে তার বিলুপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

ওমর বিন আবদুল আজীজের অধীনে শুরার অবস্থা

ওমর বিন আবদুল আজীজ খলিফা হবার পূর্বে শুরাকে পুনরুজ্জিবিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তিনি হেজাজের শাসক থাকাকালীন প্রদেশের ভালোমন্দ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটা কাউন্সিল গঠন করেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করেন। খলিফা হবার পর তিনি দামেস্কের লোকজনদেরকে সমবেত করে ভাষণ দেন, এটা ছিলো শুধু নূতন খলিফার পরিচিতি সভা। তিনি সর্বদা জ্ঞানী ও গুণীদের পরামর্শ নিতেন। তবে তাঁর খেলাফত কাল এতো অল্প দিনের ছিলো যে, তিনি সঠিকভাবে কোনো কিছু করে যেতে পারেননি।

অন্যদিকে দ্বিতীয় ওয়ালীদের মৃতুর পর তৃতীয় ইয়াজীদ দামেস্কের লোকজনদের নিয়ে সমাবেশ করলেন এবং তাদের দ্বারা খলিফা মনোনীত হলেন। তাই দ্বিতীয় সভারও খুব গুরুত্ব ছিলো। এ সভা যে সবসময় খলিফা নির্বাচিত করবে তা নয় খলিফা নির্বাচন ধারা স্থির করে দিতেন। এটাও প্রচলিত ছিলো যে, প্রজাদের মঙ্গলের জন্য প্রশাসন ব্যাপারে খলিফার উচিত কিছু মনোনীত লোকদের সংগে আলোচনা করা। উমাইয়াদের সময় নির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুই করা হতো না। তবে নিশ্চিত যে, প্রধান উমাইয়াগণ খলিফাকে সহায়তা করার জন্য একটা কাউন্সিল গঠন করেছিলেন। অন্যদিকে প্রধান আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে প্রধান সদস্য ও খলিফাদের বিশ্বাস ভাজন মাহানিসদ ও ধার্মিকদের পরামর্শ গ্রহণ করা হতো।

খলিফা আল মামুন কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তবে প্রথম অবস্থায় সকল গোত্রের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে তিনি একটা স্থায়ী রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল গঠন করেন। উক্ত সভার প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমস্যা স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারতেন।

সেখানে কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করা হতো না। পরবর্তী সময় তারা যখন পার্থিব কর্তৃত্ব থেকে দূরে সরে যেয়ে আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের উপর মনোনিবেশ করলো তখন এসবের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা দিলো তাই তারা পার্থিব আইনের পরিবর্তে ধর্মীয় এবং শরীয়তি আইনের আশ্রয় নিলেন।

এরপর বুয়াইদ, সামানাঈদ, সেলজুক আয়ুবাইদের সময়ও রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল ছিলো সেখানে প্রত্যেক স্তরের লোকদের প্রতিনিধিত্ব ছিলো। সুলতান সালাহউদ্দিনের সময় রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের সভা ঠিকমত বসতো। কোনো কোনো সময় সুলতানদের অথবা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে দেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক উন্নতির জন্যও সভা হতো।

www.pathagar.com

কোন্ নীতির উপর শুরার নীতি নির্ধারণ হতো

পূর্বাহ্ন ঘটনাপুঞ্জি হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে যে, প্রথম অবস্থা থেকেই আরবগণ গণপ্রজাতন্ত্রী ছিলো এবং তারা অন্যদের দ্বারা শাসিত না হয়ে তাদের নির্দিষ্ট কাউন্সিল দ্বারা শাসিত হতেন। তবে যে নীতির উপর বিশ্বাস করে কাউন্সিলের সদস্য নেয়া হতো, সময়ের প্রেক্ষিতে এর অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রথম দিকে গোত্রের মধ্য থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে বয়োস্কদের কাউন্সিল গঠিত হতো। যদিও সে সময় বয়সের উপর জোর দেয়া হতো কিন্তু কোনো জ্ঞানীগুণী এবং সুনিপুণ যোদ্ধাদেরকে বাদ দেয়া হতো না।

ইসলামের আবির্ভাবের সংগে সংগে হযরত (স)-এর সহচর ও সংগী যারা সবচেয়ে ইসলামের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে নিয়ে শুরা গঠিত হলো। যদিও শুরার সদস্য পদ কাউকে দেয়া না দেয়া খলিফাদের উপর নির্ভর করতো কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞানীগুণী এবং আল্লাহভীরু ও তত্ত্বোপদেষ্টাকে বাদ দেয়া হতো না। যদিও কোনো জনপ্রিয় নির্বাচনের মাধ্যমে কাউকে সদস্য পদ দেয়া হতো না তবে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাউকে মনোনয়ন দেয়া হতো না। রাষ্ট্রের উন্নতি বিধান কল্পে জনগণের ইচ্ছা ও সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হতো।

উমাইয়াদের সময় মজলিসে শুরার রূপ পরিবর্তন হয়ে গেলো। উমাইয়া খলিফাগণ কোনো রাজনৈতিক নেতা, তত্ত্বোপদেষ্টা ও আইনজ্ঞদের মতামত না নিয়ে কেবল উমাইয়া রাজবংশীয় লোকদের মতামত গ্রহণ করতেন যা মুসলিম সমাজের জন্য খুব ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়। এতে জনগণের ভালো মন্দ ও উন্নতির কোন স্পষ্ট বিধান না থাকায় মুসলমানগণও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় দিক দিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো।

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ হেজাজের প্রাদেশিক গভর্নর থাকাকালীন মুসলিম আইনজ্ঞ ও তত্ত্বোপদেষ্টাদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল গঠন করেন। তাই সে সময় মুসলমানগণ মত প্রকাশ করার জন্য কিছু স্বাধীনতা পেয়েছিলো। পরবর্তী কালে খলিফা হয়ে তিনি মুসলিম বিধানের উন্নতির কল্পে স্থায়ী শুরা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালান। তখনো মদীনাতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মুসলিম আইনজ্ঞদের পাওয়া যেতো তবে তারা দামেস্কে যেতে রাজী ছিলো না। হাসান বসরীর মতো তত্ত্বোপদেষ্টা এবং অভিজ্ঞ লোকও নগর ছেড়ে যেতে চাননি। ওমর বিন আবদুল আজিজের আড়াই বছরের খেলাফতকালেও তিনি খেলাফত দামেস্ক থেকে মদীনাতে পরিবর্তন করে নিতে

www.pathagar.com

পারেননি। এ কারণে এ ধার্মিক খলিফাও রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের সঠিক অধিবেশন বসাতে পারেননি এবং ধার্মিক ও তত্ত্বোপদেষ্টাদের সঠিক মতামত গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হন।

অন্যদিকে খলিফা আল মামুনের প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা হবার পূর্ব পর্যন্ত আরববাসী রাজবংশের নেতৃস্থানীয় লোকের দ্বারা শুরার কাজ চালাতো। খলিফা মামুন খেলাফতের শ্রেষ্ঠ ধার্মিক তত্ত্বোপদেষ্টা ও মুসলিম আইনজ্ঞদের নিয়ে শুরা পরিচালনা করতেন। কিন্তু তারপর আর কোনো মজলিসে শুরার স্থায়ীত্ব পাওয়া যায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, যদিও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদেশে মজলিস, মালা এবং নাদিউ কাওম এবং মুসলমানদের সময় ইসলামের আবির্ভাবের পর মজলিসে শুরা এবং জনগণের সাধারণ সভা কোনো সুনির্দিষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিন্তু এটা স্বীকার্য যে, এটা ইসলামের শ্রেষ্ঠ নীতি ও সরকারের পরামর্শ অনুসারে এর নীতি নির্ধারণ হতো। প্রথম কাল থেকে আরম্ভ করে মংগলদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পূর্বপর্যন্ত বহু উত্থান ও পতনের মধ্যে মজলিসে শুরা দ্বারা মুসলিম শাসনতান্ত্রিক যে স্থায়ীত্ব আসে তা অপূরণীয় এবং যে কোনো কালের, যে কোনো পরামর্শ সভার নীতিমালার চেয়ে শতগুণে গণতান্ত্রিক। তবে মংগলদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর মুসলমানদের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা সমূলে বিনাশ হয়ে যায়। তবে পৃথিবীতে যদি হযরত (স)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মজলিসে শুরার ন্যায় কোনো শুরা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো তবে এ পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসতে বাধ্য হতো।

www.pathagar.com

আরবীয় বিচার প্রণালী

প্রাক ইসলামী যুগের বিচার ব্যবস্থা

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে তার সমাধান কল্পে বা কোনো মালিকের বিচার করার জন্য আরব দেশে কোনো স্থায়ী আদালত ছিলো না। কোনো গোত্রের মধ্যে কোনো বিবাদ হলে গোত্রীয় প্রধানগণ নিজেদের বিবেক বুদ্ধি দ্বারা বিচারকার্য সমাধা করতেন। কিন্তু একগোত্র অন্য গোত্রের মধ্যে বা বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হলে গোত্রীয় প্রধানগণ এর মীমাংসা করতে পারতেন বা ঐ বিবাদ মীমাংসা বা নিষ্পত্তিকল্পে হাকিম বা বিচারপতি বা কাজী নিযুক্ত করতে পারতেন। সে যুগে আরববাসীগণ সাধারণত কাজীর পদ গ্রহণ করতে চাইতেন না কারণ সেখানে কোনো স্থায়ী বিচারালয় ছিলো না। তবে ইসলামের আবির্ভাবের সংগে সংগেও কোনো আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরবর্তীকালে বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কাজীর আদালতের মাধ্যমে সকল বিচারকার্য পরিচালিত হতো।

ইসলামের প্রথম অবস্থায় বিচারব্যবস্থা

ইসলামের প্রথম অবস্থায় কিছুসংখ্যক উন্নতমনা, জ্ঞানী ও আইনজ্ঞ মুসলমানকে কাজীর পদে মনোনয়ন দেয়া হতো। তাঁরা হাকিম বা কাজী নামে পরিচিত। প্রথম দিকে অনেক ক্ষেত্রেই বিবদমান লোকগুলো নিজেরাই তাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করে ফেলতো তাই কাজীদের খুব প্রয়োজন হতো না। অনেক কাজীই নাবালক শিশুদের ও তাদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতেন। অন্য দিকে কেউ কেউ ওয়াকফ সম্পত্তির দেখা শুনা করতেন।

অনেক মুসলমানের মতো শাসকের বিচার বিষয়ে দু রকম কার্যবিধি ছিলো। এক রকম হলো স্পষ্ট এবং অন্যটি হলো অস্পষ্ট। তাঁর প্রকৃত কার্যক্রম ছিলো রাজত্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার সংগে সংযুক্ত, অন্যদিকে রাজত্বের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমতা রক্ষা করা এবং সবলদের হাত থেকে দুর্বলদের রক্ষা করা। তার নিবারণক্ষম কার্যক্রম কেবলমাত্র দুষ্টদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য এবং সর্বহারার ক্ষমতাকে প্রতিপন্ন না হতে দিয়ে সমুন্নত রাখা। তাই ন্যায়সংগতভাবে সাহসিকতার সংগে সত্য প্রতিষ্ঠা কল্পে সুবিচার করা আরবদের সৎ ও মহৎ চরিত্রের লক্ষণ।

www.pathagar.com

এখানে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রাক ইসলামী যুগে সমস্ত আরব গোত্রের নামে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা হতো, কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র মুসলিম জাতি সুস্পষ্টভাবে দায়ী। কুরআন ও হাদীস অনুসারে মসজিদে নববী, দারুল ফাদা এবং দেওয়ানে বসে জনগণের সম্মুখে বিচারকার্য সমাধা করা হতো। ইসলামী আইনে রাজা প্রজা সকলে সমান ছিলো। খলিফাকেও প্রয়োজনে কাজীর দরবারে হাজির হতে হতো। সেখানে খলিফা হিসাবে নয় সামান্য ফরিয়াদী বা বিবাদী হয়ে।

কাজীদের গুণাবলী

ব্যবহার শাস্ত্রবিদদের মতে কাজীকে পুরুষ, বয়স্ক, আইনজ্ঞ, স্বাধীন নাগরিক, বিশ্বাসী, সৎ চরিত্রবান, দৃষ্টি সম্পন্ন, দৃষ্টিকটু না হওয়া, কানে ভাল শুনা এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে ভালো জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। আল মাওয়ার্দীর মতে কাজীদের কর্তব্য হলো প্রত্যেক অমীমাংসিত সমস্যাবলীকে আইনের মাধ্যমে সমাধা করা, অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, যৌতুক থেকে রক্ষা করা, উইল প্রতিষ্ঠিত করা, বিধবা বিবাহে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং বিবাহ দেয়া, দোষীকে শাস্তি দেয়া, জনসাধারণের হাত থেকে সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করা, অধীনদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ও তাদের কাজকর্ম দেখা শুনা করা এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করা।

মুসলমান রাজাদের কর্তব্য হলো তাঁর রাষ্ট্রে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে আইন প্রতিষ্ঠিত করা। খলিফাদের আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পাওয়ার সংগে সংগে এর মধ্যে কোনো বিবাদ বাধলে ইহা নিষ্পত্তি করার জন্য বিভিন্ন স্থানে কাজীদের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজীরাও কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক সকল বিবাদের মীমাংসা করতেন। অমুসলমানগণও তাদের আইন অনুসারে শাসিত হতো। যেহেতু অমুসলমানগণ সুন্নাহ অনুসারে শাসিত হতো না সেহেতু কাজীরাও স্থানীয় আইন অনুসারে কোনো মীমাংসা করতে পারতো না সেহেতু প্রথম অবস্থা থেকে মুসলমান কাজীগণ ও রাজারা অমুসলমানদের সকল বিবাদের মীমাংসা না করে তাদের ধর্মযাজক ও প্রধানের উপর ন্যস্ত করে ছিলেন। যখন কোনো বিবাদ এমন আকার ধারণ করতো যে, তাদের প্রধানদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হতো না তখন শাসকগণ তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতেন, মুসলিম আইন দু'ভাগে ভাগ করা হলো—ধর্মীয় এবং নিরপেক্ষ। ফতুয়ায়ে আলমগীরের মতে অমুসলমানগণ ইসলামী ধর্মীয় অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতভাবে তারা তাদের ধর্মীয় অনুশাসনে শাসিত হতো। কেবল অপরাধের ক্ষেত্রে যেমন চুরি, ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে একই আইন সকলের জন্য প্রযোজ্য ছিলো।

www.pathagar.com

যখন একজন মুসলমান এবং একজন অমুসলমানের মধ্যে বিবাদ সংঘঠিত হতো তখন উক্ত বিবাদের মর্মানুসারে নীতিগতভাবে বিচারকগণ বিচার করতেন।

"তবে পার্থিব ব্যাপারে জিম্মিগণ মুসলমানদের মতই ব্যবহার পেতো।"

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, বাণিজ্য এবং শাসন ব্যাপারে প্রায় ক্ষেত্রেই স্থানীয় আইনের সমাবেশ ঘটতো। তবে উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক প্রভৃতি ব্যাপারে মুসলমানগণ তাদের আইন মেনে চলতো এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ তাদের ধর্মীয় আইন মেনে চলতো। মুসলিম ফৌজদারী আইন, দেওয়ানী আইন, সাক্ষ্য আইন এবং চুক্তি আইন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো। "জিম্মি এবং মুসলমানের রক্তে যেরূপ কোনো পার্থক্য ছিলো না, সেরূপ বিচারে এবং শাসনে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হতো না।

স্থানীয় শাসন স্থানীয়ভাবে করা হতো। কেবল মাত্র গ্রাম্য প্রধান তার মতানুসারে স্থানীয় আইনের দ্বারা সকল বিবাদ মীমংসা করে ফেলতো। নেতা বা পুলিশ অফিসার গ্রামের কোনো হত্যাযজ্ঞ বা কোনো খারাপ ঘটনার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকতো।

ব্যবস্থাপনা

হযরত ওমর (রা) লিপিবদ্ধ করে ছিলেন যে, কাজীর উচিত বাদী এবং বিবাদী সকলের সংগে সমানভাবে ব্যবহার করা। অন্যদিকে বাদী ও বিবাদী প্রত্যেকেই ঘটনার প্রমাণ করতে হতো যে, ঘটনা ঠিক এবং প্রত্যেককে এ প্রতিজ্ঞা করতে হতো যে, যেকোনো ঘটনাতেই তাদেরকে মীমাংসার মনোভাব থাকতে হবে এবং বিচারককে সুষ্ঠুভাবে বিবাদ মীমাংসা করায় সাহায্য করতে হবে। এজন্য আবার বিচারককে কোনো বিচারকার্য সমাধা করার জন্য উভয় পক্ষকে নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে এবং ঐ দিন কাজী বা বিচারক তাদের কথা শ্রবণ করবেন, এতে বাদী পক্ষ যদি অনুপস্থিত থাকে তবে যে কোনো বিবাদ একতরফাভাবে বিচার করা হবে। যদি কোনো মুসলমান কোনো মামলায় কখনো শাস্তি ভোগ করে থাকেন তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতো না। একবার শাস্তি পেয়ে থাকলে এবং তার সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে সে দোষী ব্যক্তি সুতরাং তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হতো না।

প্রত্যেক বাদী ও সাক্ষীকে তাদের সাক্ষ্য দিতে হবে এবং এমনভাবে তাদের পরীক্ষা করা হবে যেনো অন্য কোনো সাক্ষী তা না শুনতে পারেন। সাক্ষীর সাক্ষ্য সংগতিপূর্ণ ও পরিপূর্ণভাবে হতে হবে। সাধারণত আইন

www.pathagar.com

অনুসারে যে কোনো বিবাদ দু'জন পুরুষ লোক অথবা একজন পুরুষ লোক এবং দু'জন মহিলার সাক্ষী হতে হবে। পরবর্তী সময় মামলার জটিলতার দরুন এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে।

মুসলমানগণ তাদের বহু দিনের চিন্তাধারানুসারে ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আইন প্রণয়ন করেন। কোথা থেকেও আদালতে নালিশ আসলে আদালত বাদী ও বিবাদীকে নোটিশ জারী করে থাকেন। উভয় পক্ষ যা তাদের উকিলদের সম্মুখে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ কথা শুনে বিধান অনুযায়ী ন্যায় নিষ্ঠার সংগে বিচারকার্য সম্পন্ন করা হতো। উভয় পক্ষকে তাদের নালিশের সত্যতা প্রমাণের জন্য নির্দেশ দেয়া হতো। সে অনুসারে আবার উভয় পক্ষকে সাক্ষী দিতে হতো। সাক্ষ্য গ্রহণের পর বিচারক উক্ত ঘটনাকে পুংখানুপুংখ রূপে জেনে নেয়ার জন্য কিছু সময় রাখতেন এবং ঘটনা সম্বন্ধে পূর্ণভাবে অবগত হয়ে রায় প্রদান করতেন। প্রত্যেক বাদীকে তাদের নালিশ প্রমাণ করার জন্য অন্ততপক্ষে দু'জন সাক্ষী দাঁড় করতে হতো। কোনো সন্দেহভাজন লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো না। সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিলাদী দেখার পর বিচারক সকল ঘটনা অবগত হবার জন্য নিজে তদন্ত কার্য পরিচালনা করতেন। ঘটনার উপর নির্ভর করে আইনসংগতভাবে বিচারের রায় দেয়া হতো। যদি কোনো বন্দী বাদী পক্ষ তার নালিশের পক্ষে কোনো সাক্ষী দিতে না পারতো তবে কাজী কোনো না কোনো অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর সত্যতা বের করে নিতেন। যদি তিনি কোনো ঘটনার সত্যতা বের করতে অকৃতকার্য হতেন তবে সেক্ষেত্রে বাদীকে ডেকে তার নালিশ সম্বন্ধে হলফ বা প্রতিজ্ঞা করে ঘটনা সত্য বা মিথ্যা বলার জন্য নির্দেশ দেয়া হতো। তবে কোনো ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য বাদীর প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট ছিলো না। কাজীদের নিজস্ব এবং প্রাইভেট তদন্তে ভালো ফল পাওয়া যেতো। প্রয়োজনে কাজীরা ঘটনাস্থল পরির্দশন করে এর সত্যতা বের করে নিতেন।

অপরাধ প্রবণতা সম্বন্ধে মুসলিম ধারণা

মুসলিম ধারণা অনুসারে অপরাধকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে অপরাধ করা ঃ

কোনো বিবাহিত পুরুষ কোনো বিবাহিত স্ত্রীলোকের সংগে ব্যভিচার করলে ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপণ দ্বারা শাস্তি দেয়া হতো। অন্যদিকে কোনো অবিবাহিত পুরুষ ব্যভিচার করে থাকলে তাকে একশত বেত্রাঘাত করা হতো। আল্লাহদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। মদ্যপায়ীদের ৮০টি বেত্রাঘাত করা হতো। চোরের চৌর্যবৃত্তির জন্য হাত কেটে দেয়া হতো।

www.pathagar.com

প্রথম চুরির জন্য ডান হাত, দ্বিতীয় চুরির জন্য বাম হাত, তৃতীয় চুরির জন্য ডান পা এবং চতুর্থবার চুরির জন্য বাম পা কর্তন করার ব্যবস্থা দেয়া আছে। সে যুগের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে, এ ব্যবস্থার জন্য আরব দেশে ন্যূনতম চুরির ঘটনা শুনা যায় না। এখনো মূল আরব দেশে এ ব্যবস্থা চালুর জন্য চুরির প্রবণতা কম। হাদীসে আছে, যে পুরুষ বা নারী চুরি করে তারা যা করেছে তার শাস্তি স্বরূপ তাদের হাত কর্তন করে ফেলো, আল্লাহর নিকট থেকে এটা আদর্শ দণ্ড। এখানে বলতে হয় যে, বর্তমান বিশ্বে যদি এ ব্যবস্থা চালু থাকতো তবে পৃথিবীতে চোরের ইতিহাস রচনা হতো না। এখানে মানুষের আইন ও আল্লাহর প্রদত্ত আইনের মধ্যে যে কি পার্থক্য তা স্পষ্ট। ডাকাতদের হাত ও পা কেটে দেয়া হতো, তাকে হাদ্দ বলা হয়। যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে অন্যায় করে তাকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু কোনো শাসক বা শাসনকর্তার সে ক্ষমতা নেই। যদি কোনো মুসলমান তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন কিন্তু মুসলিম শাসকদেরকে হাদ্দ অনুসারে কাজ করতে হয়। যদি কোনো অমুসলিম মুসলিম হয় তবে তার উপর হাদ্দ প্রযোজ্য নয়। মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর পূর্বের অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখা হয়ে থাকে।

(খ) মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ কিসাসের অন্তর্ভুক্ত ঃ

মানুষের বিরুদ্ধে অধিকাংশ অপরাধ যেমন হত্যা, লুট, আঘাত ইত্যাদীর জন্য উভয় পক্ষ নিজেদের মধ্যে সমঝোতা দ্বারা নিষ্পত্তি করতে পারে নতুবা আইনানুগভাবে বিচারে শাস্তি পেতে হয়। কাউকে হত্যা করলে তাতে রাষ্ট্রের কোনো লাভ বা ক্ষতি হয় না কিন্তু উক্ত হত্যা দ্বারা কোনো বংশের ক্ষতি হয়। যদি কোনো লোককে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় তবে ক্ষতিগ্রস্ত দল তার মৃত্যুদণ্ড চাইবে অথবা রক্তের বদলা রক্ত চাইবে বা তার জন্য টাকা-পয়সা চাইবে নতুবা তার কাজের জন্য ক্ষমা চাইবে, অন্যথায় তাকে ক্ষমা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। খলিফারাও কোনো দিন কোনো অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারতেন না।

(গ) কোনো কোনো অপরাধ যেমন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ডাকাতি এবং জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। এসব ব্যাপারে খলিফাগণ ক্ষমা করলে করতে পারেন তবে এ সকল ব্যাপারে কেবলমাত্র দোষী ব্যক্তিকেই শাস্তি দেয়া হয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট শাস্তি নেই, তাই অনেক সময় শাসকগণ দোষী ব্যক্তিকে পাওনার চেয়ে বেশী শাস্তি দিয়ে থাকেন। বর্তমানে বিভিন্ন

www.pathagar.com

দেশে রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা এমনকি মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। বিদ্রোহ ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে দমন করার জন্য ইসলামী আইনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে, কেননা ইসলাম অশান্তিকে বিষ চোখে দেখে। তাদের শাস্তি বিধান নিম্ন আয়াতে বিধি বদ্ধ হয়েছে ঃ

"যারা আল্লাহ ও তার প্রেরিত নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যারা দেশে অশান্তি বিস্তারের চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি এই তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শুলে বিদ্ধ করা হবে, বা তাদের হস্তপদ ভিন্ন ভিন্ন দিক হতে কর্তন করা হবে বা তাদেরকে কারাগারে আবদ্ধ রাখতে হবে। ইহজগতে তাদের জন্য অপমান এবং পর জীবনে তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি নির্ধারিত, কেবল তোমাদের হস্তে পতিত হবার পূর্বেই অনুতপ্ত হয়েছে তারা নয়।"

প্রতিষেধক ব্যবস্থা

মুসলমানগণ কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার চেয়ে তাকে অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য বিশেষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। তাই এ ব্যবস্থা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার চেয়ে প্রতিষেধক ব্যবস্থা বিধায় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। মুহতাছিব এবং তার অধীন কর্মকর্তাগণ বিশেষ-ভাবে ধর্মদ্রোহী লোকদেরকে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ না করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে সাহিবুস সুরতাহ এবং তার অধীনস্থ ব্যক্তিরা কেবলমাত্র দেশদ্রোহী লোকদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন এবং তাদেরকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কার্য করা থেকে নিষিধাজ্ঞা জারী করেন এবং বিরত রাখেন। তবে ইসলামী আইন অনুসারে কেবল মাত্র তিনটি অপরাধির জন্য মৃত্যুদণ্ডাদেশ বলবৎ হয়ে থাকে তাহলো খুন, আল্লাহদ্রোহী এবং বিবাহের পর কোনো স্ত্রীলোকের সংগে ব্যভিচার করা।

কোনো নালিশের ত্বরিত বিচারকার্য সম্পন্ন হওয়া

যতদূর সম্ভব শাসনে যে কোনো বিচার ত্বরিত হয়ে থাকে তার কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, সে শাসনে প্রথমত কোনো মামলার বিচার প্রথমত গ্রাম্য বা স্থানীয় আদালতে শেষ হয়। সেখানে শেষ না হলে জেলা পরিষদে হতো। প্রাদেশিক আদালতে খুব কম বিচার কার্য সম্পন্ন হতো তার কারণ পূর্বেই অনেক মামলার বিচার স্থানীয় আদালতে হয়ে থাকে। না হলে পরে জেলা আদালতে শেষ হয় এর জন্যই যে কোনো বিচার ত্বরিত হয়। সে সময় উর্ধতন বিচার বিভাগে কোনো মামলা দায়ের করতে হলে এর জন্য কোনো একটা ফরমালিটির প্রয়োজন হতো না। অন্যদিকে কোনো আইনজ্ঞও

www.pathagar.com

বিচারকার্য সমাধা করতে বাধার সৃষ্টি করতো না। অনেকের মতে এ ব্যবস্থা খুব শক্ত ছিলো কিন্তু অন্যদিকে আবার অনেক লেখক মনে করেন যে, এ ব্যবস্থায় সুবিচার হতো। তবে এখানে বলা যায় যে, মামলার বিচার যতো তাড়াতাড়ি হয় সে মামলায় ততো সুবিচার আশা করা যায়, বিলম্বে সুবিচারের আশা ক্ষীণ হয়ে দাঁড়ায়।

মধ্যস্থতা

আরবীয় বিচারকার্যের উৎস হলো মধ্যস্থতা। মধ্যস্থাতাকারীকে সকল দিক দিয়ে কাজীদের মতো গুণসম্পন্ন হতে হবে। মধ্যস্থতার ব্যাপারে একজন স্ত্রীলোকও মধ্যস্থাতাকারী হতে পারে তবে কোনো জিম্মি ও তার সমকক্ষ লোকের পক্ষে মধ্যস্থতা করতে পারে, তাতে কোনো রকম আপত্তি নেই।

মুফতী

মুফতীগণ কার্যত স্থায়ী চাকুরে নয়। ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম অবস্থা থেকে জ্ঞানী ও আইন বিশেষজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া হতো। হযরত ওমর (রা) এর প্রবর্তন করেন। তিনি প্রথমত কিছুসংখ্যক জ্ঞানীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়ার জন্য সুপারিশ করেন, তবে এ ব্যপারে তাদেরকে কোনো অর্থ বা ফি দেয়া হতো না। এতে প্রত্যেক নাগরীক আইন সম্বন্ধে জানতে পারতেন। অনেক সময় কাজীগণও অনেক মামলা সম্বন্ধে ভালো সিদ্ধান্তে না আসতে পারলে আইনসংগতভাবে মুফতীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। মুফতীরাও ফতোয়া জারী করে এর সত্যতা প্রকাশ করে দিতেন।

কাজী-উল-আসকার

সৈন্য বিভাগের বিচার করার জন্য অন্য কাজী ছিলেন, তাদেরকে কাজী-উল-আসকার বলা হতো। ইসলামের প্রাক্কালে সৈন্যদের সংগে কাজীদেরকেও রাখার ব্যবস্থা ছিলো। তারা শুধুমাত্র সৈন্যদের ক্যাম্পের মধ্যে থেকে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। কোনো ঘটনায় যদি সৈন্যগণ একপক্ষ হয় এবং অন্যদিকে অপরপক্ষ শহুরে কাজীর আওতাভুক্ত হয় এবং শহরে থাকে তবে শহুরে পক্ষ যদি উক্ত মামলার বিচার শহরে চান তবে বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া কাজী-উল-আসকার এর বিচার করতে পারেন না। অন্যদিকে যদি উভয় পক্ষ সৈন্য বিভাগের হয় কিন্তু তারা শহুরে কাজীর বিচার চায় তবে কাজী এর বিচার করতে পারেন। তাতে কারো বা কাজী-উল-আসকারেরও আপত্তি থাকতো না। সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া উচিত নহে। আল্লাহর বান্দা ও মুক্ত স্বাধীন নাগরীক হিসাবে সুবিচার পাওয়ার জন্য যে

www.pathagar.com

কোনো পক্ষ উপযুক্ত আদালতের দ্বারস্থ হতে পারতো তাতে সরকারের পক্ষ থেকে আপত্তি থাকতো না এবং থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তা ইসলামের নীতির পরিপন্থি।

মুহতাসিব

ধর্মীয় ও নৈতিক দিক রক্ষা করার এবং অপরাধীকে ন্যায়সংগতভাবে শাস্তি দেয়ার জন্য খলিফা আল মাহদী 'আল হিসবাহ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কয়েম করেন। যিনি উক্ত অফিসের কার্য সমাধা করতেন তাকে আল মুহতাসিব বলা হতো। জনসাধারণের নৈতিক বোধ এবং বাণিজ্যিক অসাধুতা দূর করার জন্য এ অফিস বিশেষভাবে দায়ী। যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায় তবে মুহতাসিবকে তার সত্যতা জেনে নিয়ে এর বিচার করতে হবে। কোনো ব্যাপারে কারো ব্যক্তিগত কিছু জানার অধিকার তার নেই।

মুহতাসিবদের শ্রেণী বিভাগ

আল মাওয়ার্দীর মতে মুহতাসিব হলো দু' প্রকার যথা ঃ অবৈতনিক এবং সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত কর্মচারী। তাদের কর্তব্য হলো জনসাধারণকে ভালোভাবে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেয়া এবং খারাপ কাজ করা থেকে নিষিদ্ধ করা ও বিরত রাখা। বাজারের সুপারেন্টেনডেন্ট হিসাবে তার কর্তব্য হলো অধিনস্থ কর্মচারীদের সংগে নিয়ে বাজারে ওজনের জন্য ব্যবহৃত বাটখারা পরীক্ষা করে দেখা এবং কেউ দূষিত দ্রব্য বিক্রি করছে কিনা তা সরজমিনে তদন্ত করা। প্রত্যেক ব্যাপারে পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

কর্তব্য

রাস্তাঘাট, শহরে-বন্দরে যাতে লোকজন কোনো খারাপ কাজ করতে না পারে, কোনো প্রকার ব্যারিকেট সৃষ্টি না করতে পারে, রাস্তায় যাতে কোনো ঘর উঠাতে না পারে, বসতি স্থাপন না করতে পারে, পথিক চলাচলের ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে, মৃত ব্যক্তিকে যেনো পথে বা অন্যদের জায়গায় মাটি না দিতে পারে, ভৃত্যদের এবং পশুদের উপর যাতে নির্দয় ব্যবহার না করা হয়, ঋণী ব্যক্তিকে ধার পরিশোধ করতে বাধ্য না করে, নিয়মিতভাবে মসজিদে এসে সালাত কায়েম করার জন্য তাগিদ দেয়, রমজান মাসে রোজা রাখার জন্য তাগিদ দেয়, বিধবা/তালাকপ্রাপ্তাদেরকে ইদ্দতপালন করতে বাধ্য করে, অবিবাহিতদেরকে বিবাহ করতে উৎসাহ দেয়, জনসম্মুখে পুরুষেরা যেনো স্ত্রীলোকদের উপর আসক্ত না হয় তার ব্যবস্থা করা, মাতাল অবস্থায়

www.pathagar.com

যেনো কেউ কারো উপর অন্যায় না করে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা মুহতাসিবদের কর্তব্য। যেখানে সত্য প্রমাণিত ও উদঘাটিত হয় সেখানে মুহতাসিবগণ বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারেন। যদি কোনো মামলায় সাক্ষ্য নেয়া এবং হলফ করার প্রয়োজন হয় সে বিচারের জন্য কাজীর দরবারে যেতে হবে। তাই তার কাজ হলো কাজী এবং নাজীরুল মাজালিশের মধ্যবর্তী কিন্তু পদমর্যাদার দিক দিয়ে সে এ উভয়ের চেয়ে নিম্ন পদের।

❐

www.pathagar.com

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সাম্য

ইসলামী আইনে কোনো সুবিধাবাদের স্থান নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সর্বতোভাবে সমান। তাদের অধিকার, মর্যাদা ও অপরাধের দণ্ডদানের ব্যাপারে কোনো পার্থক্য করা হয় না। ইসলামী আইনে ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, রাজা-প্রজা ও দাস-দাসী সকলেই সমান অধিকার ভুক্ত। এদিক দিয়ে নাগরীকদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্যও করা হয় না। আইনের দৃষ্টিতে নাগরীকদের এই সাম্য ও সমতা তুলনাহীন ; দৃষ্টান্তহীন ; কেননা পৃথিবীতে কেবলমাত্র ইসলামী আইনব্যবস্থা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই আইনের নিকট সকল নাগরিকদের সমান মর্যাদা ও অধিকার নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের এ সাম্যনীতি মূলতঃ দীন ইসলামের পরম সাম্যনীতিরই পরিণতি। আর ইসলামের এই সাম্যনীতির মূলে দুটো ভিত্তি বিদ্যমান। প্রথম ইসলামের মৌল বিশ্বাস হচ্ছে, সকল মানুষ এক এবং অভিন্ন। কারণ প্রত্যেক মানুষই আদম ও হাওয়ার সন্তান, একই উপাদানের সৃষ্টি। দ্বিতীয় ইসলামী আইনে ছোট-বড়, অপরাধী কারো মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। দেশের আপামর জনগণ একই আইন দ্বারা শাসিত হয়। সেই আইনে যে যে রকম অপরাধ করবে সে যে লোকই হোক না কেনো তার কৃত অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ফরমায়েছেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○ ـ النساء : ٦٥

"না, তোমার রবের শপথ! এই লোকেরা কখনই ঈমানদার বলে গণ্য হতে পারবে না। যতক্ষণ তারা তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে হে নবী আপনাকে বিচারক মেনে না নিবে এবং আপনি যে রায়ই দিবেন তা মেনে নিতে নিজেদের মধ্যে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ করবে না। বরং তা মাথাপেতে মেনে নিবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৫

ইসলামী আইন হলো কুরআনের আইন। কুরআনের নির্দেশ পালনকারী হলো মু'মিন মুসলমানগণ। যারা নবী করীম (স)-কে তাদের বিচারক এবং তার বিচার ও বিচারের রায় মেনে নেয় তারাই হলো মুসলিম। যারা কুরআনের আইন মানে না তারা কখনো মুসলমান হতে পারে না। যারা উপকার

www.pathagar.com

পেলে পক্ষে থাকে এবং ন্যায়নীতি বহির্ভূতভাবে সুবিধাবাদী পেতে চায় সে সকল সুবিধাবাদী দল বা ব্যক্তি কখনো মুসলমান হতে পারে না। কারণ ইসলামে সুবিধাবাদের কোনো স্থান নেই। সুবিধাবাদ ও ইসলামের মধ্যে আসমান জমীন তফাত। সেজন্য কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ○ ـ النور : ٤٨-٤٩

"তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয় যেন রাসূল তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের মামলার ফয়সালা করে দিতে পারেন তখন তাদের মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠী মুখ ফিরিয়ে লয়। আর যদি তাদের অনুকূল (প্রাপ্য) বাক্য হয় তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটে আসে।"–সূরা আন নূর ঃ ৪৮-৪৯

কুরআনে আরো উল্লেখ আছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ج فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ اطْمَاَنَّ بِهٖ ج وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ج خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ○ ـ الحج : ١١

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে তাদের মঙ্গল হলে তাতে তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়া ও আখেরাতে এটাই তো স্পষ্ট ক্ষতি।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ১১

কুরআন অনুযায়ী বছরে চারটি মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়-কাল থেকেই হজ্জ পালনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার লক্ষ্যে এ নিয়ম চলে আসছে। কিন্তু সুবিধাবাদী দল বা গোষ্ঠী নিজেদের সুবিধা অনুসারে এ হারাম মাসগুলোকে অন্যান্য মাসের সঙ্গে অদলবদল করে নিতো এবং যে মাসে তাদের যুদ্ধ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়তো সে মাসেই যুদ্ধ করতো এবং ঐ মাসের পরিবর্তে অন্য মাসকে হারাম হিসাবে ধরতো। সুবিধাবাদী নীতির তীব্র সমালোচনা করে কুরআনে উল্লেখ হয়েছে ঃ

اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا

www.pathagar.com

وَيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ط زُيِّنَ لَهُمْ سُوْءُ اَعْمَالِهِمْ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

"এই যে মাসকে পিছিয়ে দেয়া কেবল কুফরী বৃদ্ধি করা যা দ্বারা কাফিরগণকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা উহাকে কোনো বছর বৈধ করে এবং কোনো বছরকে অবৈধ করে যাতে তারা, আল্লাহ যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে ; অনন্তর আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৩৭

এ সুবিধাবাদী চরিত্রের কারণে ইয়াহুদী পণ্ডিতগণ সাধারণ মানুষকে খুশি করা ও তাদের থেকে হীন বৈষয়িক স্বার্থ লাভের জন্য আল্লাহর কিতাব বিকৃত করে। কুরআনে তাদের হীন কাজের সমালোচনা করে বলা হয়েছে ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ لا وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○ ـ النساء : ٤٦

"ইহুদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলোর অর্থ বিকৃত করে এবং বলে, শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম এবং শোনে না শোনার মতো আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে রা'ইনা কিন্তু তারা যদি বলতো শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম এবং শ্রবণ করো ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য করো তবে তা তাদের জন্য ভালো ও সংগত হতো কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪৬

কুরআনে সূরা মায়েদাতে উল্লেখ আছে ঃ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ج يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ لا وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ج وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى

www.pathagar.com

خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ - المائدة : ١٣

"তাদের অঙ্গীকার ভংগের জন্য তাদেরকে লা'নত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠিন করেছি ; তাদের শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে ; তুমি সর্বদা তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবে। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো। আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১৩

ইয়াহুদীগণ এমনিতেই মোনাফেক। এদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ পণ্ডিতগণ আরো মোনাফেক। তারা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে সাধারণ লোকদেরকে নাফরমানী করার অনুমতি প্রদান করতো আর বলতো, আমরাই তোমাদের শাফাআতের জোরে উতরিয়ে দেবো। তারা ছিলো ভয়ংকর রকমের হিংসুক। এ হিংসা ও মিথ্যা কদাচারের দ্বারা তারা তাদের দ্বীনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। সাধারণ লোক তাদের বিশ্বাস ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ভুল পথে চলার জন্য তাদের উপর পতিত হয়েছে অভিশম্পাত। এ কারণেই ইসলামী শরীয়াত কার্যকারণের পথে বাধাদানকারী কোনোরূপ শাফাআত করাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দিয়েছে। ইসলামী দণ্ডসমূহ অপরাধীদের উপর যথার্থ কার্যকর করার জন্য প্রবল তাগিদ দিয়েছে, এবং যার যা প্রাপ্য তা তাকে দেবার জন্য তাগিদ দিয়েছে। অপর পক্ষে আল্লাহর বিধান অনুসারে নির্ধারিত দণ্ডাদেশের ব্যাপারে কোনো সুপারিশ করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, কারণ আল্লাহর রসূল (স) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে পর্যন্ত আইনের উর্ধে রাখেননি। নবী করীম (স) অসুস্থ হয়ে পড়লে একদা তিনি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"আমার নিকট কারো কিছু প্রাপ্য থাকলে তা যেনো সে চেয়ে নেয়, কারোর উপর অবিচার করে থাকলে সে যেনো তার প্রতিশোধ আমার উপর নিয়ে নেয়।" একথা শ্রবণ করা মাত্র সাওদা ইবনে কাইস (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন আপনি তখন আপনার উষ্ট্রের উপর আরোহী ছিলেন। আপনার হাতে উট চালানোর চাবুক ছিলো। আপনি চাবুক উর্ধে তুললে তা আমার পেটে লেগেছিলো।

www.pathagar.com

নবী করীম (স) তখন তাঁর পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, "আজ তুমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করো।" তখন সাওদা নবী করীম (স)-এর পিঠে মুখ রাখার অনুমতি নিয়ে বললেন ঃ "আমি রাসূল (স)-এর উপর প্রতিশোধ নেয়ার স্থানের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।"

রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে সাওদা! তুমি প্রতিশোধ নিচ্ছ না ক্ষমা করে দিচ্ছ।" সাওদা বললেন ঃ "আমি বরং ক্ষমা করে দিচ্ছি। এ কারণে নবী করীম (স) বললেন ঃ

"মানুষ চিরুনীর কাটাগুলোর মতোই সমান, মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সর্বতোভাবে সমান।" এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ لا وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط

"তাওরাতে আমরা তাদের প্রতি এ আইন লিখে দিয়েছিলাম যে জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত। এমন সব রকম যখমের জন্য সমান বদলা নির্দিষ্ট।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৫

কুরআনী আইনের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করা হতো না। ধনী, গরীব, রাজা, প্রজা, শক্তিশালী দুর্বল সবাই আইনে সমান কারণ কেউই আইনের উর্ধে নয়। শত্রুতার কারণে বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ গ্রহণ করতে কুরআন নিষেধ করেছে, কারো প্রতি অবিচার করতে বা ন্যায়বিচার না করার জন্য উদ্বুদ্ধ হতে নিষেধ করেছে, তেমনি নবীর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাঁর দাওয়াত কবুল না করে নিজেদের কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করতেও নিষেধ করেছে।

কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ج ـ النساء : ١٣٥

"অতএব তোমরা নিজদের নফসের খাহেশের (প্রবৃত্তির কামনীয়) অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিরত থেকো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫

www.pathagar.com

ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স)-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে আরো ঘোষণা করেছেন ঃ

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط ـ الشورٰ : ١٥

"এবং তোমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।"–সূরা আশ শুরা ঃ ১৫

সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠাকারী ও যে লোক ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার পক্ষের নয় এ দুজনের মধ্যে তুলনা করে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

"সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে।"–সূরা আন নাহল ঃ ৭৬

কুরআনে আরো ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ط ـ النحل : ٩

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও কল্যাণ কামনার আদেশ করেছেন।"–সূরা আন নাহল ঃ ৯

আল্লাহর এ আহবান শাশ্বত। স্থান, কাল, বংশ, বর্ণ, ভাষা ও জাতীয়তা নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিই এ আহবান।

পবিত্র কুরআনে আরো ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ـ النساء : ١٣٥

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাঁড়াও। সে সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে দিতে হলেও।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫

শাসন প্রশাসনে সুবিচারের ব্যাপারে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ

www.pathagar.com

تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○ - النساء : ٥٨

"আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কতো উৎকৃষ্ট ! আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রোষ্টা।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৫৮

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○ - الحج : ٤١

"আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করবে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১

ইসলামী আইনে পক্ষপাতিত্ব বা কোনো ব্যতিক্রম করার কারোরই কোনো অধিকার নেই। ইসলামে আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষকে সমান মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। আইনে সকল মানুষ সমান সমান।

www.pathagar.com

স্থানীয় সরকার

বিশালত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীতে তখনকার দিনে আরব সাম্রাজ্য ছিলো সর্ব বৃহৎ। সে আরব সাম্রাজ্যকে প্রধানত ৫ (পাঁচ) ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—যেমন, যাযাবর অধ্যুষিত অঞ্চল, গ্রাম, বন্দর এবং রাজধানী শহর। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা, সামাজিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থা গড়ে উঠেছিলো। যেহেতু প্রত্যেকের চলাচল ও ব্যবহারের উপর স্থানীয় সরকার গঠিত সেহেতু স্থানীয় সরকারও তাদের সঙ্গে সম্পূরক।

ট্রাইবেল এরিয়া

পুরাকালে ট্রাইবেল এরিয়ার যাতায়াত ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, চাষাবাদ, জমি এবং পানির ব্যবস্থা এক রকমই ছিলো। মধ্যযুগের এসবের পরিবর্তে সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা গড়ে উঠে। তবে তাদের স্থানীয় সরকার ছিলো ঠিক পুরাকালের মতো। কোনো গোত্রকে অন্যগোত্র বা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুরাকালের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। প্রত্যেক পরিবারের পুরুষ লোককে এক একজন সৈন্য হিসাবে ধরা হতো এবং তার মতামত গ্রহণ করা হতো। তাই কোনো ব্যাপারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে প্রত্যেক পুরুষ সদস্যের মতামত গ্রহণ করা হতো। তবে যদি কোন বিষয়ের কম গুরুত্ব থাকতো সে ব্যাপারে বয়োঙ্কদের মজলিশে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হতো। বর্তমান সময়ের মতো সেখানে কোনো সরকার ছিলো না, তবে যে সরকার ছিলো তা ছিলো বর্তমান সরকারের চেয়ে অনেক গণতান্ত্রিক। প্রত্যেক গোত্রে শাসন করার জন্য একজন বয়োজ্যেষ্ঠকে শাসক মনোনীত করা হতো। গোত্রীয় শাসক হতে হলে তাকে বংশগত দিক দিয়ে মর্যাদা সম্পন্ন হতে হতো। বয়সে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গোত্র শাসন করার মতো ক্ষমতার অধিকারী হতে হতো। শাসক তার কাজের জন্য যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে একটা ভাগ পেতেন একে আল মিরবা, আস সাফিয়াহ, আন নাসিতাহ এবং আল ফাদল বলা হতো।

গ্রাম

গ্রামকে রক্ষা করা, গ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনা এবং গ্রাম্য লোকজনদের জানমাল রক্ষা করা, শাসকের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, বালক-বালিকাদের শিক্ষা দেয়া এবং গ্রামের উন্নতি কল্পে বাসস্থান নির্মাণ করা প্রভৃতি হলো স্থানীয় সরকারের মূখ্য কাজ। শাহেদুল আহদাহ অথবা সাহিবুস সুরতাহ, গ্রাম্য

www.pathagar.com

লোকদের রক্ষা করার প্রতি লক্ষ নিতেন এবং তার প্রতিনিধি হয়ে গ্রাম্য প্রধান বা মাতুব্বর জনগণের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করতেন। যেখানে সরকারের উৎস জনগণ সেখানে তাদের উন্নতি না হলে সরকারের উন্নতি আশা করা যায় না।

গ্রাম্য প্রধান (হেডম্যান)

প্রত্যেক গ্রামের মাতুব্বার বা প্রধান ব্যক্তি সরকারের পক্ষে তহশীল আদায় করতেন এবং তা সরকারী ট্রেজারীতে জমা দিতেন। প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি ছিলেন গ্রামের প্রধান। সমাজ ব্যবস্থানুসারে গ্রাম্য প্রধানকে মনোনীত করা হতো। সাধারণ বিষয়ের মীমাংসা তিনি নিজেই করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি ফৌজদারী মামলারও মীমাংসা করতেন। কৃষকগণ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের গোত্রীয় ক্ষমতা গড়ে তুলতেন এবং নিজেদের ভাগ্য ফিরাতে সচেষ্ট হতেন। প্রত্যেক কৃষকের জন্য ভিন্ন জমি থাকতো, সে তা চাষ করতো এবং ফল ভোগ করতো। তবে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কাজেকর্মে তারা প্রত্যেকে সমানভাবে এগিয়ে আসতো।

গ্রাম্য লোকেরা নিজেরা প্রায় সময়ই নিজেদের বিবাদের মীমাংসা করে ফেলতো। তবে প্রত্যেকটি গ্রামের লোকেরা তাদের কাজের জন্য সরকারের কাছে দায়ী থাকতো। গ্রামের যে সকল সংস্থা যেমন গ্রাম্য কাউন্সিল এবং সাধারণের সভা যারা ফৌজদারী, দেওয়ানী, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে মীমাংসা করতো তার প্রত্যেকটি ইউনিটই সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকতো, এবং সরকারের নিকট দায়ী থাকতো।

গ্রাম্য কাউন্সিল

গ্রাম্য কাউন্সিলকে বয়োজ্যেষ্ঠদের কাউন্সিলের সংগে তুলনা করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রাম্য লোকজন প্রায় একই সূত্রে আরবীয় গোত্রের মতো গ্রথিত। গ্রাম্য কাউন্সিলের সদস্য হতে হলে তাকে আর্থিক সচ্ছল, বয়স্ক, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং অন্যান্য বিষয়ে পরিপক্ক ও সচেতন হতে হতো। তাদের মধ্যে নির্বাচন ঠিক পুরাকালের আরবদের মতো হতো। গোত্রের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সদস্য মনোনয়ন করা হতো।

তবে গ্রাম্য কাউন্সিল যেভাবে সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করতো তা বর্তমান সময়ে সম্ভবপর হচ্ছে না। কারণ সে সময় গ্রাম্য কাউন্সিল সকল সদস্যদের মতামত নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনামতো সকল বিষয় স্থির করতেন। কোনো ব্যাপারে সংখ্যাগুরু ও লঘুর প্রশ্ন দেখা দিতো না। গ্রাম্য কাউন্সিল

www.pathagar.com

বিবাহ, কর, তহশীল, সম্প্রদায়গত কলহ, শিক্ষা, জনগণের যত্ন, স্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন, দরিদ্রদের সাহায্য এবং খেলাধুলার আয়োজন প্রভৃতির পর্যালোচনা করে কাজ করতেন। এগুলোর সমাধান কল্পে সদা জাগ্রত থাকতেন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এ ব্যবস্থার ধারধারা হয় না যে জন্য সমাজ আজ বিপর্যস্ত।

গ্রাম্য প্রধান ব্যক্তি ছোট বিষয়েরও নিষ্পত্তি করতেন কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল সমস্যা হলে তিনি এ ব্যাপারে কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কোনো কোনো নিষ্পত্তির ব্যাপারে গ্রাম্য কাউন্সিল খুব অত্যাবশ্যক ছিলো, কারণ এ কাউন্সিলের সদস্যগণ সকলকে জানতো এবং চিনতো। কোনো ঘটনা ঘটলে তারা তা জানতে পারতো এবং এর সত্যতা যাচাই করে সহসা বিবাদ নিষ্পত্তি করতে পারতো। যেহেতু সকলেই তাদের পরিচিত ছিলো সেহেতু তাদের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস পেতো না। গ্রাম্য কাউন্সিল কোনো বিবাদ মীমাংসার জন্য কোনো ফি নিতেন না বা কাউকে কখনো কোনো অর্থ ব্যয় করতে হতো না। তাই ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য জনসাধারণ দলে দলে তাদের দারস্থ হতো।

গ্রামকে রক্ষার্থে প্রত্যেক গ্রাম্য কাউন্সিল দায়ী থাকতো। তবে গ্রাম পাহারা দেয়ার জন্য চৌকিদার নিয়োগ করা হতো। গ্রামের মধ্য দিয়ে কোনো পথিক গেলে গ্রাম্য জনসাধারণকেই তাদের প্রতি লক্ষ রাখতে হতো। আর অন্যদিকে যদি কোনো গ্রাম ভ্রমণকারী বা পথিক তার কিছু হারাতেন বা চোর-ডাকাত যদি তার কিছু অপহরণ করতো তবে গ্রাম্য চৌকিদার বা পুলিশ ব্যক্তি এবং মাতুব্বরকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হতো।

শহর

শহরে সাধারণত (আল মদিনা) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির কাউন্সিল বা দিয়ানুস শুরা দ্বারা শাসিত হতো। উক্ত সভার সদস্য কেবলমাত্র সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো এবং এ সভায় কোনো মনোনীত সদস্য সভাপতি হতেন। শহর কেবলমাত্র দেওয়ানুস শুরা দ্বারা শাসিত হতো এবং তারাই শহরের মঙ্গলার্থে লেভি এবং কর আদায় করতো। পক্ষান্তরে উক্ত করের এক নির্দিষ্টাংশ রাষ্ট্রের উন্নতি কল্পে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হতো। কোনো পার্শ্ববর্তী শহরের সংগে কোনো শহরের কোনো বিষয় নিয়ে বিবাদ বাধলে কেন্দ্রীয় সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করতেন।

প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে আবার প্রত্যেক শহরকে অনেক ওয়ার্ড বা মহল্লায় বিভক্ত করা হতো। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের কাজকর্ম দেখা শুনা করার জন্য তথায় আবার একজন করে ওয়ার্ড বা কাউন্সিলার ছিলো। গ্রাম্য

www.pathagar.com

কাউন্সিলের মতো প্রত্যেকটি ওয়ার্ডার কাউন্সিলার তাদের নিজস্ব কাজ ছাড়াও অন্যান্য কাজের বিশেষ করে রাষ্ট্রের নির্দেশ প্রতিফলন দেখতে চাইতেন।

প্রত্যেকটি শহর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে এমন একটা সুন্দর আধা স্বাধীন ভূখণ্ডের মতো প্রতিষ্ঠা করতো যাতে তাকে ইউরোপের যুক্ত শহরের মতো মনে হতো। প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক শহরে বাণিজ্য দেখাশুনা করার জন্য একটা বাণিজ্যিক সেণ্ডিকেট থাকতো এবং সেই সংস্থা বাণিজ্যিক আদান প্রদান কিভাবে হচ্ছে তা দেখাশুনা করতো। কেবলমাত্র মর্যাদা সম্পন্ন ব্যবসায়ী তার সভাপতি হতো। তাকে রাইসুত তুজার বলা হতো। তার সহকারীদেরকে আমিনস্ বলা হতো।

এভাবে শহরের প্রশাসন, ব্যবসা, সামাজিক আচার ব্যবহারের ব্যাপারে তারা স্বভাবত স্বনির্ভর ছিলো। অন্যদিকে সরকারের অনেক বিষয় যেমন কর আদায়, আইন শৃংখলা, ন্যায় বিচার, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য সকল বিষয় নাগরিকগণ নিজেরাই সরকারের পক্ষ থেকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিতেন।

সমুদ্র বন্দর

আরব দেশে অনেক সমুদ্র বন্দর থাকায় বিদেশের সংগে সহজে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা হতো। বন্দর দিয়ে মালামাল রপ্তানী ও আমদানী করার সময় স্থানীয় সরকার তা তদারক করতেন। মালামাল চলাচলের উপর প্রাদেশিক সরকারও কড়াভাবে নজর রাখতেন, যাতে করে অন্যায়ভাবে কর ফাঁকি দিয়ে কোনো ব্যবসায়ী কোনো মাল আমদানী বা রপ্তানী না করতে পারে। এসব সুষ্ঠুভাবে দেখাশুনা করার জন্য খলিফাগণও বন্দর পরিচালনার জন্য বিশেষ শাসন প্রবর্তন করতেন।

যে সকল বন্দর দিয়ে মাল চলাচল হতো তাদের মধ্যে আদিন, সিরাজ, আল বাসরাহ, দেবল, হোরমুজ প্রসিদ্ধ ছিলো। আফ্রিকা এবং আরবদেশের মধ্যে বাণিজ্য করার জন্য আদিন বন্দর ছিলো শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। অপরপক্ষে ভারত ও চীনের সংগে ছিলো ব্যবসায়ের সম্মেলন কেন্দ্র। অন্যদিকে মিসরের সংগে উক্ত বন্দর নগরী ব্যবসায়ের যোগাযোগও রক্ষা করতো। পারসিয়ান গালফেসিরায় বন্দর অবস্থিত। উক্ত বন্দর দিয়ে পারসিয়ার সকল আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্য উঠানামা করতো। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র বলে আব্বাসীয় খলিফাগণ আমদানী ও রপ্তানী কর হিসাবে প্রতি বছর ২,৫৩,০০০ দিনার পেতেন। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বসরার নদী বন্দরীতে রাত্র বেলা জাহাজ চলাচলের পথ সুগম করার জন্য পথ নির্দেশক হিসাবে বাতির বন্দোবস্ত করেন।

www.pathagar.com

প্রত্যেক বন্দরে একজন গভর্নর অথবা সুপারিনটেনডেন্ট থাকতো। আবার তাদের সংগে কাজ দেখাশুনা করার জন্য অনেক প্রশাসনিক এবং কাষ্টমস অফিসার থাকতো। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তাদের মালের ইনভয়েস অনুসারে কাষ্টমস ট্যাক্স আদায় করা হতো। তবে সন্দেহ না হলে কারো মালামাল পরীক্ষা করে দেখা হতো না। কোনো বিদেশী জাহাজ বা জাহাজীকে যদি চোরা কারবারের দায়ে অভিযুক্ত করা হতো তবে সেজন্য তাদেরকে বেশী উসর দিতে হতো এবং তাদের চোরা কারবারের জন্য দেশের আইনানুসারে কঠিন শাস্তি পেতে হতো। এসব চোরা কারবার বন্ধ করার জন্য খলিফাগণ খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

রাজধানী (আল আমছার)

রাজধানী (আল আমছার) সকল সময় খলিফাদের স্বীয় নিয়ন্ত্রণে থাকতো। মদীনা শহর হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক শাসিত হতো এবং এ ব্যাপারে তাঁর সহকর্মীগণ তাঁকে সাহায্য করতেন। হযরত ওসমান (রা)-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মদীনা ইসলামী খেলাফতের রাজধানী ছিলো। পরবর্তী সময় যদিও উমাইয়া খলিফাগণ দামেস্ক থেকে খেলাফত পরিচালনা করতেন তবে মদীনার মতো দামেস্ক বা বাগদাদের কোনো সৌষ্ঠব ছিলো না। দামেস্ক এবং বাগদাদে খেলাফত স্থানান্তরিত হওয়ার পর উক্ত রাজধানী দ্বয়কে কারুকার্য খচিত করা হয়। এবং বিভিন্ন রাস্তাকে তাদের নামে নামকরণ করা হয়। সরকারী কর্মচারীদের থাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্মাণ করা হয় কিন্তু তাতে মদীনার সেই সৌষ্ঠব ছিলো না। বিভিন্ন এলাকা জুড়ে আবার হাট বাজার, মসজিদ, কবরস্থান গড়ে উঠলো। পুরাকালে ট্রাইবেল লোকদের মধ্যে এসব বিদ্যমান ছিলো। এগুলোকে আবার ওয়ার্ড বলা হতো। সরকারও তাদের সুবিধার জন্য ওয়ার্ডকে রাজকীয় বন্ধন থেকে মুক্ত রাখতেন এবং রাজ দেওয়ারীর থেকেও পৃথক করে রাখতেন। তাতে রাজ বংশের সুবিধা হতো, কারণ এখানে কোনো গণ্ডগোল হলে তাতে রাজধানীর কোনো অসুবিধা হতো না। প্রত্যক্ষভাবে রাজকার্য পরিচালনার জন্য তা সুষ্ঠু ব্যবস্থা বলে প্রতিয়মান হলো। শহরে এ সকল ট্রাইবেল এরিয়ার নিয়ন্ত্রণভার তাদের ছিলো কিন্তু জনসাধারণের কাজে সাহায্য এবং এতিমদের লালনপালনের ভার সরকারের উপর ন্যস্ত থাকতো। শান্তি রক্ষার ভার কেবল পুলিশ বা কেন্দ্রীয় মিলিটারী সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকতো—তারাই এর নিয়ন্ত্রণ করতেন।

যাই বলা হোক না কেনো উমাইয়া খলিফাদের আমলে পূর্বের ট্রাইবেলদের আচার পদ্ধতির মতো কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্র

www.pathagar.com

পরিচালনা হতো। যদিও মদীনা প্রায় ৩৫ বছর কাল আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলো কিন্তু পরবর্তীকালে দামেস্ক প্রায় ৯০ বছর কাল সেই আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলো এবং তৎকালে বাগদাদ পৃথিবীর সংস্কৃতি ও কলা বিভাগের প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। পরবর্তী সময় বাগদাদ নগরী একজন গভর্নর দ্বারা শাসিত হতো যাকে ওয়ালি-উল-বাগদাদ বলা হতো। বাগদাদের পূর্বাঞ্চল আদালতের ইখতিয়ার ভুক্ত ছিলো। আবার এগুলোকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছিলো। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড একজন সরকারী কর্মচারী দ্বারা শাসিত হতো।

এ শহরে আরব ছাড়াও অন্যান্য জাতির লোক বাস করতো এবং তাদের ভিন্ন বাসস্থান ছিলো। প্রত্যেক গোত্রের আবার ভিন্ন মজলিশ, রাইস এবং কাজী ছিলো। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে কেবলমাত্র মজলিশ এবং রাইস দেখাশুনা করতো। রাইস তাদের গোত্রের এবং অন্যান্য জাতীর লোকদের ভালো মন্দের ব্যাপারে সরকারের সংগে বুঝাপড়া করতো। তিনি কেবলমাত্র তার গোত্রের জন্য সরকারের কাছে দায়ী থাকতো। এভাবে আরব সাম্রাজ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

মদীনা চুক্তি (সনদ)

মদীনা চুক্তিটা রাসূল (স)-এর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার নিদর্শন। একটা গৌরবোজ্জল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং এর সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মহানবী (স)-এর অমর কীর্তি—যার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাকে তাঁর স্বদেশবাসী দেশ ত্যাগে বাধ্য করে এবং তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রু বেষ্টিত মক্কা ত্যাগ করে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি মহল্লা সমন্বিত শহরে একটি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মহানবী (স) সর্বাগ্রে গোত্র ও বংশভিত্তিক সমাজব্যবস্থা নির্মূল করে তদস্থলে একটা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃ-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ণ-গোত্র, গোষ্ঠী এবং ভাষা ও আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে এক উম্মাহ ও এক মিল্লাতের প্রতিষ্ঠা করেন। অমুসলিম ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত করেন। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের সম্পর্কে অধিকার ও কর্তব্য চিহ্নিত করেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে 'আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকার' নীতির প্রবর্তন করেন এবং প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের মূলনীতি ও বিধিমালা সুবিন্যস্ত করেন। মোটকথা একটি বিধিবদ্ধ মানব সমাজ সংগঠন, তার উন্নতি, অগ্রগতি ও কল্যাণ-প্রবৃদ্ধির জন্য এতদসংগে একটি উন্নততম ও

www.pathagar.com

মহোত্তম আদর্শ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য সকল পদক্ষেপই তিনি গ্রহণ করেন।

একটা নবীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং এর ভিত্তি সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে মদীনা চুক্তি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নবী করীম (স) যখন মক্কা মুয়াযযামা হতে হিজরত করে মদীনা মুনওয়ারায় শুভাগমন করলেন, তখন কতকগুলো সমস্যার প্রতি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা প্রদেয় নিমিত্ত মনযোগ করেন। যেমন ঃ (১) মুসলমানদের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার সমস্যা ; (২) মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও আর্থসামাজিক বিষয়ে শিক্ষাব্যবস্থা ; (৩) মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন দল-উপদলের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। তৎকালে মদীনার ইহুদীদের দশটি গোত্র এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বারটি উপগোত্র বসবাস করছিলো। আওস ও খাযরাজদের মধ্যে মুসলমানও ছিলো পৌত্তলিকও ছিলো। এতদ্ব্যতীত ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পরস্পরের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। এ যুদ্ধ ইতিহাসে 'বুয়াস' যুদ্ধ নামে পরিচিত। (৪) নগরের রাজনৈতিক সমীকরণ এবং তার নিরাপত্তা প্রতিরক্ষার বিধান।

নবী করীম (স) তাঁর নবুওয়াতী প্রজ্ঞা দ্বারা সার্থকভাবে এ সকল সমস্যার নিম্নরূপ সমাধান করলেন ঃ

১. মুসলমানদেরকে বর্ণ ও গোত্রের ভেদ বৈষম্যের ঊর্ধে এক অনাবিল ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে (মুআখাত) সুসংহত করলেন এবং এমন একটা নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন যার ভিত্তি ছিলো ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ। তিনি এই সমাজটিকে এক আল্লাহ, এক রাসূল, এক কাওম (জাতিসত্তা) ও অভিন্ন জীবন দর্শনে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। (২) মুসলমানদের আত্মিক-আধ্যাত্মিক ও আর্থ-সামাজিক সংস্কার-সংগঠনের ক্ষেত্রে এবং তাদের এককেন্দ্রিক করার উদ্দেশ্যে মসজিদ-ই-নববী নির্মাণ করলেন এবং একে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, শিক্ষা-দীক্ষা ও বিচারব্যবস্থাসহ যাবতীয় কর্ম-তৎপরতার কেন্দ্র ও অক্ষে পরিণত করলেন। (৩ ও ৪) মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী ও দল-উপদলের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কর্তব্য ও সঠিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত ও বিধিবদ্ধ করার লক্ষে এমন একটা লিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদিত করলেন, যা ইতিহাসে মদীনা চুক্তি নামে প্রসিদ্ধ। এ চুক্তিটা ছিলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামী চিন্তাবোধের অগ্রপথিক।

ডঃ মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ তাঁর গবেষণামূলোক 'The first written Constitution in the World' গ্রন্থে ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে

www.pathagar.com

প্রমাণিত করেছেন যে, মদীনা চুক্তি-ই পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান যা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনাধিপতি নিজেই প্রবর্তন করেছিলেন। প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র ও উৎস হতে মদীনা চুক্তির বিশদ বিবরণ অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো ঃ (১) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, সীরাতুন-নবী (তার ফারসী ও ইংরেজী অনুবাদ বিদ্যমান); (২) ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ; (৩) আবু উবায়াদ আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম, কিতাবুল-আম্ওয়াল এবং (৪) আবুল-ফিদা ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া।

ইবনে সা'দ, আল-বালাযুরী, ইবনে জারীর, আত-তাবারী, ইব্নে খালদূন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই চুক্তির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ না করলেও তাঁরা সকলেই তার উল্লেখ করেছেন। হাদীস গ্রন্থসমূহেও এ চুক্তির অল্প-বিস্তর আলোচনা রয়েছে। আয্-যারকানী, আল মাক্রীযী ও লিসানুল-আরাব-এর গ্রন্থকার ইব্নে মান্জুরও মদীনা চুক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন।

পরবর্তী ও আধুনিক উৎসসমূহের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো ঃ

১. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, আল ওয়াসাইকুস-সিয়াসিয়্যা ('সিয়াসী ওয়াসী-কাহ্জাত' নামে যার উর্দূ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে !) (২) ঐ লেখক, আহ্দ-ই-নাবাবী মেঁ নিজাম-ই হুকুমরানী! (৩) ঐ লেখক, The First Written Constitution in the World. লাহোর ১৯৭৫ খৃঃ (৪) Leon Ceatani Annali! (৫) Wellhausen, Gemeni deardang Von Srizzen and vordrbaten Medina! (৬) মানটোগামারী ওয়াট, Muhammad at Medina ! (৭) মাজীদ খাদ্দুরী, The Law of War and peace in Islam. লণ্ডন ! (৮) লেভী Social Structure of Islam ; (৯) কাযী মুহাম্মদ সুলাইমান সালমান মানসুরপূরী রাহমাতুললিল আলামিন (১০) সায়্যিদ আমীর আলী, The Sprit of Islam. এ চুক্তিটির প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহাতীত। কোনো কোনো লেখকের অভিযোগ হলো, এ চুক্তির বর্ণনা প্রসংগে মুহাম্মদ ইব্নে ইসহাক তাঁর পূর্ববর্তী রাবীগণের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু এ অমূলক সন্দেহ বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা রহিত হয়ে যায়। আবু উবায়াদ আল কাসিম ইবনে সাল্লাম এর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা সর্বজন স্বীকৃত এবং তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞ আলেম, তিনি এ চুক্তিপত্রটা ইবনে শিহাব-এর সনদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেন ঃ "হযরত নবী করীম (স)-এর আহ্দনামাহ (চুক্তিপত্র), যা তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভাগমনের পরে ঈমানদারগণ ও মদীনাবাসীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যাতে

www.pathagar.com

মদীনার ইহুদীদের সংগে শান্তি ও নিরাপত্তার অংগীকার ছিলো"..... ইবনে শিহাব (র) বলেন ঃ আমার নিকট এ রিওয়ায়াত পৌছিয়েছে যে, "রাসূলুল্লাহ (স) এ চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করেছিলেন।"..... এ চুক্তিপত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ দফা এই যে, বানূ আওফ-এর ইহুদীগণ নিজেরা এবং তাদের সকল মিত্রপক্ষ ও মাওয়ালী (আযাদকৃত গোলাম) সহকারে মুসলমানদের সাথে একটি উম্মাত বিবেচিত হবে।.... এর ব্যাখ্যা প্রদান করে আবু উবায়দ (র) পরবর্তী সময়ের মুহাদ্দিসগণের ভিত্তিহীন সন্দেহের নিরসন করে গিয়েছেন। এ মনীষী বলেন ঃ চুক্তিপত্রের এ দিকটির উদ্দেশ্য হলো ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চুক্তির শর্ত অনুসারে অর্থ-সম্পদ দ্বারা মুসলমানগণের সাহায্য করতে থাকবে। চুক্তিটির উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, ধর্মীয় বিষয়াদির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই কেননা রাসূলুল্লাহ (স) পূর্বে ঘোষণা করেছেন যে, ইহুদীরা তাদের ধর্ম পালন করতে থাকবে এবং ঈমানদারগণ তাদের দীন মেনে চলবে। আল মাকরীযী বর্ণনা করেন, এ লিখিত সনদটি হযরত নবী করীম (স)-এর তরবারির সাথে সংলগ্ন থাকতো। হযরত নবী (স)-এর পরে এ তরবারিটি হযরত আলী (রা) লাভ করেছিলেন। হযরত আলী (রা) এ সনদের অংশসমূহ কুফার লোকদেরকে পাঠ করে শুনিয়েছেন।

এ চুক্তিটির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে অন্যান্য যুক্তি হলো তার সমগ্র বিষয়বস্তু ও প্রত্যেকটি দফাই যে ইসলামী নীতি, আদর্শ ও সুবিন্যস্ত শিক্ষার সাথে পূর্ণ সামাঞ্জস্যশীল ; এর ভাষা ও বর্ণনার ধারা হতে রীতিমত নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে, তা একজন রচনা এবং পরবর্তী যুগের এবং বর্তমান সময়ের মুসলিম মনীষীদের প্রায় সকলেই এবং প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদগণ তার প্রামাণ্যতা স্বীকার করছেন।

চুক্তি সম্পাদনের সময়কাল ঃ এ চুক্তিটি সম্পাদনের তারিখ ও সময় সম্পর্কে প্রথম যুগের ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণের অভিমতে কোনো উল্লেখযোগ্য মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় না। প্রায় সকলেই একে মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরের এবং পূর্বেকার চুক্তি সাব্যস্ত করছেন। এ প্রসংগে ইমাম আবু উবায়দের অভিমত সর্বাধিক যুক্তিপূর্ণ প্রতিভাত হয়। তাঁর ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ "আমাদের মতে এ চুক্তিটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় শুভাগমনের প্রাথমিক সময়ে সম্পাদন করা হয়েছিলো। তা ছিলো এমন সময়, যখন ইসলাম প্রবল শক্তিরূপে প্রাধান্য লাভ করেনি এবং তখন আহল-ই-কিতাব (ইয়াহুদী-খৃস্টান)-দের নিকট হতে জিযিয়া গ্রহণের বিধানও জারী হয়নি। তৎকালে মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় তিনটি উপদলে বিভক্ত ছিলো যেমন ঃ বানূ কায়নুকা, বানূ নাযীর ও বানূ কুরায়জা।"

www.pathagar.com

আধুনিক যুগের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিও মদীনা চুক্তির সময়কাল সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন। Wellhausen ও Ceatani একে বদর যুদ্ধের পূর্বেকার চুক্তিপত্র সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপ মাজীদ খাদ্দূরীও দৃঢ়তার সাথে একে যুদ্ধের পূর্ববর্তী সনদ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ডঃ মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ এ চুক্তিপত্রটিকে দুই অংশে বিভক্ত করে এ অভিমত ব্যক্ত করছেন যে, তার প্রথম অংশটি বদর যুদ্ধের পূর্বেকার এবং তার দ্বিতীয় অংশটি বদর যুদ্ধের পরবর্তীকালের। তিনি তাঁর এ বক্তব্যের অনুকূলে কিছু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করলেও প্রাচীন সূত্রসমূহের কোনো স্পষ্ট বরাত উল্লেখ করেননি। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণাদি হতে প্রতীয়মান হয় যে, এ চুক্তিটি পূর্ণাংগরূপে বদর যুদ্ধের পূর্বেই সম্পাদিত হয়েছিলো। এ চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ইহুদী পক্ষ ছিলো বনূ কায়নুকা—যাদেরকে এ চুক্তির বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে বদর যুদ্ধের পরবর্তী একমাসের মধ্যেই মদীনা হতে নির্বাসিত করা হয়েছিলো। এ ঘটনাটি ইব্নে ইসহাক এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"বানূ কায়নুকাই প্রথম ইহুদী দল, যারা রাসূলুল্লাহ (স) ও তাদের মধ্যকার (চুক্তি) বিষয়টি ভংগ করলো এবং বদর ও ওহুদের মধ্যবর্তী সময়ে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হলো।" ইব্নে সা'দও অনুরূপ বিবরণ প্রদান করেছেন। এ বর্ণনা এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দেয় যে, নবী করীম (স) সকল ইহুদীর সাথে এবং সেহেতু তাদের অন্যতম গোত্র বানূ কায়নুকার সাথেও বদর যুদ্ধের আগেই এ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। প্রশ্ন হতে পারে যে, চুক্তিপত্রের মূল পাঠে যথারীতি বানূ কায়নুকা, বানূ নাযীর ও বানূ কুরায়জার নাম স্পষ্ট করে উল্লেখিত হয়নি, এর কারণ হলো, এ গোত্রদ্বয়কে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের পুরাতন মিত্র হিসাবে চুক্তিতে শরীক করা হয়েছিলো। আওস ও খাযরাজের সাথে এ তিনটি ইহুদী গোত্রের দীর্ঘকালের মিত্রতা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণীত। ইব্নে হিশামের নিম্নোক্ত ভাষ্য উপরিউক্ত গোত্রসমূহের বিদ্যমান মিত্রচুক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করে ঃ

"ফলে যখনই আওস ও খাযরাজের লড়াই বেধে যেতো, তখন বানূ কায়নুকা খাযরাজদের পক্ষ অবলম্বন করতো এবং বানূ নাযীর ও বানূ কুরায়জা আওসদের সহায়তায় এগিয়ে আসতো এবং এ উভয় দলের প্রত্যেকেই নিজেদের (স্বগোত্রীয়) ভাইদের বিপক্ষে (চুক্তিবদ্ধ) মিত্রদের সাহায্য-সহায়তা প্রদান করতো।"

মদীনা চুক্তির মূল পাঠ ঃ ইবনে হিশাম (সীরাত) ও আবু উবায়দ (কিতাবুল আমওয়ালে) উদ্ধৃত মদীনা চুক্তির পাঠ ছোট-বড় মিলিয়ে অনেকগুলো বাক্য

www.pathagar.com

সমষ্টি। আধুনিক যুগের অধিকাংশ লেখক এ বাক্যগুলোকে শাসনতান্ত্রিক ধারাসমূহের আকৃতিতে উত্থাপন করেছেন। ওয়েল হাউসেন এ সনদটিকে ৪৭টি ধারায় বিভক্ত করে বিন্যস্ত করেছেন পাশ্চাত্যের ইতিহাসবেত্তাগণের অধিকাংশই তাঁর অনুসরণ করেছেন। পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে এ নিবন্ধে ধারা সংখ্যা ৪৭-এ সীমিত রেখে কয়েকটি বৃহৎ ধারাকে ক.ও খ. এ দুই অংশে বিভক্ত করা হয়েছে।

চুক্তিপত্রটি স্পষ্টতই দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ২৩টি ধারা এবং দ্বিতীয় অংশে ২৪টি। প্রথম অংশ মুসলিমদের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ চিহ্নিত করে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে মুসলিম এবং ইহুদী ও অন্যান্য মদীনাবাসীর পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের স্পষ্ট বিধান।

প্রবন্ধকারের দৃষ্টিতে যেহেতু ইমাম আবু উবায়দ আল কাসিম ইব্নে সাল্লামের উদ্ধৃত মতন (পাঠ) সর্বাধিক প্রামাণ্য, নিম্নে তাই (অনুবাদ) উদ্ধৃত করা হলো। অবশ্য ইব্নে হিশাম প্রদত্ত পাঠ—যা কোথাও কোথাও পূর্বোক্ত বর্ণনা হতে ভিন্নতা প্রকাশ করে, তা প্রথম বন্ধনীর মাঝে সংযোজিত করা হয়েছে।

১. এটা নবী ও আল্লাহর রাসূল (স)-এর অংগীকার পত্র—যা কুরাইশ ও মদীনার মুসলিমদের মধ্যে এবং সেই সকল লোকের মধ্যে, যারা মুসলিমদের অনুসরণ করে তাদের সাথে এমনভাবে মিলেমিশে থাকবে যে, তাদের সংগে একত্রিত হয়ে জিহাদ করবে—এদের মধ্যে স্থিরীকৃত হলো।

২. উপরোক্ত জনসমষ্টি অন্যান্য লোকদের হতে স্বতন্ত্র একটা উম্মাতে পরিণত হবে।

৩. কুরাইশ মুহাজিরগণ তাদের গোত্র বিধান অনুসারে পরস্পর নিজেদের দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করবে ; অনুরূপ তারা নিজেদের বন্দীদের মুক্তি মু'মিন ও মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে এবং ইনসাফের সাথে আদায় করবে।

৪. বানূ আওফ তাদের গোত্রীয় বিধি-ব্যবস্থায় নিজেদের পূর্বেকার দিয়াতসমূহ আদায় করবে (এবং তাদের সকল উপগোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত বিধি এবং ইনসাফের সাথে মুক্তিপণ [ফিদিয়া] প্রদান করবে)

৫. বানূল হারিস (ইবনে খাযরাজ) নিজেদের বিধি অনুসারে নিজেদের পুরাতন দিয়াতসমূহ প্রদান করবে এবং তাদের প্রত্যেকটি উপগোত্র নিজেদের

www.pathagar.com

বন্দীদের মুক্তিপণ মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত বিধির অধীনে ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে আদায় করবে।

৬. বানূ সাঈদ ;

৭. বানূ জুসাম ;

৮. বানূ নাজ্জার ;

৯. বানূ আমর ইবনে আওফ ;

১০ বানূ নাবীত এবং

১১. বানূ আওস (সকলেই) নিজ নিজ ব্যবস্থা অনুসারে নিজেদের (পুরাতন) দিয়াতসমূহ প্রদান করবে এবং এদের প্রত্যেক গোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ মুসলিমদের প্রচলিত বিধি-বিধানের আওতায় প্রদান করবে। (শেষের বাক্যটি প্রতিটি গোত্রের নামের সংগে পুনরুক্তি করা হয়েছে)

১২. ঈমানদারগণ নিজেদের মধ্যকার ঋণভারে জর্জরিত কোনো ব্যক্তিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখবে না ; বরং মুক্তিপণ, রক্তপণ (দিয়াত) ও জরিমানা আদায়ের ব্যাপারে যথারীতি তাকে সাহায্য-সহায়তা প্রদান করবে এবং কোনো ঈমানদার অন্য কোনো ঈমানদারকে এড়িয়ে তার মাওলা গোলামের সাথে মিত্রতাবদ্ধ হবে না।

১৩. এবং তাকওয়ার অনুসারিগণ ঐক্যবদ্ধভাবে এমন প্রতিটি ব্যক্তির বিরোধিতা করবে—যারা তাদের মধ্যে জুলুম, পাপ, বাড়াবাড়ি, অবাধ্যতা, বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের কারণ হতে পারে। তারা সকলে একত্রে এ প্রকৃতির ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদিও সেই অনাচারী ব্যক্তি তাদের কারো সন্তানই হোক না কেন।

১৪. কোনো মু'মিন কোনো কাফির-এর বিনিময়ে অন্য কোনো মু'মিনকে হত্যা করবে না এবং কোনো মু'মিন বিপক্ষে সে কোনো কাফিরের সহায়তা করবে না।

১৫. সকল মুসলিম পরস্পর একে অপরের সাহায্যকারী ও সহকর্মী হবে।

১৬. ইহুদীদের মধ্য হতে যারাই আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিবে, তাদের সাথে যথারীতি বিধিসম্মত আচরণ, ইনসাফ ও সমতার ভিত্তিতে আচরণের বিধান করা হলো। তাদের উপরে জুলুম করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য-সহায়তা প্রদান করা হবে না।

১৭. মুসলিমদের সন্ধি সমভাবে ও সমপর্যায়ের গুরুত্বসম্পন্ন। কোনো মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের কালে মুসলমানদের হতে পৃথক হয়ে কারো সাথে সন্ধি করবে না। মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়নীতি অক্ষুণ্ন রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

www.pathagar.com

১৮. সকল গাজী দলের সদস্য নিজেদের মধ্যে একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হবে।

১৯. তাকওয়া অবলম্বনকারী মুসলিমগণ এই অংগীকারের শর্তাবলী কার্যত বাস্তবায়িত করতে থাকবেন।

২০. কোনো মুশরিক (ইহুদী) কোনো কুরাইশী কাফিরের সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবে না এবং কোনো মুসলমানের বিপক্ষে কুরাইশীদের সে সাহায্যও করবে না।

২১. যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, তাকে নিহতের বিনিময় হত্যা করা হবে, যদি না নিহত ব্যক্তির অভিভাবক তার বিনিময়ে রক্তপণ (দিয়াত) গ্রহণে সম্মত হয়ে যায়। ঈমানদার সকলেই হত্যাকারীর বিরুদ্ধে থাকবে।

২২. কোনো মু'মিনের পক্ষে যে এ চুক্তি মেনে চলার অংগীকার করেছে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, ইহা বৈধ হবে না যে, সে কোনো আইন ভংগকারীকে সহায়তা কিংবা আশ্রয় প্রদান করবে। যে ব্যক্তি এ ধরনের অপরাধীকে সাহায্য-সহায়তা করবে কিংবা আশ্রয় প্রদান করবে, সে ব্যক্তির উপরে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার লা'নত ও গযব হবে। তার নিকট হতে কোনো প্রকার বিনিময় বা মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না।

২৩. তোমরা যখনই কোনো ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করবে, তখনই তার ফায়সালার জন্য মহান আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর শরণাপন্ন হবে।

উপরিউক্তি ধারাসমূহ ছিলো মুসলমানদের পারস্পরিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত। নিম্নে উল্লেখিত ধারাসমূহ অমুসলিম গোত্রসমূহের সাথে সম্পর্কের প্রকৃতি বিবৃত করে ঃ

২৪. মুসলমানগণের যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহে ইহুদীরা অংশগ্রহণ করবে।

২৫. বানূ আওফ-এর ইহুদীরা নিজেরা, তাদের মিত্রবর্গ ও মাওলা (আযাদকৃত গোলাম)-দের সহকারে মুসলমানদের সাথে একপক্ষ ও একদল সাব্যস্ত হবে। ইহুদীরা নিজেদের ধর্ম পালন করতে থাকবে এবং মুসলিমগণ নিজেদের ধর্ম। তবে যে কেহই জুলুম ও পাপ করবে, সে নিজেকে এবং পরিবারকে বিপদগ্রস্ত করবে।

২৬. বানূ নাজ্জার ;

২৭ বানূ হারিস ;

www.pathagar.com

২৮. বানূ সাইদা ;

২৯. বানূ জুশাম ;

৩০. বানূ আওস ও

৩১. বানূ সালাবার অন্তর্গত ইহুদীদের জন্যও অনুরূপ সবকিছু (অধিকার ও কর্তব্য) সাব্যস্ত হবে যা বানূ আওফ (ইহুদী)-দের জন্য রয়েছে। শেষের বাক্যটি প্রত্যেক গোত্রের নামের সাথে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাদের মধ্য হতে যে কেহই অত্যাচার, সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করবে, সে নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করবে।

৩২. বানূ সা'লবার শাখা বানূ জাফনাও বানূ সা'লাবার অনুরূপ গণ্য হবে।

৩৩. বানূ শুতায়বা-এর জন্য সেই সকল (সুবিধাদি) সাব্যস্ত হলো যা বানু আওফ-এর ইহুদীদের জন্য রয়েছে পুণ্য। সর্বদা পাপ হতে পৃথক থাকবে।

৩৪. বানূ সালাবার মাওলা ও মিত্ররাও অধিকার ও কর্তব্য ক্ষেত্রে তাদের অনুরূপ হবে।

৩৫. ইহুদীদের যে কোনো শাখাগোত্র তাদেরই সমতুল্য হবে।

৩৬-ক. উপরিউক্তি গোত্রসমূহের কোনো ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে মদীনা হতে বহির্গমন করতে চুক্তির বর্হিভূত হতে পারবে না।

৩৬-খ. কোনো ব্যক্তি যখন আঘাত (জারহা)-এর প্রতি বিনিময় গ্রহণে প্রতিবন্ধক হবে না এবং যে কেউ কেউকে হত্যা করবে, সে নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে ধ্বংস করবে ;

৩৭-ক. মুসলমানদের উপরে ধার্য তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে এবং ইহুদীদের উপরে ধার্য তাদের নিজেদের ব্যয় নির্বাহে বাধ্য থাকবে। যারা এ চুক্তির পক্ষগুলোর কোনো একটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, চুক্তিবদ্ধ সকল সহযোগী তাদের (আক্রমণকারীর) প্রতিরোধে পরস্পরে একে অন্যের সাহায্য-সহায়তা করবে।

৩৭-খ. তারা (চুক্তির পক্ষসমূহ) পরস্পর একে অন্যের কল্যাণকামী থাকবে এবং সর্বাবস্থায় মজলুমের সাহায্য করবে।

৩৮. এবং ইহুদীরা যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের সংগে থাকবে, ততদিন নিজেদের (অংশের) খরচপাতি বহন করবে।

৩৯. এ চুক্তি সম্পাদনকারীদের জন্য মদীনার পরিসীমার আভ্যন্তরীন অঞ্চল হারাম (পবিত্র ও সংরক্ষিত এলাকা)-এর মর্যাদা লাভ করবে।

www.pathagar.com

৪০. এবং প্রতিবেশীরা প্রত্যেকের নিজের সমতুল্য পরিগণিত হবে। তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করা যাবে না ; তাদের উপর অবিচার করাও যাবে না।

৪১. এবং কারো রক্ষণাবেক্ষণের অধীন বিষয় (ব্যক্তি)-কে তার অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় প্রদান করা হবে না।

৪২. এ চুক্তি সম্পাদনকারীদের অভ্যন্তরে যদি কোনো নূতন সমস্যার উদ্ভব হয় কিংবা আইন ভঙ্গের কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়, যাতে ফিত্না-ফাসাদ ও ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে তার মীমাংসার জন্য আল্লাহ এবং (আল্লাহর রাসূল) মুহাম্মাদ (স)-এর সমীপে উপস্থিত করতে হবে। [এবং আল্লাহ তাআলা এ সহীফায় (চুক্তিপত্রে) সন্নিবেশিত সৎকর্ম ও তাকওয়ার বিষয়সমূহের জন্য সাক্ষী থাকলেন]।

৪৩. কুরাইশ (কাফির) ও তাদের সাহায্যকারীদেরকে কেউই আশ্রয় দিবে না।

৪৪. এবং কেউ ইয়াসরিব (মদীনা মুনাওয়ারা) আক্রমণ করলে এ চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষসমূহ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তার মুকাবিলা করবে।

৪৫-ক. মুসলমানদের পক্ষ হতে কেউ স্বীয় মিত্রপক্ষের সাথে সন্ধি করার জন্য ইহুদীদের আহবান করলে ইহুদীরা তার সাথে সন্ধি সম্পাদন করবে। অনুরূপভাবে যদি তারা (ইহুদীরা)-ও আমাদেরকে অনুরূপই সন্ধি সম্পাদনের আহ্বান জানায়, তবে মুসলমানগণও সেই আহ্বানে সাড়া দিবে—এ শর্তে যে, সেই দলটি ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নহে।

৪৫-খ. ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সকল মানুষ নিজ নিজ অংশের জিম্মাদার থাকবে।

৪৬. আওস গোত্রের অন্তর্গত ইহুদীরা নিজেরা এবং তাদের সমর্থক ও মিত্ররা উত্তম ও সুষ্ঠু সুচারুরূপে এ চুক্তিপত্র বাস্তবায়নকারীদের সংগে থাকবে। পাপের পরিমণ্ডলের বিপরীত দিক হচ্ছে পুণ্য ও অংগিকার রক্ষা। প্রত্যেক কর্ম সম্পাদনকারী স্বীয় কৃতকর্মের দায়িত্ব বহন করবে। অবিচারকারী নিজের উপরই অবিচার করবে। সততা ও নিষ্ঠার সাথে এ চুক্তির অনুসারিগণের জন্য আল্লাহ মদদগার হবেন।

৪৭. এ চুক্তি জালিম ও পাপীকে তার অসৎকর্মের পরিণাম হতে রক্ষা করে না। যে ব্যক্তি (মদীনা হতে) বাহিরে চলে যাবে, সেও নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি (মদীনায়) অবস্থান করবে, সেও নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু

www.pathagar.com

যেই ব্যক্তি জুলুম ও গুনাহ করবে, সে নিরাপদ থাকবে না। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) নেককার ও মুত্তাকী লোকদের সহায় ও সংরক্ষণকারী ।

মদীনা সনদের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা ঃ গভীর দৃষ্টিতে মদীনা সনদের ধারাসমূহ পর্যালোচনা করলে এ চুক্তিটির গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো অবহিত হওয়া যায়, তা নিম্নরূপ ঃ

১. এ চুক্তির ফলে মদীনা নগর রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হলো নবী করীম (স)-কে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় পক্ষের তরফ হতে এ নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান স্বীকার করে নেয়া হলো। এভাবে মহানবী (স) একটা আন্তর্জাতিক সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন।

২. উইলিয়াম মূর-এর বক্তব্য অনুসারে এ চুক্তির কল্যাণে নবী করীম (স) একজন মহান পরিকল্পনাবিদ ও পরিচালকরূপে ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায় বহুধা বিভক্ত, আদর্শ-বিশ্বাসে বিভিন্নমুখী ও পরস্পর হতে চরম বিচ্ছিন্ন একটা জনগোষ্ঠীকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করার সুকঠিন কাজটি শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের ন্যায় পরম দক্ষতার সাথে সুচারুভাবে সম্পাদিত করলেন। রাসূল (স) এমন একটা রাষ্ট্র এবং এমন একটা জনসমাজ প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করলেন, যা ছিলো আন্তর্জাতিক রীতিনীতির ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

৩. এ চুক্তির ফলে নবী করীম (স) আইন, বিচার, প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ নিজের ও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করে নিলেন।

৪. নবী করীম (স) রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যবোধ সংযোজিত করলেন। ক্ষমতার মূল উৎস আল্লাহ তা'আলার জন্য স্থির করে নিজে নবী ও রাসূলরূপে আল্লাহ তা'আলার নায়েব-এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন।

৫. নাগরিক অধিকার রাষ্ট্রের সংগঠন, রাজনৈতিক উদারতা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং সুনিপুণ কর্মকুশলতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে এ ঐতিহাসিক চুক্তিতে।

৬. এ চুক্তির বলেই ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি সুনির্ধারিত হলো এবং সেই সাথে অমুসলমানদের সাথে ঐক্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহও নির্ণীত হলো।

৭. এ চুক্তিপত্র মুসলমানদের পারস্পরিক কর্তব্য, অধিকার এবং সকল নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্যসমূহও নির্ধারিত হলো।

www.pathagar.com

৮. এ চুক্তিই জুলুম, বৈষম্য, অবিচার এবং এ প্রকৃতির অন্যান্য গর্হিত বিষয়গুলোর দ্বার রুদ্ধ করে দিলো। আরববাসীদের ব্যক্তিগতভাবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রাচীন পন্থার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বিষয়টিকে একটা সম্মিলিত কর্তব্যরূপে সাব্যস্ত করা হলো। দুর্বল, অসহায় ও মজলুমদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহায়তা দানের পরিপূর্ণ গুরুত্ব প্রদানও এ চুক্তিরই অবদান।

৯. যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন পরিস্থিতির কর্মনীতি স্থিরীকৃত হলো।

১০. এ চুক্তি মুশরিক কুরাইশের বিরুদ্ধে একটা সম্মিলিত ঐক্যজোটের রূপ পরিগ্রহ করলো এবং মদীনায় ইসলামের দুশমনদের প্রবেশাধিকার রহিত করা হলো।

১১.মদীনাকে হারাম (পবিত্র ভূমি) সাব্যস্ত করা হলো এবং এভাবে এ নতুন নগর রাষ্ট্রটির মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। সে সংগে তার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষারও যথোচিত ব্যবস্থা গৃহীত হলো।

১২. গোত্রসমূহের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের অবসানও এ চুক্তির ফলে সম্ভব হলো।

১৩. এ চুক্তিই ইসলামের প্রধান শত্রু মক্কার কুরাইশগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যান্য গোত্রকে উত্তেজিত করা হতে বিরত রাখে।

১৪. এ চুক্তি নাগরিকদের আইন, ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে অনুপ্রাণিত করে।

১৫. এ চুক্তিই আল্লাহ তা'আলার হুকুমসমূহ এবং নবী করীম (স)-এর সিদ্ধান্তসমূহকে অলংঘনীয় আইনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলো।

১৬. এ চুক্তির ফলে এবং নবী (স)-এর প্রবর্তিত ব্যবস্থাসমূহের ফলেই একটা শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র এবং একটা কল্যাণধর্মী সমাজ আত্মপ্রকাশ করলো।

❐

www.pathagar.com

হুদায়বিয়ার সন্ধি

আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠাকল্পে হযরত মুহাম্মাদ (স) ও মুহাজেরগণ পবিত্র মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন। দীর্ঘ ছয় বছর অতিবাহিত হবার পর আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মাদ (স) মাতৃভূমি দর্শন, তৌহিদ প্রচার ও হজ্জ সমাধা করার নিমিত্ত ৬২৮ খৃস্টাব্দে মক্কা গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং আরবের প্রথানুযায়ী পবিত্র জিলকদ মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ বিধায় হযরত মুহাম্মাদ (স) ঐ মাসে ১৪০০ (চৌদ্দশত) সাহাবী সমভিব্যাহারে পবিত্র ওমরা ও হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে মক্কা রওয়ানা করেন। কুরবানীর জন্য ৭০টি উটও সঙ্গে নিলেন। যেহেতু হজ্জব্রত পালন করার জন্য চরম শত্রুকেও সুযোগ দেয়া হয়, তাই হযরত মুহাম্মাদ (স) বাধাপ্রাপ্ত হবেন না ভেবে মক্কার দিকে অগ্রসর হন। তাঁদের আগমনের সংবাদ জানতে পেরে কুরাইশগণ মুসলমানদের আগমন প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে খালিদ ও ইকরামার নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। মক্কার খোজা সম্প্রদায়ের বুদাইকের কাছে কুরাইশদের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে মহানবী (স) মক্কার উপকণ্ঠে ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে এক ঝর্ণার নিকট শিবির স্থাপন করেন। তিনি বুদাইল মারফত কুরাইশগণকে জানতে দিলেন যে, তারা শুধু হজ্জ করার নিমিত্ত মক্কায় এসেছেন, যুদ্ধ করে মক্কা দখল করার জন্য নয়। তারা হযরত (স)-এর সততায় বিশ্বাস স্থাপন করে আবওয়া বিন মাসুদকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মহানবী (স)-এর নিকট পাঠান কিন্তু আবওয়ার দুর্ব্যবহারের জন্য আলোচনা ব্যর্থ হয়। কিন্তু হযরত (স) কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করার জন্য প্রথমে খোরাস এবং পরে হযরত ওসমান (রা)-কে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশ নেতাদের নিকট পাঠান হযরত ওসমান (রা)-কে তারা আটক করে রাখেন এবং তাকে হত্যা করেছেন বলে জনরব উঠলে নবী করীম (স)-এর সঙ্গীগণ হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে বায়আত নিলেন—একে 'বায় আতুর রিজওয়ান' বলা হয়। এ শপথ একটা গাছের নিচে গ্রহণ করা হয়েছে বলে একে "বায়আতুস শাজারা"ও বলা হয়। মুসলমানদের শপথের ঘোষণা প্রচারিত হয়ে পড়লে কুরাইশগণ ভয়ে হযরত ওসমান (রা)-কে মুক্তি দেন এবং সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে সুহাইলকে পাঠান। হযরত (স) সানন্দে এ শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অনেক যুক্তি-

www.pathagar.com

তর্কের পর যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এটাই ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান শর্তাবলী ছিলো নিম্নরূপ ঃ

(১) ৬২৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ হজ্জ সম্পাদন না করেই মদীনা প্রত্যাবর্তন করবেন।

(২) কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে আগামী ১০ বছর যে কোনো প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে।

(৩) মুসলমানগণ ইচ্ছা করলে ৬২৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পরের বছর তিন দিনের জন্য মক্কায় হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করতে পারবেন। মক্কায় মুসলমানদের অবস্থানকালে কুরাইশগণ মক্কা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিবেন।

(৪) মক্কায় আগমনকালে কেবল আত্মরক্ষার নিমিত্তে কোষবদ্ধ তরবারী ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না।

(৫) আরবের যে কোনো গোত্রের লোক হযরত (স) অথবা কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে কোনো বাধানিষেধ থাকবে না।

(৬) চুক্তির মেয়াদকালে জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং একে অন্যের কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কোনো প্রকার লুণ্ঠন অথবা আক্রমণ চলবে না।

(৭) কোনো মক্কাবাসী মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে মদীনার মুসলমানগণ তাকে বা তাদেরকে আশ্রয় দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে কোনো মুসলমান মদীনা হতে মক্কায় আগমন করলে মক্কাবাসী তাকে প্রর্ত্যপণ করতে বাধ্য থাকবে না।

(৮) হজ্জের সময় মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। এবং মক্কার বণিকগণ নির্বিঘ্নে মদীনার পথ ধরে সিরিয়া মিসর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।

(৯) মক্কার কোনো নাবালক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের দলে যোগ দিতে পারবে না। করলে তাকে ফেরত দিতে হবে।

(১০) সন্ধির শর্তাবলী উভয় পক্ষকে পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিভার পরিচায়ক। এ সন্ধিকে কুরআন শরীফে ফাতহুম মুবিন বা মহাবিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। অত্যাচারিত ও ষড়যন্ত্রকারী স্বীয় গোত্রের লোকেরা একই চুক্তিতে হযরত (স)-এর সাথে স্বাক্ষর করে

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে তাঁকে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ (রাসূলুল্লাহ) এবং একটা নব মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠারূপে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি পরোক্ষভাবে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করে। কুরাইশগণ মুসলমানদের মক্কা পরিদর্শন করতে ওমরাহ্ পালন ও হজ্জ সমাপনে সম্মতি প্রদান করে প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে একটা নব শক্তিরূপে স্বীকৃতি দান করে এবং এর ফলে মক্কার পবিত্র কাবা শরীফের উপর তাদের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মুসলমানগণ একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের শাসক ও শাসন শক্তিরূপে লিখিতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ সন্ধির ফলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইবনে হিশাম-এর মতে "হযরত মুহাম্মাদ (স) যেখানে ১৪০০ লোক নিয়ে হুদায়বিয়ায় গিয়েছিলেন, সেখানে দুই বছর পর ১০,০০০ হাজার মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে মক্কা আক্রমণ করেন।" লেখক জোহরী বলেন, "পৌত্তলিকদের মধ্যে এমন কোনো বিবেচক লোক ছিলো না যে সে ইসলামের ছায়াতলে আসতে প্রলুব্ধ হয়নি।" আমর বিন আস এবং খালেদ বিন ওয়ালিদের মতো শ্রেষ্ঠ বীরদ্বয়ও সে সময় ইসলাম গ্রহণ করে। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মুসলমানগণ সেকালে একটা রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অধিকারী হয়। তৎপ্রেক্ষিতে কুরআন ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাসূলুল্লাহ (স) যে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ তা স্বীকৃত হয়।

খায়বার (বিজয়ের) মু'আহাদা (চুক্তি) ঃ মদীনা মুনাওয়ারার ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে মক্কার কুরাইশ এবং অন্যদিকে খায়বারের ইহুদীদের ন্যায় ভীষণ শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত ছিলো। ইসলামের সাথে শত্রুতায় খায়বারের ইহুদী গোষ্ঠী মক্কার কুরাইশদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের ফলে আরবের ইহুদীদের সামাজিক ও বিদ্যা-বুদ্ধির প্রাধান্য খতম হয়ে গিয়েছিলো। দ্বিতীয়ত, ইয়াসরিবের (মদীনার) দু'টি প্রধান ইহুদী গোত্র বানূ কায়নুকা ও বানূ নাযীরকে চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে মদীনা মুনাওয়ারা হতে বহিষ্কার করার পর তারা খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলো। সেখানে ঘাঁটি করে তারা সমগ্র আরবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও যুদ্ধের অগ্নি বিস্তারে ব্যাপৃত ছিলো। তাদেরই প্ররোচনায় খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। যাতে প্রায় সকল গোত্র বা তাদের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলো। ইহুদীদের এ দুষ্কৃতি শেষ হবারও কোনো আশা ছিলো না। তারা নাজদের গাত্ফান গোত্রকেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তাদের এক হাজার সশস্ত্র যুবককে খায়বার

www.pathagar.com

দুর্গে সমবেত করেছিলো এবং উভয়ের মধ্যে এ উদ্দেশ্যে একটা চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছিলো। হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে আল্লাহ তা'আলা আরো একটি মহাবিজয়ের সুসংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-কে শুনায়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এ সুসংবাদের ব্যাখ্যা করেন খায়বার বিজয় হিসাবে। তিনি কয়েক দিনের প্রস্তুতির পর স্বীয় উৎসর্গিত-প্রাণ সাথীদেরকে নিয়ে খায়বারের অভিযান পরিচালনা করেন। প্রায় দুইমাস অবরোধের পর খায়বারে বারটি দুর্গ পরিপূর্ণভাবে বিজিত হয়। খায়বারবাসিগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সন্ধির আবেদন করলে তিনি তা মঞ্জুর করেন। নিম্নলিখিত শর্তাবলী সম্বলিত সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয় ঃ

(ক) ইহুদীগণ খায়বার উপত্যকায় বসবাস করতে পারবে ;

(খ) মদীনার সরকার (তাদের আচরণের প্রেক্ষিতে) যখনই ইচ্ছা করবে, তাদেরকে খায়বার পরিত্যাগ করতে হবে। [সুতরাং হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে তাদেরকে খায়বার ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়] ;

(গ) খায়াবারে অবস্থানকালে বিজিত দুর্গসমূহে তারা বাস করতে পারবে না (ফলে তারা দুর্গের বাহিরে নতুন বসতি স্থাপন করে) ;

(ঘ) তারা বর্গাচাষী হিসাবে খায়বারের ভূমি ভোগ করতে পারবে এবং প্রচলিত নিয়মে ফসলের বণ্টন মদীনার প্রতিনিধির হাতে ন্যস্ত থাকবে ;

(ঙ) তারা সকল সমরাস্ত্র মুসলিম সেনাবাহিনীর নিকট অর্পণ করবে (এ ধারাটি তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়)।

এ চুক্তির পরও খায়বারবাসী ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও দুষ্কৃতি অব্যাহত থাকে।

রাসূলুল্লাহ (স) ইহুদীগণকে রাষ্ট্র বিরোধী কর্মতৎপরতার অপরাধে আরব উপদ্বীপ হতে বহিষ্কার করার ওসিয়াত করেন। হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে তা কার্যকর করা হয় এবং খায়বার-এর ইহুদীগণকে আরব উপদ্বীপ হতে বহিষ্কার করা হয়।

খায়বার চুক্তি হতে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে ঃ (ক) শত্রুপক্ষ পরাজয় স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া হয় ; (খ) চুক্তিপত্রে বিজিত সম্প্রদায়ের ইচ্ছা-অনুভূতির প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়। তারা চাষাবাদের ভূমি ভোগ-দখলে রাখার আবেদন করলে তা মঞ্জুর করা হয় ; (গ) বিজিত দুর্গসমূহ হতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করা হয়—যাতে তারা পুনর্বার বিশৃংখলা সৃষ্টির অবকাশ না পায়।

ফিদাকের চুক্তি (মু'আহাদা) ঃ ফিদাক খায়বারের উত্তরদিকে অবস্থিত একটা ক্ষুদ্র বসতির নাম। এখানেও ছিলো ইহুদীদের বাস। তারা খায়বারের

www.pathagar.com

ইহুদীদের পরাজয়ের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে আবেদন করে, যেন তাদের সাথেও খায়বারবাসীর অনুরূপ শর্তে সন্ধি করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তা মঞ্জুর করেন।

তায়মার চুক্তি (মু'আহাদা) ঃ খায়বার উপত্যকার উত্তরে তায়মা নামক একটা ক্ষুদ্র পল্লী ছিলো যা মদীনা মুনওয়ারা হতে আট মঞ্জিল দূরে সিরিয়ার দিকে অবস্থিত ছিলো। এখানেও ইহুদীদের নিবাস ছিলো। তারাও যুদ্ধ ছাড়াই আনুগত্য কবুল করে এবং তাদের সাথেও ফিদাকবাসীদের অনুরূপ শর্তে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এর ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

"আল্লাহর রাসূলের পক্ষ হতে বানূ আদিয়ার জন্য। তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তাদেরকে দেশান্তর করা যাবে না। রাত্রি (এ চুক্তিকে) দীর্ঘস্থায়ী করবে এবং দিবস এতে দৃঢ়তার সৃষ্টি করবে।" খালিদ ইবন সাঈদ এটা লিপিবদ্ধ করেন। এ চুক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এবং ওয়াদিউল কুরায় অভিযান ও সন্ধির পর সম্পন্ন হয়।

হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে যখন ফিদাক ও খায়বারবাসীকে দেশান্তর করা হয়, তখন ওয়াদিউল কুরা ও তায়মাবাসী নিরাপদ থাকে। ঐতিহাসিকগণ এর কারণ বর্ণনা করেন যে, উপরিউক্তি দু'টি এলাকা সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত ছিলো। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অসীয়াত ছিলো আরব উপদ্বীপকে ইহুদীমুক্ত করা সম্পর্কে।

আয়লা চুক্তি ঃ আয়লা লোহিত সাগরের তীরে তৎকালীন সিরিয়ার সাথে সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম। তখন রাষ্ট্রটির শাসক ছিলেন য়ুহান্না ইবনে রুবা (সম্ভবত খৃস্টান) তাবুক অভিযানে বায়জান্টাইন সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষ হয়নি বটে, তবে রাসূলুল্লাহ (স) ঐ অঞ্চলের শাসকদের বৈরী সূলভ আচরণের কারণে তাদের প্রতিহত করা জরুরী মনে করলেন। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে রোমদের সহযোগিতা করতো সুতরাং মুতার যুদ্ধে উত্তর সীমান্তের খৃস্টানভাবাপন্ন গোত্র, ইহুদী ও আরব মুশরিক গোত্রগুলো রোমক সৈন্যদের সাহায্য করেছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) দুমাতুল জান্দাল শাসক আকীদার ইবনে আবদিল মালিককে গ্রেফতার করার জন্য একটা বাহিনী প্রেরণ করেন। এতে ভীত হয়ে আয়লার শাসক রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং সন্ধির আবেদন করেন—যা গৃহীত হয়। আয়লার শাসক ও গোত্রসমূহের সাথে যে চুক্তি সম্পন্ন হয়, তা বাস্তব অর্থে নিরাপত্তা চুক্তি ছিলো। এর গুরুত্বপূর্ণ দফাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পক্ষ হতে য়ুহান্না ইবনে রু'বা ও আয়লাবাসীদের নিরাপত্তা প্রদান করা যাচ্ছে ;

www.pathagar.com

২. সমুদ্রে তাদের জাহাজ (ও যাত্রী) এবং স্থলভাগে তাদের ভ্রমণকারীগণ নিরাপত্তা লাভ করবে ;

৩. এ নিরাপত্তা চুক্তিতে আয়লাবাসীদের ঐ সকল মিত্রকে শামিল মনে করা হবে যারা সিরিয়া, ইয়েমেন ও লোহিত সাগরের তীরে বাস করে। এরা যেহেতু ব্যবসাজীবী ছিলো, তাই বিশেষভাবে মুসাফিরদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ;

৪. যদি কেউ চুক্তির কোনো ধারা লংঘন করে, তবে তাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে ;

৫. তারা যে সকল কূপ ও ঝর্ণা ব্যবহার করে, তাদেরকে তদস্থলে যাতায়াতে বাধা প্রদানের অধিকার কারো থাকবে না ;

৬. আয়লাবাসীগণ (যাদের সংখ্যা ছিল তিনশত) প্রতি বছর তিন শত দীনার জিযিয়া প্রদান করবে ;

৭. যদি কোনো ব্যক্তি নিরাপত্তা চুক্তিতে লিখিত শর্তাবলী লংঘন করে বা এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন করে, তবে তার অর্থ-সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর যারা তা মেনে চলবে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ।

এ নিরাপত্তা চুক্তি তাবুকে সম্পাদিত হয়, এখানেই আয়লার শাসক রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মাকনাবাসীদের সাথে মু'আহাদা ঃ আয়লার নিকটবর্তী মাক্না রাজ্যটিও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এর অবস্থান সিরিয়ার সন্নিকটে সমুদ্রতীরে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাবুক অভিযানে সেনা ছাউনিতে অবস্থান করছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী শত্রু অঞ্চলসমূহে অভিযান পরিচালনায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় মাকনাবাসীদের পক্ষ হতে তাঁর দরবারে উবায়দ ইবনে ইয়াসির ইবনে নুমায়র-এর নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধি দল এসে উপস্থিত হয়। তারা তাদের সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে মদীনা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গিকার ঘোষণা করে। রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে একটা চুক্তিপত্র লিখে দেন তাতে তাদের অধিকার ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ ছিলো।

জারবা ও আযরূহ-এর মু'আহাদা ঃ এ দু'টি জনপদ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। উভয় অঞ্চলের মধ্যে তিন দিনের দূরত্ব। তাবুক অভিযানকালে এ দু'টি এলাকার অধিবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাদের উপর বার্ষিক একশত দীনার জিযিয়া ধার্য করা হয়। বিনিময়ে তাদেরকে সকল দিক ও সকল শত্রুর আক্রমণ হতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এ নিরাপত্তা চুক্তিতে এ শর্তটিও সংযোজন করা হয়েছিলো যে, মদীনা রাষ্ট্রের কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তির ভয়ে তাদের শরণাপন্ন হলে তাকে মদীনার সরকারের নিকট অর্পণ করতে হবে। (Extradition Agrement)

www.pathagar.com

আকীদার-এর সাথে মু'আহাদা ঃ তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে দুমাতুল জানদাল-এর খৃষ্টান অধিপতি আকীদারকে ষড়যন্ত্রের অপরাধে গ্রেফতার করার জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি আকীদার ও তার ভ্রাতাকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে হাজির করেন। আকীদার ইসলাম গ্রহণ করেন। তার সাথেও নির্দিষ্ট শর্তে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার একটা দফা অনুসারে তার চাষাবাদের জমি ও চারণ ভূমি পূর্বের ন্যায় তার মালিকানাধীনে রাখা হয়, অবশ্য এর উপর কর ধার্য করা হয়।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) ছোট বড় আরো কয়েকটি গোত্রের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেন। এ ক্ষেত্রে বিশদভাবে উল্লেখযোগ্য, যে কোনো ছোট বা বড় গোত্র যখনই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে, তখন তিনি সেই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি চুক্তির শর্তাবলী আন্তরিকতার সাথে পালন করেছেন এবং কখনো লংঘন করেননি। কোনো মুজাহিদ ভুলক্রমে বিজিত সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির কিছু মালামাল গ্রহণ করতে চেষ্টা করলে রাসূলুল্লাহ (স) এতে কাঠোরভাবে বাধা দিতেন এবং এরূপ অর্থ গ্রহণকে লুণ্ঠন (নহবা) সাব্যস্ত করতঃ অবৈধ ও হারাম ঘোষণা করেছেন। কেউ এরূপ করলে তার উপর ক্ষতিপূরণ ধার্য করতেন। তিনি যেভাবে চুক্তিপত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং যেভাবে তা পালন করতেন তার সাক্ষ খোদ শত্রুরাও দিয়ে থাকে। যাদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাদের কেউ কোনো দিন তাঁর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ করেনি বরং যদি অপর পক্ষ হতে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হতো তবে তিনি তাদেরকে শালীনতার সাথে বুঝাতেন। যদি তারা কোনোভাবে চুক্তি বিরোধী তৎপরতায় বিরত না হতো তবে বাধ্য হয়ে তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন।

উপরিউক্ত চুক্তিসমূহের শর্তাবলী পর্যালোচনা করলে এ সত্যটি উদ্ভাসিত হবে যে, রাসূলুল্লাহ (স) এ সকল চুক্তি বৈরিতার অবসান, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের মহৎ উদ্দেশ্যে সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর চুক্তিসমূহ তাঁর যুদ্ধ-কৌশলের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে যদি দু'টি দল ঐক্যবদ্ধ হতো তবে তিনি তাদের একটা দলের সাথে সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করে নিতেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পরই সেখানকার অধিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে যেই চুক্তি সম্পাদন করেন, তা তাদেরকে শত্রুপক্ষ হতে পৃথক করে দেয়। সিরিয়ার মহাসড়কের পার্শ্বে বসবাসকারী বানূ দামরা, বানু জুহায়না প্রভৃতি গোত্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহও তাঁর সামরিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে, যার ফলে তিনি মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

ও অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার মহাসড়ক অবরোধে সাফল্য অর্জন করেন। মোটকথা তাঁর সম্পাদিত চুক্তিসমূহ ছিলো তাঁর সমগ্র মহান কর্মপদ্ধতির একটা ধারা—যার উদ্দেশ্য ছিলো পৃথিবীতে ন্যায়, ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

সূত্র ঃ হযরত রাসূল করীম (স) জীবন ও শিক্ষা, অনুবাদ ছন্দ ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদন পরিষদ। রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী। ইসলামের ইতিহাস, ডঃ সৈয়দ মাহমুদূল হাসান। ইসলামের ইতিহাস, হাসান আলী চৌধুরী।

www.pathagar.com

কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার

ইসলামী রাষ্ট্রে কর্তা ও প্রশাসক যাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে এরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○ - الحج : ٤١

"আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করবে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।"-সূরা আল হজ্জ ঃ ৪১

উপরোক্ত আয়াত হতে দেখা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তা ও কর্মচারীদের অবশ্যই পালনীয় দায়িত্ব হচ্ছে ঃ

(১) সালাত কায়েম করা, সালাত কায়েমের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়া।

(২) যাকাত আদায় ও বন্টনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এরই ভিত্তিতে সমাজ সমষ্টির জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ ও সুসংবদ্ধকরণের কাজ সম্পন্ন করা।

(৩) কল্যাণময় কার্যাবলীর প্রকাশ ও প্রচার ও সামষ্টিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা।

(৪) সকল প্রকার অকল্যাণকর ক্ষতিকর অনিষ্টকারী বিপর্যয় ও বিকৃতি উদ্ভাবক কার্যাবলী নিষিদ্ধকরণ, জুলুম-নিপীড়ন, শোষণ ও মিথ্যার অপনোদন করা। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা।

এরূপ একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই কেবল মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রকৃত কল্যাণ নিহিত তাতে কারো কোনোরূপ সন্দেহ করার কিছু নেই। তবে আল্লাহর বিধান বিবর্জিত শাসনব্যবস্থায় মানুষের অকল্যাণ বয়ে আনে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা কেবল ঐ ব্যক্তির হতে পারে যার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত তিনটি গুণ বিদ্যমান আছে।

(১) তাকওয়া পরহেযগারী যা তাকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত রাখবে।

(২) এমন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা যা তার উদ্রিক্ত ক্রোধ, রোষ ও অসন্তোষকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

www.pathagar.com

(৩) এমন দয়াদ্র নেতৃত্বগুণ যা তাকে সাধারণ মানুষের জন্য পিতৃতুল্য স্নেহ বাৎসল্য সদা আপ্লুত করে রাখবে।

সন্দেহ নেই অতীব উত্তম জিনিস হচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যা একজন গ্রহণ করবে তার যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে। আর তা অত্যন্ত খারাপ জিনিস হচ্ছে তার জন্য যে তা গ্রহণ করবে তার কোনো যোগ্যতা আধিকার ব্যতিরেকে। কেয়ামতের দিন তা তার জন্য লজ্জা ও অনুতাপেরই কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মূলত রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব একটা অতি বড় আমানতের ব্যাপার। তবে কিয়ামতের দিন তাই এটাও বড় লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে কেউ যদি সে দায়িত্ব পূর্ণ যোগ্যতা ও একনিষ্ঠতা সহকারে পালন করে তাহলে ভিন্ন কথা।

"একজন ন্যায়বাদী সুবিচারক রাষ্ট্রনেতার সাধারণ মানুষের কল্যাণের একদিন কাজ করা একজন ইবাদতকারীর একশত বছর ইবাদত করার সমান।"

রাসূল করীম (স) আরো শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

তোমাদের প্রত্যেকেই রাখালের ন্যায় দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে ও জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হবে। বাদশাহ জনগণের দায়িত্বশীল তাকে তাদের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবারবর্গের দায়িত্বশীল। তাকেও তাদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘর সংসারের জন্য ও তার সন্তানের জন্য দায়িত্বশীল। তাকেও সে বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। তোমরা সকলেই মনে রাখবে তোমরা প্রত্যেকেই এবং সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে এবং সকলকেই সেজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

হযরত আলী (রা) ইসলামী প্রশাসকের গুণ পরিচিতি পর্যায়ে বলেছেন ঃ

জনগণের উপর শাসকের অধিকার এবং শাসকের উপর জনগণের অধিকারসমূহ মহান আল্লাহ তা'আলা নিজেই ধার্য ও সুচিহ্নিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে অপর প্রত্যেকের জন্য একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হিসাবে এবং তা তাদেরই কল্যাণের জন্য তাদের দ্বীনের সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধির লক্ষে। বস্তুত জনগণের কল্যাণ হতে পারে না শাসকদের কল্যাণ ছাড়া! শাসকদেরই কল্যাণ হতে পারে না জনগণের দৃঢ় স্থিতি ব্যতীত। জনগণ যদি শাসকের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, শাসকও যদি জনগণের অধিকার যথাযথ রক্ষা করে, তাহলে সকলেরই অধিকার পারস্পরিকভাবে আদায় হয়ে

www.pathagar.com

যায়। দ্বীনের পথ ও পন্থাসমূহ যথাযথ কার্যকর হয়। সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার দণ্ড যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকট হতে পারে। তার উপর ভিত্তি করে সুষ্ঠ নিয়ম নীতিসমূহ সুচারুরূপে চালু হতে পারে ; তার ফলে গোটা সময়ই কল্যাণময় হয়ে উঠবে। রাষ্ট্র ও সরকার স্থিতি জনগণের কাম্য হবে। শত্রুদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে। জনগণের নিকট শাসক যদি পরাজিত হয়ে পড়ে কিংবা শাসক যদি জনগণের ব্যাপারে ভুল নীতি গ্রহণ করে বসে তাহলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে। অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণসমূহ প্রকট হয়ে পড়বে। দ্বীন পালনে চরম দূনীতি ও নীতি লংঘনমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। চিরন্তন কল্যাণময় আদর্শ পদদলিত হবে। তখন মানুষ নফসের খাহেশ অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করবে। আল্লাহর আদেশ নিষেধ হুকুম-আহকাম অকার্যকর হয়ে পড়বে। তখন মানুষের মধ্যে অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। কোনো পরম সত্য বাতিল হয়ে গেলেও লোকেরা খারাপ মনে করবে না। কোনো বড় বাতিল কাজ দেখেও মানুষ সতর্ক ও সক্রিয় হয়ে উঠবে না। এরূপ অবস্থায় নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা অপদস্ত ও অপমানিত হবে। সমাজের চরিত্রহীন দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিরা সম্মান ও শক্তির অধিকারী হয়ে বসবে। তখন আল্লাহর বান্দাগণের পক্ষে আল্লাহর আদেশ পালন দুষ্কর হয়ে পড়বে।

হযরত আলী (রা) তাঁর অপর এক ভাষণে শাসন ও শাসিতের মধ্যকার মিলিত অধিকারসমূহের কথা এভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

> "তোমাদের শাসনভার আমার উপর অর্পিত হবার কারণে তোমাদের উপর আমার একটা অধিকার রয়েছে এবং আমার উপর তোমাদের জন্য অনুরূপ একটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

এ দৃষ্টিতে অধিকারের দিক দিয়ে শাসক শাসিতের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে আইনের সম্মুখে সকলেই সমান ও সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন। রাসূলে করীম (স)-এর প্রখ্যাত উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয়। "সত্যের সমীপে সমস্ত মানুষ সর্বতোভাবে সমান।"

ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কেবল মুসলমানদের জন্যই ন্যায়বিচার ও ইনসাফের ব্যবস্থা করে না—বিধর্মীদের প্রতিও ন্যায়নিষ্ঠ ও সুবিচার করে থাকে। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় জাত, গোত্র ও ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষই ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা পেয়ে থাকে। মতাদর্শের কারণে অধিকার আদায়ে কোনো তারতম্য হয় না।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, "মদীনা সনদ" দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (স) মুসলিম, অমুসলিম ও ইহুদী ইত্যাদির সাথে একটি রাষ্ট্রের অধীনে

www.pathagar.com

বসবাসের জন্য যে লিখিত দলীল তৈরী করেন তাতে সকলেরই ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ দলীলের কতিপয় ধারা এখানে তুলে দেয়া হচ্ছে ঃ "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম—ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (স) ও হুরায়রা বংশের মু'মিন মুসলিম এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে এক লিখিত চুক্তি। যারা তাদের সাথে পরে মিলিত হয়েছে ও তাদের সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে তারা এর মধ্যে শামিল ও গণ্য । এরা অন্য মানুষ থেকে পৃথক এক উম্মত।"

এরপর ইসলামী কবিলাসমূহের এবং নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব এবং দুর্বলের সহায়তা এবং সুবিচার, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখের পর এমন কতোগুলো বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যা সর্বসাধারণ মুসলিমের সাথে সংশ্লিষ্ট, অতপর লিখিত হয়েছে ঃ

"মু'মিন মু'মিনের সাথে কৃত বন্ধুত্ব ভঙ্গ করবে না, কারোর সাথে কৃত চুক্তির বিরুদ্ধতা করবে না। মু'মিন মুত্তাকীগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। তাদের মধ্য থেকে যে বিদ্রোহ করবে তার বিরুদ্ধে কেউ জুলুম করতে ঔদ্যত হলেও তার বিরোধিতা করবে। কাউকে কোনো অপরাধ করতে দেবে না। মু'মিনদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টাও সফল হতে দেবে না। মোটকথা তাদের শক্তি থাকবে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তাদেরই কারোর সন্তানের বিরুদ্ধে হলেও।

ইহুদীদের মধ্য থেকে যে লোক আমাদের অনুসরণ করবে তাকে সাহায্য করা হবে। কোনোরূপ জুলুমের শিকার তারা হবে না। তাদের বিরুদ্ধে অন্যদেরও সাহায্য সহযোগিতা করা হবে না।

বনূ আওফ এর ইহুদীরা মু'মিনদের সাথে এক উম্মত। ইহুদীরা তাদের ধর্ম পালন করবে। মুসলমানরা পালন করবে তাদের দ্বীন। প্রত্যেককে নিজ নিজ চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাথে চুক্তি রক্ষার জন্য তারাই দায়ী হবে। তবে কেউ জুলুম করলে ও অপরাধ করলে সে নিজকে—নিজের পরিবারবর্গকেই বিপদে ফেলবে।

ইহুদীদের ব্যয়াদি তারা নিজেরাই বহন করবে মুসলমানদের ব্যয় মুসলমানরাই বহন করবে এ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকারী কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে তাদের পারস্পরিক সাহায্যদান অবশ্য কর্তব্য হবে। আর তাদের পরস্পরে হবে কল্যাণ কামনা, উপদেশ দান, পারস্পরিক উপকার সাধন কোনোরূপ পাপ বা অপরাধ ছাড়া।

মদীনায় স্বাক্ষরিত সনদের মূলকথা

১. এটা নবী ও আল্লাহর রাসূল (স)-এর অংগীকার পত্র যা কুরাইশ ও মদীনার মুসলমানদের মধ্যে এবং সেই সকল লোকের মধ্যে যারা

www.pathagar.com

মুসলমানদের অনুসরণ করে তাদের সাথে এমনভাবে মিলেমিশে থাকবে যে, তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে জিহাদ করবে এদের মধ্যে স্থিরকৃত হলো।

২. উপরোক্ত জনসমষ্টি অন্যান্য লোকদের হতে স্বতন্ত্র একটি উম্মতে পরিণত হবে।

৩. কুরাইশী মুহাজিরগণ তাদের গোত্র বিধান অনুসারে পরস্পর নিজেদের দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করবে, অনুরূপ তারা নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপন মু'মিন ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে এবং ইনসাফের সাথে আদায় করবে।

৪. বানূ আওফ তাদের গোত্রীয় বিধিব্যবস্থায় নিজেদের পূর্বেকার দিয়াতসমূহ আদায় করবে [এবং তাদের সকল উপগোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত বিধি এবং ইনসাফের সাথে মুক্তিপণ (ফিদিয়া) প্রদান করবে]।

৫. বানুল হারিস (ইবনে খাযরাজ) নিজেদের বিধি অনুসারে নিজদের পুরাতন দিয়াতসমূহ প্রদান করবে এবং তাদের প্রত্যেকটা উপগোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত বিধির অধীনে ও ন্যায়পরাণয়তার সাথে আদায় করবে।

৬. বানূ সাঈদা ;

৭. বানূ জুশাম ;

৮. বানূ নাজ্জার ;

৯. বানূ আমর ইব্নে আউফ ;

১০. বানূ নাবীত এবং

১১. বানূ আওস (সকলেই) নিজ নিজ বিধি ব্যবস্থা অনুসারে নিজেদের (পুরাতন) দিয়াতসমূহ প্রদান করবে এবং এদের প্রত্যেক গোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ মুসলমানদের প্রচলিত বিধি-বিধানের আওতায় প্রদান করবে (শেষের বাক্যটি প্রতিটি গোত্রের নামের সঙ্গে পুনরুক্তি করা হয়েছে)।

১২. ঈমানদারগণ নিজেদের মধ্যকার ঋণভারে জর্জরিত কোনো ব্যক্তিও অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখবে না বরং মুক্তিপণ, রক্তপণ (দিয়াত) ও জরিমানা আদায়ের ব্যাপারে যথারীতি তাকে সাহায্য সহায়তা প্রদান করবে এবং কোনো ঈমানদার অন্য কোনো ঈমানদারকে এড়িয়ে তার মাওলা বা গোলামের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হবে না।

১৩. এবং তাকওয়ার অনুসারিগণ ঐক্যবদ্ধভাবে এমন প্রতিটি ব্যক্তির বিরোধিতা করবে যে তাদের মধ্যে জুলুম, পাপ, বাড়াবাড়ি, অবাধ্যতা,

www.pathagar.com

বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের কারণ হতে পারে। তারা সকলে একত্রে এ প্রকৃতির ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদিও সেই অনাচারী ব্যক্তি তাদের কারো সন্তানই হোক না কেনো।

১৪. কোনো মু'মিন কোনো কাফির-এর বিনিময়ে অন্য কোনো মু'মিনকে হত্যা করবে না এবং কোনো মু'মিনের বিপক্ষে সে কোনো কাফিরের সহায়তা করবে না।

১৫. সকল মুসলিম পরস্পর একে অপরের সাহায্যকারী ও সহকর্মী হবে।

১৬. ইহুদীদের মধ্য হতে যারাই আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিবে তাদের সাথে যথারীতি বিধিসম্মত আচরণ, ইনসাফ ও সমতার ভিত্তিতে আচরণের বিধান করা হলো। তাদের উপর সাহায্য সহায়তা প্রদান করা হবে না।

১৭. মুসলিমদের সন্ধি সমভাবে ও সমপর্যায়ের গুরুত্ব সম্পন্ন কোনো মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের কালে মুসলমানদের হতে পৃথক হয়ে কারো সাথে সন্ধি করবে না। মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়নীতি অক্ষুণ্ন রাখার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

১৮. সকল গাজী দলের সদস্য নিজদের মধ্যে একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হবে।

১৯. তাকওয়া অবলম্বনকারী মুসলিমগণ এ অঙ্গিকারের শর্তাবলী কার্যত বাস্তবায়িত করতে থাকবেন।

২০. কোনো মুশরিক (ইহুদী) কোনো কোরাইশী কাফিরের সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবে না এবং কোনো মুসলমানের বিপক্ষে কোরাইশীদের সে সাহায্যও করবে না।

২১. যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে তাকে নিহতের বিনিময়ে হত্যা করা হবে, যদি না নিহত ব্যক্তির অভিভাবক তার বিনিময়ে রক্তপণ (দিয়াত) গ্রহণে সম্মত হয়ে যায়। ঈমানদারগণ সকলেই হত্যাকারীর বিরুদ্ধে থাকবে।

২২. কোনো মু'মিনের পক্ষে যে এ চুক্তিপত্র মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এটা বৈধ হবে না যে, সে কোনো আইন ভংগকারীকে সহয়তা কিংবা আশ্রয় প্রদান করবে। যে ব্যক্তি এ ধরনের অপরাধীকে সাহায্য সহায়তা করবে কিংবা আশ্রয় প্রদান করবে তবে তার উপরে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও গযব হবে। তার নিকট হতে কোনো প্রকার বিনিময় বা মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না।

www.pathagar.com

২৩. এবং তোমরা যখনই কোনো ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করবে তবে এর ফায়সালার জন্য মহান আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর শরনাপন্ন হবে।

উপরোক্ত ধারাসমূহ ছিলো মুসলমানদের পারস্পরিক আচার আচরণ সম্পর্কিত। নিম্নে উল্লেখিত ধারাসমূহ অমুসলিম গোত্রসমূহের সাথে সম্পর্কের প্রকৃতি বিবৃত করে ঃ

২৪. মুসলমানগণের যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহে ইহুদীরা অংশ গ্রহণ করবে।

২৫. বানূ আওফ এর ইহুদীরা নিজেরা, তাদের মিত্রবর্গ ও মাওলা আযাদকৃত গোলামদের সহকারে মুসলমানদের সাথে একপক্ষ ও একদল সাব্যস্ত হবে। ইহুদীরা নিজেদের ধর্ম পালন করতে থাকবে এবং মুসলমানগণ নিজেদের ধর্ম। তবে যে কেউই জুলুম ও পাপ করবে সে নিজেকে ও পরিবারবর্গকে বিপদগ্রস্থ করবে।

২৬. বানূ নাজ্জার ;
২৭. বানূ হারিস ;
২৮. বানূ সাঈদা ;
২৯. বানূ জুশাম
৩০. বানূ আওস ও

৩১. বানূ সা'লাবার অন্তর্গত ইহুদীদের জন্যও অনুরূপ সবকিছু অধিকার ও কর্তব্য সাব্যস্ত হবে। যা বানূ আওফদের (ইহুদী) জন্য রয়েছে। শেষের বাক্যটি প্রত্যেক গোত্রের নামের সাথে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাদের মধ্য হতে যে কেউই অত্যাচার ও সীমালংঘন করবে, সে নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করবে।

৩২. বানূ সালাবার শাখা বানূ জাফনাও বানূ সালাবার অনুরূপ গণ্য হবে।

৩৩. বানূ শুত্বায়বা এর জন্যও সেই সকল (সুবিধাদি) সাব্যস্ত হলো, যা বানূ আওফ এর ইহুদীদের জন্য রয়েছে এবং পূর্ণভাবে সর্বদা পাপ হতে পৃথক থাকবে।

৩৪. বানূ সালাবার মাওলা ও মিত্ররা অধিকার ও কর্তব্য ক্ষেত্রে তাদেরই অনুরূপ হবে।

৩৫. ইহুদীদের যে কোনো শাখা গোত্র তাদেরই সমতুল্য হবে।

www.pathagar.com

৩৬-ক. উপরোক্ত গোত্রসমূহের কোনো ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে (মদীনা হতে) বহির্গমন করতে (চুক্তির বহির্ভূত হতে) পারবে না।

৩৬-খ. কোনো ব্যক্তি যখন আঘাত এর প্রতিবিনিময় গ্রহণে প্রতিবন্ধক হবে না যে কেউ কাউকেও হত্যা করবে, সে নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকেই ধ্বংস করবে।

৩৭-ক. মুসলমানদের উপর ধার্য তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ এবং ইহুদীদের উপরে ধার্য তাদের নিজেদের ব্যয় নির্বাহে বাধ্য থাকবে। যারা এ চুক্তির পক্ষগুলোর কোনো একটারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, চুক্তিবদ্ধ সকল সহযোগী তাদের (আক্রমণকারীর) প্রতিরোধে পরস্পরে একে অন্যের সাহায্য সহযোগিতা করবে।

৩৭-খ. তারা (চুক্তির পক্ষসমূহ) পরস্পর একে অন্যের কল্যাণকামী থাকবে এবং সর্বাবস্থায় মজলুমের সাহায্য করবে।

৩৮. এবং ইহুদীরা যতোদিন পর্যন্ত মুসলমানদের সঙ্গে থাকবে, ততোদিন নিজেদের (অংশের) খরচপাতি বহন করবে।

৩৯. এ চুক্তি সম্পাদনকারীদের জন্য মদীনার পরিসীমার অভ্যন্তরীন অঞ্চল হারাম (পবিত্র ও সংরক্ষিত এলাকা)-এর মর্যাদা লাভ করবে।

৪০. এবং প্রতিবেশীর প্রত্যেকের নিজের সমতুল্য পরিগণিত হবে। তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করা যাবে না ; তাদের উপর অবিচার করাও যাবে না।

৪১. এবং কারো রক্ষণাবেক্ষণের অধীন বিষয় (ব্যক্তি)-কে তার অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় প্রদান করা হবে না।

৪২. এ চুক্তি সম্পাদনকারীদের অভ্যন্তরে যদি কোনো নূতন সমস্যার উদ্ভব হয় কিংবা আইন ভঙ্গের কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় যাতে ফিতনা ফাসাদ ও ক্ষতির আশংকা থাকে তবে তার মীমাংসার জন্য আল্লাহ এবং (আল্লাহর রাসূল) মুহাম্মাদ (স) সমীপে উপস্থিত করতে হবে [এবং আল্লাহ তায়ালা এ সহীফার (চুক্তিপত্রে) সন্নিবেশিত সৎকর্ম ও তাকওয়ার বিষয়-সমূহের জন্য সাক্ষ রইলেন]।

৪৩. কুরাইশ (কাফির) ও তাদের সাহায্যকারীদের কেউ আশ্রয় দিবে না।

www.pathagar.com

৪৪. এবং কেউ ইয়াসরিব (মদীনা মুনাওয়ারা)-এর উপর আক্রমণ করলে এ চুক্তির সম্পাদনকারী পক্ষসমূহ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তার মুকাবিলা করবে।

৪৫-ক. মুসলমানদের পক্ষ হতে কেউ স্বীয় মিত্র পক্ষের সাথে সন্ধি করার জন্য ইহুদীদের আহবান করলে ইহুদীরা তার সাথে সন্ধি সম্পাদন করবে। অনুরূপভাবে যদি তারা (ইহুদীরা) ও আমাদেরকে অনুরূপই সন্ধি সম্পাদনের আহবান জানায়, তবে মুসলমানগণও সেই আহবানে সারা দিবেন এই শর্তে যে সেই দলটি ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নেই।

৪৫-খ. ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সকল মানুষ নিজ নিজ অংশের জিম্মাদার থাকবে।

৪৬. আওস গোত্রের অন্তর্গত ইহুদীরা নিজেরা এবং তাদের সমর্থক ও মিত্ররা উত্তম ও সুষ্ঠু সুচারুরূপে এ চুক্তিপত্র বাস্তবায়নকারীদের সঙ্গে থাকবে। পাপের পরিমন্ডলের বিপরীত দিক হচ্ছে পুণ্য ও অঙ্গীকার রক্ষা। প্রত্যেক কর্ম সম্পাদনকারী স্বীয় কৃতকর্মের দায়িত্ব বহন করবে। অবিচারকারী নিজের উপরই অবিচার করবে। সততা ও নিষ্ঠার সাথে এ চুক্তি অনুসারীদের জন্য আল্লাহ সাহায্যকারী হবেন।

৪৭. এ চুক্তি জালিম ও পাপিকে তার অসৎকর্মের পরিণাম হতে রক্ষা করবে না। যে ব্যক্তি (মদীনা হতে) বাহিরে চলে যাবে, সেও নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি (মদীনায়) অবস্থান করে থাকবে সেও নিরাপত্তা লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি জুলুম ও গুনাহ করবে সে নিরাপদ থাকবে না। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) নেককার ও মুত্তাকি লোকদের সহায় ও সংরক্ষণকারী।

মদীনা সনদের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা

গভীর দৃষ্টিতে মদীনা সনদের ধারাসমূহ পর্যালোচনা করলে এ চুক্তিটির গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ

১. এ চুক্তির ফলে মদীনার নগর রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হলো এবং হযরত নবী করীম (স)-কে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় পক্ষের তরফ হতে এ নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান স্বীকার করে নেয়া হলো। এভাবে মহানবী (স) একটা আন্তর্জাতিক সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন।

২. এ চুক্তির কল্যাণে নবী করীম (স) একজন মহান পরিকল্পনাবিদ ও পরিচালকরূপে ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায় বহুধা বিভক্ত, আদর্শ বিশ্বাসে

www.pathagar.com

বিভিন্নমুখী ও পরস্পর হতে চরম বিচ্ছিন্ন একটা জনগোষ্ঠীকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করার সুকঠিন কাজটা একজন শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ রাজনীতিবীদের ন্যায় পরম দক্ষতার সাথে সুচারুভাবে সম্পাদিত করলেন। নবী (স) এমন একটা রাষ্ট্র এবং এমন একটা জনসমাজ প্রতিষ্ঠার সাফল্য অর্জন করলেন, যা ছিলো আন্তর্জাতিক রীতিনীতির ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

৩. এ চুক্তির বলে হযরত নবী করীম (স) আইন বিচার প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ নিজের ও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করে নিলেন।

৪. হযরত নবী করীম (স) রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যবোধ সংযোজিত করলেন। ক্ষমতার মূল উৎস আল্লাহ তায়ালার জন্য স্থির করে নিজে তিনি নবী ও রাসূলরূপে আল্লাহ তায়ালার নায়েবের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকলেন।

৫. নাগরিক অধিকার রাষ্ট্রের সংগঠন রাজনৈতিক উদারতা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং সুনিপুণ কর্মকুশলতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়েছে এ ঐতিহাসিক চুক্তিতে।

৬. এ চুক্তির বলেই ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি সুনির্ধারিত হলো এবং সে সাথে অমুসলমানদের সাথে ঐক্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নির্ণীত হলো।

৭. এ চুক্তিপত্র মুসলমানদের পারস্পরিক কর্তব্য অধিকার এবং সকল নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্ক অধিকার ও কর্তব্যসমূহও নির্ধারিত হলো।

৮. এ চুক্তিই জুলুম, বৈষম্য, অবিচার এবং এ প্রকৃতির অন্যান্য গর্হিত বিষয়গুলোর দ্বার রুদ্ধ করে দিলো। আরববাসীদের ব্যক্তিগতভাবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রাচীন পন্থার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বিষয়টিকে একটা সম্মিলিত কর্তব্যরূপে সাব্যস্ত করা হলো। দুর্বল অসহায় ও মজলুমদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহায়তা দানের পরিপূর্ণ গুরুত্ব প্রদানও এ চুক্তির অবদান।

৯. যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন পরিস্থিতির কর্মনীতি স্থিরীকৃত হলো।

১০. এ চুক্তি মুশরিক কুরাইশের বিরুদ্ধে একটা সম্মিলিত ঐক্যজোটের রূপ পরিগ্রহ করলো এবং মদীনায় ইসলামের দুশমনদের প্রবেশাধিকার রহিত করা হলো।

১১. মদীনাকে হারাম (পবিত্র ভূমি) সাব্যস্ত করা হলো এবং এভাবে এ নতুন নগর রাষ্ট্রের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। সেই সংগে তার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষারও যথোচিত ব্যবস্থা গৃহীত হলো।

১২. গোত্রসমূহের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের অবসানও এ চুক্তির ফলে সম্ভব হলো।

www.pathagar.com

১৩. এ চুক্তিই ইসলামের প্রধান শত্রু মক্কার কুরাইশগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যান্য গোত্রকে উত্তেজিত করা হতে বিরত রাখে।

১৪. এ চুক্তি নাগরিকদের আইন, ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে অনুপ্রাণিত করে।

১৫. এ চুক্তিই আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহ এবং হযরত নবী করীম (স)-এর সিদ্ধান্তসমূহে অলংঘনীয় আইনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলো।

১৬. এ চুক্তির ফলে এবং হযরত (স)-এর প্রবর্তিত ব্যবস্থাসমূহের ফলেই একটা শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র এবং একটা কল্যাণধর্মী সমাজ আত্মপ্রকাশ করলো।

রাসূলে করীম (স)-এর জীবনে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী অমুসলিমদের প্রতি সদাচারণ প্রদর্শন ছিলো ইসলামী রাষ্ট্রের নীতি।

ইসলামী রাষ্ট্র শাসক ও শাসিতের মধ্যে পূর্ণ সমতা ও পার্থক্য চিরকালই রক্ষিত হয়েছে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, সকল ক্ষেত্রেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, একদিন ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)-এর বর্মটি হারিয়ে যায় এবং পরে তা একজন খৃস্টানের নিকট দেখতে পেয়ে তা উদ্ধার করার জন্য বলপ্রয়োগ না করে তিনি নিজে একজন বিচারকের নিকট উপস্থিত হন এবং নিজের দাবী পেশ করেন। মামলা দায়ের করার পর বিচার কক্ষে বিচারকের সম্মুখে বাদী ও বিবাদী উভয় উপস্থিত হয়। বাদী হযরত আলী (রা) বললেন, বিবাদীর নিকট যে বর্মটি রয়েছে ওটি আসলে আমার। আমি তা বিক্রয় করিনি; তাকে দানও করিনি।

বিচারক বিবাদীকে তার বক্তব্য বলার জন্য আদেশ করলে তিনি বললেন না বর্ম আমার। তবে আমীরুল মু'মিনীন মিথ্যাবাদী তাও বলবো না। এ সময় বিচারপতি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন; এ বর্মটি যে আপনার তা প্রমাণের জন্য কোনো সাক্ষী পেশ করতে পারেন? হযরত আলী (রা) সহাস্যে জবাব দিলেন না, আমার নিকট কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

অপর এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত আলী (রা) তাঁর ক্রীতদাস কুমারকে সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করেছিলেন। কিন্তু মনিবের পক্ষে তাঁরই ক্রীতদাসের সাক্ষী সুবিচারের নীতিতে গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিচারপতি সে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিচারক রায় দেন যে, এ বর্মটি খৃস্টান ব্যক্তিরই।

www.pathagar.com

অতপর লোকটি বর্মটি গ্রহণ করে চলে যেতে লাগলো। হযরত আলী (রা) নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকলেন। কিন্তু লোকটি কয়েক পা চলে গিয়ে ফিরে এসে বললো ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটাই নবী রাসূলগণের বিচার পদ্ধতি। আমিরুল মু'মিন আমাকে বিচারকের নিকট নিয়ে চলুন। তিনি পুনরায় বিচার করবেন। অতপর খৃষ্টান ব্যক্তি বললো, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি এ বর্মটি আমিরুল মু'মিনীনেরই। আমি পূর্বে মিথ্যা বলেছি।

ইসলামের এ দৃষ্টান্তহীন ন্যায়বিচার দেখে লোকটি পরবর্তীকালে ইসলাম কবুল করে এবং একজন দুঃসাহসী বীরযোদ্ধা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

কুরআন মজিদে অমুসলিমদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করার এবং তাদের প্রতি পূর্ণ সহৃদয়তা ও সুবিচার রক্ষা করার অনুমতি এবং নির্দেশ দিয়েছেন এ পর্যায় কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَايَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে, তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাতো জালেম।"–সূরা মুমতাহিনা ঃ ৮-৯

উপরোক্ত আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলমানদের প্রকৃত শত্রু তারা, যারা দ্বীনের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছে মুসলমানদেরকে ঘড়বাড়ী এমনকি নিজ দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। অতএব শত্রুভাবাপন্ন লোকদের সাথে মুসলমানরা কোনোরূপ বন্ধুত্ব করতে পারে না। এরূপ লোক যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে ও নানাভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়েছে, ক্ষতি করতে চেয়েছে, তারা কখনোই মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না,

www.pathagar.com

তাদের সাথে কোনো মুসলমান একবিন্দু বন্ধুত্ব ভাব পোষণ করতে পারে না। যদি কেউ এরূপ করে তা হবে রীতিমত জুলুম এবং যারা করবে তারা হবে জালেম।

পক্ষান্তরে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ করেনি তাদের ঘড়বাড়ী থেকে তাদের বহিষ্কৃত করেনি, তারা প্রকাশ্য শত্রুরূপে চিহ্নিত হবে না। অতএব তাদের প্রতি শুভ আচরণ করা সর্বোপরি পূর্ণ মাত্রায় সুবিচার করা কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়।

পবিত্র কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَيَاْلُوْنَكُمْ خَبَالاً ط وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ج وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّالَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ○ - ال عمران : ١١٨

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের আপনজন ছাড়া অপর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না ; তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না ; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর ; তোমাদের জন্য নিদর্শন বিষদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন করো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৮

সামরিক সংগঠন

মদীনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে বর্হিশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটা সামরিক সংগঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ তখন রাসূল (স) এমন একটা ভূখণ্ডে বসবাস করতে থাকেন যার চর্তুদিকে ঘিরে ছিলো প্রবল বিরোধী শত্রুপক্ষ। মদীনার ইহুদীরা প্রথম থেকেই রাসূল (স) এবং তাঁর সাহাবীগণের ও তাদের ধর্মবিশ্বাসকে বিরোধিতা করতে থাকে এবং মুনাফিক ও কাফেরদের সহায়তায় নব্য মুসলমান ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় রত হয়। তাই বহুবিধ সমস্যা, হুমকী ও বিপদের মুখে মদীনার শিশু রাষ্ট্রকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন ছিলো অপরিহার্য। কারণ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এ পদক্ষেপ ছিলো বিবেচিত । রাসূল (স) মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার ও শত্রুতার দিকে লক্ষ রেখেই নব দিক্ষীত মুসলমানদের নিয়ে ধীরে ধীরে

www.pathagar.com

একটা সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী গঠন করেন এবং যে মক্কা থেকে ৬২২ খৃস্টাব্দে অসৌজন্যমূলকভাবে বিতাড়িত হন ঠিক তার আটবছর পর সামরিক বাহিনীর সহায়তায় বিজয়ীর বেশে সে মক্কাতে প্রবেশ করেন। তারপর হতে শুধু মক্কাই নয় সমগ্র আরব সাম্রাজ্য তার পদানত হয়। মূলত সামরিক বাহিনীই ছিলো এর প্রত্যক্ষ অবদান। এ কারণেই রাসূল (স)-এর শত্রুপক্ষ ও তাঁর সাহাবী ও মুজাহিদদের কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার কাছে পরাভূত হতে বাধ্য হয়। তবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সামরিক বাহিনী একটা সুসংহত সংগঠনের রূপ নেয়। যদিও তখনকার দিনে আরব সাম্রাজ্যে কোনো নিয়মিত সামরিক বাহিনী ছিলো না তবে যে কোনো শত্রুর আক্রমণের সময় সৈন্যবাহিনীকে এমনভাবে পাওয়া যেতো মনে হতো যে তারা যেনো কোনো নিয়মিত বাহিনীর সদস্য। যে কোনো যুদ্ধের সময় হযরতের সাহাবা ও মোহাজিরগণ প্রস্তুত থাকতো এবং যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতো। যদিও আধুনিক কালের মতো সে সময় সেনাবাহিনীতে কোনো স্থায়ী সেনাধ্যক্ষ ছিলো না। তবে রাসূল (স)-এর সময় হিজরতের পর ছয় মাসের মধ্যে মদীনার সন্নিকটে এক অভিযান পরিচালনার জন্য একজন সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয় এবং ঐ দিন থেকে রাসূল (স)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি অভিযানের জন্য একজন করে সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করতেন। তবে রাসূল (স)-এর সময় ৭৪টা অভিযান পরিচালনা হয় এবং এতে ৪৯জন সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছেন। ৭৪টা অভিযানে ৪৯জন সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে বলা যায় যে, কোনো একজনকেই বিভিন্ন অভিযানে দুই বা তিনবার সেনাধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো স্থায়ী সেনাধ্যক্ষ বা সেনা অধিনায়ক ছিলো না। তবে প্রত্যেকটি অভিযানের গুরুত্ব মাথায় রেখে যোগ্যতানুসারে সামরিক অধিনায়কদের নিয়োগ দেয়া হতো। তবে অধিকাংশ পদেই কুরাইশ, মুহাজির ও আনসারগণ প্রাধান্য পেতো। এ ব্যাপারে গোত্র, বংশ আঞ্চলিক বা ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য কোনোভাবেই প্রভাব ফেলতো না।

তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে কোনো অভিযানের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে বৃহৎ বাহিনীর অধিনায়ক তাদেরই করা হতো যারা তাদের নেতৃত্বের গুণাবলী ও সামরিক দক্ষতার পরিচয় বহন করতো। মহানবী (স)-এর সবচেয়ে দক্ষ ও বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে যায়েদ বিন হারিসই ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। মহানবী (স)-এর আজাদ কৃত দাসই যে কেবল সর্বাধিক সংখ্যক অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন তা নয় তিনি সর্ববৃহৎ বাহিনীর নেতৃত্ব ও অধিনায়কত্ব করেছেন। অন্যান্য

www.pathagar.com

বিশিষ্ট সামরিক অধিনায়কদের মধ্যে ওসামা ইবনে যায়েদ। আবদুর রহমান ইবনে আওফ, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস্, আলী ইবনে আবু তালিব এবং আলকামাহ বিন মুয়াযযিয খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। সামরিক দায়িত্ব পালন কালে এসব অধিনায়কদের যুদ্ধের পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের নিজস্ব জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও তাদের সকল ক্ষেত্রে ও পরিস্থিতিতে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে চলার নির্দেশ ছিলো।

ইসলামী সেনাবাহিনীর বিন্যাস

ইসলামের বিখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন-এর মতে পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে যুদ্ধের যে রীতিনীতি প্রচলিত ছিলো তাহলো "আল কারওয়া আলফার" অর্থাৎ আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণ। সে যুগে বর্তমান যুগের মতো কোনো পদ্ধতি বিচরাজমান ছিলো না। তাই শক্তির উপর নির্ভর করা হতো যে, যার যতো শক্তি ও সাহস তারাই জয়ী হতো। সে কালে "আল খামিস" নামে যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো তাতে সেনাবাহিনীকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হতো। পাঁচটি ভাগ হলো ঃ কালব (কেন্দ্র), মায়মানাহ (দক্ষিণ বাহু), মায়সারাহ (বামবাহু), মুকাদ্দামাহ (অর্গবর্তী বাহিনী) ও সাকাহ (পশ্চাদরক্ষী)। ইবনে খালদুন এ বিন্যাসকে যাহাফ নামে অবহিত করেছেন। যাহাফ এমন একটা রণ পদ্ধতি যাতে সেনাবাহিনী সালাত আদায় করার মতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতো অর্থাৎ সামনা সামনী দাঁড়াতো এবং একপক্ষ অন্য পক্ষের উপর শক্তি কৌশল প্রদর্শন করে জয়ী হতো। তবে এখানে দেখা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকের মাসগুলোতে যেহেতু কোনো নিয়মনীতি ছিলো না সেহেতু সামরিক বিন্যাসানুসারে তখন ইসলামী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়নি এবং সে কারণে সে সময় কোনো সুসংহত সেনাবাহিনীর সংগঠন গড়ে উঠেনি। যা হোক ৬২৪ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কুরাইশ বাহিনীর বিরুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (স) নিজে একটা সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং সেই অল্প সংখ্যক দৃঢ়চেতা উদ্দমী ও ন্যায়পরায়ণ যোদ্ধাদের নিয়ে শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে নবী করীম (স) নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনিই ছিলেন যুদ্ধের সেনাধ্যক্ষ বা সমর অধিনায়ক। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বেই মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে ফরমান জারী করেন। "তোমরা কেউ সারি ভেঙ্গে এগিয়ে যাবে না এবং আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করবে না।" এতে বুঝা যায় যে, তিনি শৃংখলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। আরো দেখা যায় যে, এ যুদ্ধে ব্যূহ্য রচনা করা হয়েছিলো। ডান বাহুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর (রা) এবং বাম বাহুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অন্য কেউ। তবে মক্কার কুরাইশগণ যুদ্ধের কৌশল স্বরূপ ৫টা বাহুতে (খামিস) সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করেছিলো। আর ইসলামী বাহিনীর ৩টা সুনির্দিষ্ট বাহু ছিলো এগুলো মুহাজির, খাজরাজ ও আওসীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিলো।

ওহুদের যুদ্ধেও আলখামিস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিলো। এ যুদ্ধে হযরত মুহাম্মাদ (স) স্বয়ং উপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। মহানবী (স) ওহুদ পর্বতকে পশ্চাতে রেখে আপন সৈন্যবুহ্য রচনা করেন। মুসলিম শিবিরের পশ্চাতে বাম পার্শ্বের গিরিপথ রক্ষা করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের নামক জনৈক সেনানায়ককে ৫০জন তীরন্দাজ সহ মোতায়েন করেন। এর বামবাহুর নেতৃত্বে ছিলেন আল মুনযির ইবনে আমর! ডান বাহুতে জনৈক মুহাজির বা আনসার অগ্রভাগে ছিলেন। হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং তার সঙ্গে ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব। এরপর ৬২৭ খৃষ্টাব্দে ৩১ মার্চ খন্দকের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করেন আবু সুফিয়ান। শত্রুপক্ষের পদাতিক, অশ্বারোহী বাহিনী মোকাবেলা করার জন্য হযরত মুহাম্মাদ (স) সুসংহত ও দৃঢ়চেতা যোদ্ধাদের নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন করেন। অপর পক্ষে ওহুদের বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে পারশ্যবাসী সালমান ফারসীর পরামর্শক্রমে মদীনার চতুর্দিকে অরক্ষিত স্থানসমূহে পরিখা খনন করেন। এটা ছিলো রণ কৌশলের অন্যতম দিক। এ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থায় হযরত মুহাম্মাদ (স) সহ আবালবৃদ্ধবনীতা অংশ গ্রহণ করেন। এর সৈন্যবাহিনীকে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করে নগর রক্ষায় নিযুক্ত করা ছাড়াও যুদ্ধের জন্য বুহ্য রচনা করা হয়। মহানবী (স)-এর এ অভিনব কৌশল বিশ্বযুদ্ধেও গ্রহণ করা হয়েছিল যা আজও বিদ্যমান। হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রত্যেকটি যুদ্ধে নূতন নূতন সমর কৌশল গ্রহণ করেন এবং শত্রুপক্ষকে ঘায়েল ও পর্যদস্তু করেন।

ওয়াকিদা খায়বার অভিযানের যে বিবরণ দিয়েছিল সেখানে আল খামিস বিষয়টির উল্লেখ আছে এবং পরবর্তীতে বাহিনীর ৫টি বিন্যাস পদ্ধতি ও ধারার উল্লেখ পাওয়া যায়। ওমরাতুল কাযা, মুতা, মক্কা বিজয়, হুনায়ন, আওতাস, তাইফ ও তাবুক অভিযানে খামিস বিন্যাস পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিলো। উমরাতুল কাযা অভিযানে অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আওসা। অন্যদিকে অস্ত্রশস্ত্র সহ আর একটা ডিভিশনকে (আল সিলাহ) বাশীর ইবনে সাদ খাযরাজীর নেতৃত্বে দেয়া হয়েছিলো। ৬ মাস পর মুতা অভিযানে যায়দ ইবনে হারিসার নেতৃত্বাধীন

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর কমাণ্ডার হিসাবে কুতবাহ ইবনে কাতাদাহকে নিয়োগ করা হয়। মহানবী (স) কর্তৃক এ অভিযানে নিযুক্ত তিনজন সেনাপতি নিহত হবার পর মুসলিম সৈন্যের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন। এমতাবস্থায় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ মাখযুমি মুসলিম বাহিনীর সংকটময় মুহূর্তে নিজেই সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং তিনি পঞ্চ বিন্যাস পদ্ধতির কৌশলগত পরিবর্তন ঘটান। এ নতুন ও অপরাজেয় সেনাপতি মুসলিম সৈন্যের অগ্রবাহিনীকে পশ্চাদবাহিনীর স্থানে স্থাপন এবং দুটো বাহুর অবস্থান পরিবর্তন করে মুসলিম সেনা বিন্যাসে আমূল পরিবর্তন ঘটান। মক্কা অভিযান কালে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ১,০০০ মুসলিম অগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং তিনটি বাহুর নেতৃত্ব দেন নিজ নিজ বাহুর সেনাপতিগণ। তবে মূল বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মহানবী (স) নিজেই।

উল্লেখ্য, মুসলিম বাহিনী আরবের বিভিন্নগোত্র কর্তৃক সরবরাহকৃত সৈন্য নিয়ে গঠিত ছিলো। স্ব স্ব গোত্র বা শাখা প্রধানগণ স্ব স্ব দলের নের্তৃত্বে ছিলেন। তবে সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন মহানবী (স) নিজে। হুনায়ন ও তায়েফ এবং খায়বার অভিযানে খামিস পদ্ধতির কথা জানা যায়। এসব অভিযানে খালিদ ইবনে ওয়ালীদের সুদক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিলো। তাবুক অভিযানেও খামিস পদ্ধতিতেই সৈন্য বিন্যস্ত করা হয়েছিলো। সব মিলিয়ে দেখা যায় যে, মহানবী (স)-এর নেতৃত্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রটি সম্পূর্ণরূপে না হলেও অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব থেকে "তাবিয়া" যুদ্ধকৌশল এবং সেনা বিন্যাসে খামিস পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলো। সময়ের পরিবর্তনে এ সকল পদ্ধতির উন্নয়ন অগ্রগতি ও পূর্ণতা লাভ করে ইসলামী বাহিনী এরূপ সুদক্ষ সামরিক বাহিনীতে পরিণত হয় এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বাহিনীকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করে।

মহানবী (স)-এর বিখ্যাত সেনানায়কদের মধ্যে ছিলেন খাযরাজ গোত্রের মুনযির ইবনে আমর ও আওস ইবনে আল খাওলী। কুরাইশ গোত্রের আলী ইবনে আবু তালিব, হামযাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, যুবায়র ইবনে আওয়াম, আবু উবায়দাহ ইবনে জাররাহ ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদ এবং সাদ। হুজায়াম গোত্রের কুতাবাহ ইবনে কাতাদাহ, সুলায়ম গোত্রের ওবায়দ ইবনে খালিদ এবং সর্বশেষ আশআর গোত্রের আবু আমির।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময় সমগ্র জাতির সমন্বয়ে ইসলামী সৈন্য বাহিনী গঠন করা হতো। যুদ্ধক্ষেত্রে সকল সবল মুসলমান অংশ গ্রহণ করতো। খোলাফায়ে রাশেদুনের সময় নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা

www.pathagar.com

অনুভব করা হয় এবং সে সময়কাল থেকে সুশৃঙ্খল নিয়মিত বাহিনী ছিলো। অন্যথায় রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামী রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যেতো। খোলাফায়ে রাশেদুনদের মধ্যে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় ইসলামী বাহিনী ছিলো সুদৃঢ়, যে কারণে রাষ্ট্রদ্রোহী আন্দোলনকে সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভব হয়েছিলো। সামরিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ফলে হযরত আবু বকর (রা) আরব ভূখণ্ডের সকল বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি রাসূল (স)-এর ইচ্ছানুসারে জায়েদের পুত্র উসামাকে বায়জানটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে মুসলিম সৈন্যবাহিনী সুসংঘবদ্ধ ও সুগঠিত ছিলো; তাতে আরব ও অনারব মুসলমানগণ সদস্য ছিলো। তিনি নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গঠন করে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; যথা অশ্বারোহী, পদাতিক এবং তীরন্দাজ। এছাড়া সৈন্য বাহিনীতে আরো দুটো নতুন শ্রেণী গঠিত হয়েছিলো যেমন স্কাউট অথবা গুপ্তচর দল এবং সার্ভিস কোর। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণ ঢাল-তলোয়ার দীর্ঘ বর্শা ব্যবহার করতো। অশ্বারোহীগণ বর্ম ও লৌহ শিরস্ত্রান পরিধান করতো।

সামরিক বাহিনীর প্রধান গোপন অশ্বারোহী দলের জন্য ছাউনিতে আস্তাবল নির্মিত হয়েছিলো। জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের একটা বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত থাকতো। পদাতিকগণ জুতা ও পাজামা পরিধান করতো। এ বাহিনীর প্রধান কাজছিলো যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঁচটা ভাগে বিভক্ত হয়ে ব্যূহ রচনা করা। সৈন্য সমাবেশের এ অভিনব পন্থা আরবদের জানা ছিলো না এবং শত্রু মোকাবেলা করার জন্য এতে পাঁচটা ভাগ ছিলো। অগ্রভাগ, মধ্যভাগ, পশ্চাদভাগ, ডানভাগ এবং বামভাগ। সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তীকে বলা হতো মোকাদ্দমা; এ দলটা শত্রুপক্ষকে আক্রমণের সূচনা করতো। মধ্যবর্তী দল কলব নামে পরিচিত। এ দলটি কেবল সৈন্যাধ্যক্ষকে পরিবেষ্টন করে রাখতো। এছাড়া ডান, বাম ও পশ্চাদ বাহিনীর নাম ছিলো যথাক্রমে, "মায়মানা" "মায়সারা" ও "সাকাহ"।

সৈন্যবাহিনী সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একজন অধিনায়ক নিযুক্ত হতেন, তাকে আমীর বলা হতো। তিনি কেবল খলিফার কাছে দায়ী থাকতেন। দুটো বাহিনী একত্রে যুদ্ধযাত্রা করলে একজন সর্বাধিনায়ক বা সিপাহসালার হিসাবে কাজ করতেন। একটা সৈন্য বাহিনী কয়েকটা ভাগে বিভক্ত হতো এবং এক একটা বিভাগ "কায়েদের" নেতৃত্বে যুদ্ধ করতো। এরূপ এক একটা সৈন্য বাহিনীতে দশটা কায়েদের বাহিনী গঠিত হতো প্রত্যেকটা কায়েদের বাহিনীতে ১০০ জন সৈন্য থাকতো। প্রতিটা কায়েদে আবার কয়েকটা

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র উপদলে বিভক্ত হতো এবং দশজন সৈন্যের এ উপদলটার নেতৃত্ব দিতেন একজন আমীর-উল-আশরাহ অর্থাৎ সেনাপতি। পদাতিক বাহিনী ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রের ফলাফল নির্ধারণে তীরন্দাজ বাহিনীর ভূমিকা ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া স্কাউটগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে সেনাধ্যক্ষর নিকট সংবাদ প্রদান করতো। হযরত ওমর (রা) সর্বপ্রথম দেহরক্ষী বাহিনী নিয়োগ করেন। আরিফগণ আরব ও অনারব সৈন্যদের তত্ত্বাবধান করতেন। সৈন্যদের যারা খাবার সরবরাহ করতো তাদেরকে "আহরা" বলা হতো। যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষা শত্রুর অগ্রাভিযানে বন্ধ বা বাধা দেবার জন্য মূল যাত্রা পথে প্রাচীর নির্মাণ করা হতো এবং কোনো কোনো স্থানে পরিখা খনন করা হতো।

খোলাফায়ে রাশেদূনদের সময় সর্বমোট নয়টা জুনদ বা সামরিক বিভাগ ছিলো। এগুলো হলো ঃ কুফা, বসরা,দামেস্ক, ফুসতাত, হিমস, প্যালেস্টাইন, উরদুন, জর্দান এবং মদীনা। এছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি ছিলো প্রথম দিকে সৈন্যবাহিনীতে মোট ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ সেন্য ছিলো। পরবর্তীকালে ঐ সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ৯০,০০০ এ দাঁড়ায়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে ৯০,০০০ সৈন্যের একটা বিশাল বাহিনীর সমাবেশ করেছিলেন। প্রত্যেক জুনদে কমপক্ষে ৪,০০০ অশ্ব এবং ৩৬,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন থাকতো। এতদ্ব্যতীত হযরত ওসমান (রা)-এর সময় নৌবাহিনী গঠন করা হয়। কারণ তিনদিক পানি বেষ্টিত আরবভূমিকে রক্ষা করার জন্য নৌবাহিনী ছিলো অপরিহার্য। খলিফা হযরত ওসমান (রা) সর্বপ্রথম একটা আরব নৌবহর গঠন করে আবদুল্লাহ বিন কায়েসকে নৌধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। তাঁর আমলে বাইজেনটাইনদের বিরুদ্ধে অসংখ্যবার নৌ-অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিলো। মুসলিম নৌবহরে ৬৪৯ ও ৬৫১ খৃস্টাব্দে ভূমধ্য সাগরে সাইপ্রাস এবং রোনডাস অধিকার করে। ৬৫২ খৃঃ একটা বিশাল বাইজেনটাইন নৌবহর উত্তর আফ্রিকার মুসলিম নৌবাহিনী কর্তৃক বিধস্ত হয়। উপরন্তু ভারত উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে সিন্ধু অঞ্চলে আরব নৌবহর প্রেরিত হয়। যার অধিনায়ক ছিলেন মুহাম্মাদ বিন কাসিম।

আল হারাস

বৈরিতার সময় ইসলামী সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে উল্লেখিত চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলায় রাজধানীর বাইরে চলে গেলেও রাজধানীতে একটা সেনা গ্যারিসন মোতায়েন থাকতো যাতে সেনাবাহিনীর অবর্তমানে আশেপাশের কোনো বৈরীগোত্রের হামলার বিরুদ্ধে রাজধানীর মুসলমানরা আত্মরক্ষা,

www.pathagar.com

প্রতিশোধ বা পালটা আক্রমণ চালাতে পারতো। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গোড়ার দিকে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও মদীনায় মুসলমানগণ নিজেদেরকে খুব একটা নিরাপদ মনে করতো না। কারণ ইহুদীচক্র সকল সময় মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে ব্যস্ত থাকতো। তাই রাসূল (স) মদীনাকে সুসংহত রাখার জন্য এক গ্যারিসন সৈন্য মোতায়েন রাখতেন যাতে মুসলমানদের দুঃসময় মুসলমানদের বিরুদ্ধাবাদ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে বা মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এছাড়াও রাসূল (স)-এর অনুপস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্রকে দেখাশুনার জন্য তার পক্ষ থেকে একজন ডিপুটি (নায়েব) নিয়োগ করতেন।। নায়েবগণ সামরিক কমাণ্ডারদের চেয়ে অনেক বেশী বেসামরিক প্রশাসক ছিলেন। উল্লেখ করা যায় যে, প্রায় সকল গাযওয়ার ঘটনাতেই আল হারাস নামে রাজধানী রক্ষার জন্য একটা গ্যারিসন নিয়োজিত থাকতো। ওহুদ অভিযান কালে আওসীর প্রধান সাদ ইবনে মু'আযকে হারাস এর কমাণ্ডারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। খন্দক অভিযানের কঠিন পরিস্থিতির সময় কুরায়যাহ গোত্রের ইহুদীদের সাম্ভাব্য হামলা ও ষড়যন্ত্র থেকে মদীনাকে রক্ষা করার জন্য কালব গোত্রের যায়দ ইবনে হারিসাহ এবং আওস গোত্রের সালমাহ ইবনে আসলামের নেতৃত্বে যথাক্রমে ৩০০ ও ২০০ অশ্বারোহী সৈন্যের একটা বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানি (৬২৭ খৃঃ) মাসে গাত্ফান গোত্রের একটা অংশের বিরুদ্ধে মহানবী (স)-এর অভিযান কালে খাযরায গোত্রের প্রধান সাদ ইবনে উবায়দাহ এককভাবে তার গোত্রের ৩০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত হারাস-এর কমাণ্ডারদের দায়িত্ব পালন করেন।

হারাস পর্যবেক্ষণের কাজ করতো, বিশেষ করে রাত্রিবেলা শত্রুর গতিবিধির উপর নযর রাখতেন। সেনারক্ষী ছাড়া আল হারাস এর একটা অংশ শিবির রক্ষীয় কাজ করতো। তারা তাদের নিজস্ব কমাণ্ডারদের অধীনে সহযোগী নিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত থাকতো। তবে যাই বলা হোক না কেনো মহানবী (স)-এর সময় মুসলিম বাহিনীর সকল সামরিক অভিযানেই আল হারাস ছিলো অপরিহার্য অঙ্গ। খোলাফায়ে রাশেদীনদের সময় রাষ্ট্রের বিস্তৃতি লাভ করায় আল হারাস এর কার্যক্রম বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, কারণ বিভিন্ন অঞ্চলে নানা রকম পরিস্থিতির কারণে শত্রুর গতিবিধি কার্যক্রম লক্ষ করার জন্য আল হারাস অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আল হারাস স্কাউটদের মত গুপ্তচর বৃত্তির কাজও করতো।

মহানবী (স)-এর সময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রত্যেক গোত্রেরই নিজস্ব পতাকাবাহী ছিলো। সারায়াতে সাধারণত একজন পতাকাবাহক থাকলেও গাযওয়াতে

www.pathagar.com

বিশেষ করে বড় গাযওয়াতে কয়েকজন পতাকাবাহী থাকতো। ছোট ছোট বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে তিনজন করে পতাকাবাহক থাকতো। আর ইসলামী প্রজাতন্ত্রের জন্য একটা প্রজাতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্বলিত অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাললাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ চিহ্নিত পতাকা ছিলো। এ রকম পতাকার বাহক হতো "অবিসংবাদিত ও বিখ্যাত গোত্রের গোত্রপতিগণ, যারা আল্লাহর নামে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতো কেবল তারাই।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

1.Dr. S. A. Q. Husaini\The coustitution of the Arab Empire.

2. Amir Ali ; A Short History of the Saracens London. 1951.

The sprit of islam, London 1922

3, Arnold : The Caliphate, Oxford 1924. : The Legacy of islam.

4. Encyclopaedia of Islam, ed. M. TH. Houtsma on others London 4 Vols.

5. Dunning ; A History of political Theories, London 1923, 4 Vols

6. Hamilton of Grady ; Hidayah a Commenlary on the Muhammadan Law.

7. P.K Hitti ! History of the Arabs.

8. S .A. Q Husaini ; Arab Administration, London 1952.

The constitution of the Arab Empire - London 1953.

9. Khuda Bakhsh ; Essays; Indian on Islamic.

10. Hazrat Rasul Karim (sm) Life on Teachings ; Edited by Editional Board of Islamic Encyclopedia - Islamic Foundation Bangladesh.

11. মাওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম ; আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার-১৯৯৫।

12. শামসুল আলম ঃ ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা ১৯৮১ঐ

13. ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী ঃ রাসূল মুহম্মাদ (স)-এর সরকার কাঠামো, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৪।

14. আল কুরআনুল করীম ঃ ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা ১৯৮৭।

15. তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম মূল ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)।

16. Sir William Muir ; Annals of the Early Caliphoute.

17. Ibn Khaldun ; Al Muqaddamah.

18 . আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম।

19. Organisation of Government under the Prophet (sm) DR.Muhammad Yasin Mazher Siddiqui.

www.pathagar.com

www.pathagar.com